স্বভাবতঃ স্বার্থ পরিচালিত। কতকগুলি লোক সে স্বার্থ প্রবৃত্তি দমন করিয়া আত্মত্যাগ করিয়া থাকেন। আর কতকগুলি লোক জড়-ভাবাপন্ন—নিদ্রা আলস্যাদির বশীভূত। প্রকৃতিজ সত্ব রজঃ ও তমঃ গুণানুসারে আমাদের স্বভাবের এই প্রভেদ হয়। যাহারা সাত্বিক প্রকৃতির লোক, তাহারা আত্মত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম চর্চ্চা করেন—তাঁহারা ব্রাহ্মণ। যাহারা সাত্বিক-রাজসিক প্রকৃতির লোক, তাহারা সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ করিতে না পারিলেও লোক সংগ্রহের জন্য সমাজ রক্ষার জন্য কর্ম্ম করেন, তাহারা ক্ষত্রিয়। যাহারা স্বার্থ চালিত, রজঃ ও তমঃ গুণের বশীভূত, তাহারা বৈশ্য; আর যাহারা তামসিক প্রকৃতির লোক, স্বাভাবিক জড়তা বশে কোন কর্ম্ম স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিতে পারে না—যাহারা কেবল পাশব প্রকৃতির বশে চালিত হয়, তাহারা শূদ্র। সকল সমাজেই এইরূপ বর্ণ-বিভাগ অল্লাধিক পরিমাণে আছে। কিন্তু স্বভাব মানুষ পিতামাতার নিকট শরীরের সহিত কতক পরিমাণে লাভ করে বলিয়া হিন্দু সমাজে বর্ণ বিভাগ পুরুষ পরম্পরাগত ও সুনিয়মিত।

এখন বুঝা যাইবে যে এই বর্ণ ও কর্ম্ম বিভাগের ভিতর সমাজের উন্নতি ও ধ্বংশের বীজ রহিয়াছে। রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির লোক সাধারণতঃ স্বার্থ চালিত। তাহার ফল আত্মসুখ লাভ চেষ্টা। নিজের মান সম্ভ্রম প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা। আপনার অর্থ কাম লাভের চেষ্টা। এই চেষ্টা এই প্রবৃত্তি নিয়মিত না হইলেই সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। মনে কর একজন কামারের ব্যবসা করিয়া অনেক অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে, প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। তখন অন্য একজন নিজের ছুতারের ব্যবসা ছাড়িয়া হয়তঃ কামারের এমন লাভজনক ব্যবসা অবলম্বন করিতে প্রবৃত্তি হইবে। হয়তঃ একজন ক্ষত্রিয় বড় আধিপত্য করিতেছে দেখিয়া অন্য বর্ণের কোন লোকের সে আধিপত্য লাভে চেষ্টা হইবে। এই একরূপ সমাজ ধ্বংশের বীজ আছে। ইহাতে সমাজের উক্ত কয়রূপ নিতান্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্মের মধ্যে কোন একটা কর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করিতে পারে। হয়ত বাণিজ্যের অত্যধিক সম্প্রসারণ হইল, তাহাতে অন্য কর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া গেল। ক্রমে সে জাতির মূলমন্ত্র হইল বাণিজ্য। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, এইরূপ করিয়া কোন এক বিশেষ সমাজে কৃষি কি বাণিজ্য, রাজনীতি বা শিল্প কি তত্ত্ববিদ্যা—ইহার কোন একটি মূলসূত্র হইয়া পড়ে। তাহার ফলে অবশেষে সে জাতির উচ্ছেদ হয়। সুনিয়ন্ত্রিত সমাজে এ সকলগুলি নিয়মিত করিতে হয় তাহা বলিয়াছি। সেইরূপ যাহাতে একজন আর এক জনের কর্ম্ম করিতে না যায়, বা না পারে তাহাও দেখিতে হয়। আমাদের দেশে জাতি বিভাগ পুরুষ পরম্পরাগত হইয়া—কতকটা সেইরূপ হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে (trade guild) প্রভৃতি ব্যবসায়ীর সমাজ সৃষ্টি হইয়া কতকটা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা হইতেছে।

কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি ধর্ম্ম ও স্বার্থ ত্যাগ শিক্ষা ব্যতীত সম্ভব হয় না। অর্থাৎ "স্বধর্ম্ম পালন" নিষ্কাম ভাবে নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ত্তব্য জ্ঞানে যাহাতে লোকে করিতে পারে, সে শিক্ষা দিতে হইবে। লোককে শিখাইতে হইবে যে, স্বধর্ম্ম পালন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নহে, স্বার্থত্যাগ শিক্ষার জন্য, সন্ন্যাস ভাব লাভ করিবার জন্য। ভগবান মনু বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণস্য তপোজ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণং।
বৈশ্যস্যতু তপো বার্ত্তা তপঃ শূদ্রস্য সেবনং॥"

অতএব স্বধর্ম্ম তপস্যা স্বরূপে পালন করিতে হইবে। এই স্বধর্ম্ম পালন হইতেই আত্মত্যাগ শিক্ষা হয়। ধর্ম্মের প্রধান সোপানে আরোহণ করা যায়। এইস্বধর্ম্ম পালন দ্বারা ঈশ্বর আরাধনা করিতে হয়। নিজের কি লাভ হইবে,না হইবে, তাহা গণনা করিতে হয় না। গীতায় শ্রীভগবান্ সেই জন্য বলিয়াছেন :—

"স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততং।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥"

এই জন্যই শ্রীভগবান্ গীতায় অন্যত্র বলিয়াছেন,—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

অতএব দেখা গেল যে যে সমাজ সুনিয়ন্ত্রিত, যে সমাজ আদর্শ সমাজে পরিণত হইয়া স্থায়ী হইয়াছে,সে সমাজে ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই রূপ বর্ণবিভাগ থাকে, এবং সকল বর্ণের লোকই ধর্ম্ম প্রণোদিত হইয়া নিজের বর্ণধর্ম্ম পালন করে। বর্ণধর্ম্ম কর্ত্তব্য ভাবিয়া পালন করিলে, তাহাতে মন আকৃষ্ট হয় না—সেখানে লাভালাভ গণনা করিতে হয় না। বর্ণধর্ম্ম পালন, নিত্য বা স্বাভাবিক কর্ম্মের মত হইয়া যায় বলিয়া, তাহা আমাদের প্রবৃত্তি বা অনুরাগ আকর্ষণ করে না। মন সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকে ; একাগ্র হইয়া ধর্ম্মের পথে যাইতে পারে। সুতরাং সে সমাজে লোকের মধ্যে পরস্পরের স্বার্থে সংঘর্ষণ থাকে না, সমাজের কোথাও ব্যাধি থাকে না। যে সমাজে এইরূপ বর্ণবিভাগ না থাকে, অর্থাৎ এই চারি প্রকার প্রকৃতি-সম্পন্ন লোক উপযুক্ত পরিমাণে না থাকে, সে সমাজের ধর্ম্মবন্ধন ঠিক থাকে না। সে সমাজে স্বার্থসংঘর্ষণ থাকে ও পরিণামে সে সমাজ ধ্বংস হয়। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, কেবল শূদ্র বা কেবল বৈশ্যপ্রকৃতির লোক লইয়া যে জাতি সংগঠিত ছিল, সে জাতি অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। অথবা ক্ষত্রিয় বৈশ্য,শূদ্র, ইহার কোন এক বা ততোধিক প্রকৃতির লোকের সমবায়ে যে জাতি বা যে সমাজ সংগঠিত হয়,তাহাও স্থায়ী হয় না। কেন না, সে সমাজ অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন। ধর্ম্ম সে সমাজের মূলসূত্র হইতে পারে না।

অতএব বুঝিলাম যে যে সমাজের মূলসূত্র এই ধর্ম্ম, সেই সমাজই স্থায়ী হয়। তাহাকে সহজে কেহ ধ্বংস করিতে পারে না। এখন কথা হইতেছে, স্বার্থচালিত সাধারণ লোক কিরূপে এইপ্রকার ধর্ম্ম প্রণোদিত হইবে ? এখন সেই কথাই আমাদের আলোচ্য হইতেছে।

পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে এক রূপ বুঝা যায় যে, যে সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য থাকে, যে সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় নিজ স্বধর্ম্ম পালন করে, সেই সমাজই ধর্ম্ম প্রধান হয়। ব্রাহ্মণ —নিজ ধর্ম্মভাব সাধারণে সংক্রামিত করেন। ক্ষত্রিয়—নিষ্কাম ভাবে ধর্ম্ম পালন করিয়া, সাধারণকে রক্ষা করিয়া, সাধারণের আদর্শ হইয়া,তাহাদিগকে নিষ্কাম ভাবে স্বধর্ম্ম পালন করিতে শিখান। ব্রাহ্মণ জ্ঞান ও ভক্তির উৎস স্বরূপ। তাঁহারা নিজে ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিয়া সমাজের ধর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি করেন। ক্ষত্রিয় নিজ কর্ম্ম দ্বারা সেই শক্তি সমাজে বিস্তার করেন। অর্থশাস্ত্রে যেমন সমাজের জন্য অর্থের ও ভোগাবস্তুর উৎপাদন (Production) বা সংযোজন ও সংগ্রহ (Distribution) ও রক্ষার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ সমাজের জন্যও ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি বিস্তার ও রক্ষার প্রয়োজন হয়। সমাজের জন্য অর্থ কাম ও ধর্ম্ম এ ত্রিবর্গই সাধারণতঃ প্রয়োজন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

উপরের কথা হইতে এক্রূপ বুঝা যায় যে, সকল দেশে ও সকল কালে সুনিয়ন্ত্রিত উন্নত ও স্থায়ী সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা সেই প্রকৃতির লোকই সমাজের মেরুদণ্ড। যে সমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রকৃতির লোক না থাকে, সে সমাজের উন্নতি হয় না। যাঁহারা ইউরোপের ইতিহাস জানেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে, সে দিনের অসভ্য বর্ব্বর ইউরোপে মধ্যযুগে খৃষ্টধর্ম্ম প্রভাবে পুরোহিত সম্প্রদায় বা কতকপরিমাণে ব্রাহ্মণ প্রকৃতির লোকের ও সেই সঙ্গে ক্ষত্রিয় প্রকৃতির লোকের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে, ইউরোপ অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়াও এখন এত বড় হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মপ্রণোদিত পিউরিট্যান সম্প্রদায়ের লোকের প্রভাবে [illegible] আজ আমেরিকা এত বড় হইয়াছে। ইউরোপের উন্নতির ইতিহাস এই ধর্ম্মের ইতিহাস, তাহা ইতিহাসতত্ত্বজ্ঞ বুসেঁ বুঝাইয়া দিয়াছেন। দার্শনিক প্রধান ফরাসী পণ্ডিত, কুঁজে বুঝাইয়াছেন, ধর্ম্মই সকল সভ্যতার মূল। তিনি বলেন,—

"Religion is the foundation of every civilization. * * In every epoch of the world, the religion is the foundation of the epoch. It is religion which makes the general faith of the epoch and for this reason its manners and its institutions. Religion is the cradle of philosophy." (Cousin's History of philosophy.)

সুতরাং ধর্ম্মই সমাজের ধারণ ও রক্ষণ শক্তি। বিজ্ঞানের কথায় সমাজের ধর্ম্মই higher potential energy—উচ্চতর সঞ্চিত শক্তি। ব্রাহ্মণই সেই শক্তির আধার। ক্ষত্রিয়ই সেই ধর্ম্মের kinetic energy—বা কার্য্যশক্তি—শুদ্ধ সাত্ত্বিক রজঃশক্তি।

তামসিক প্রকৃতির লোকে সে ধর্ম্ম শক্তির কার্য্যকারিতা বড় থাকে না—সেখানে এই ধর্ম্ম শক্তি Dissipated হয়। যে ধর্ম্ম যে পরিমাণে স্বার্থ দমন ও বাসনা নষ্ট করিয়া মানুষকে নিবৃত্তির পথে লইয়া যাইতে পারে, সেই ধর্ম্মই সেই পরিমাণে সমাজ ধারণ ও রক্ষা করিবার উপযোগী হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

এখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-প্রকৃতির লোক কাহাকে বলে, তাঁহাদের কার্য্য কি, তাঁহারা কিরূপে সমাজের ধর্ম্ম বৃদ্ধি ও রক্ষা করেন, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কথায় বুঝাইব। জর্ম্মাণ পণ্ডিত ফিক্তের (Fichte) কথায় তাহা প্রথম বুঝাইতেছি। ফিক্তে বলিয়াছেন:—

"প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য যাহার জীবনে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার জীবনই আদর্শ ধর্ম্মজীবন। এ সংসারের আমূল সংস্কার ও পরিবর্ত্তন তাহার ফল। দুই রূপে তাহা সিদ্ধ হয়। এক বাহ্যিক দৃষ্টান্ত ও ফলদ্বারা, দ্বিতীয়, কেবল জ্ঞান দ্বারা। যাঁহারা নিজ শক্তিতে আপনার জ্ঞানবলে, লোক সংগ্রহের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে প্রত্যেক যুগের ধর্ম্ম পালনে একতান করিয়া মিলাইয়া নিয়মিত করেন, তাহাদের সামাজিক সম্বন্ধ স্থির করিয়া দেন, তাঁহারাই এই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। যাঁহারা রাজা বা রাজমন্ত্রীর ন্যায় উচ্চপদস্থ এবং যাঁহাদের লোকহিতার্থ উক্ত কার্য্য স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার, স্থির করিবার বা নিয়মিত করিবার অধিকার ও ক্ষমতা আছে, ও সেই কার্য্য যাঁহারা অবলম্বন করেন, তাঁহারাই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।"

"জ্ঞানী পণ্ডিতগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত যাহাতে লোকসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মভাব অক্ষুণ্ণ থাকে, এবং যাহাতে তাহা সাধারণে আরও পবিত্রতর রূপে উপলব্ধি করিতে পারে, সেই কার্য্যই তাঁহাদের অবলম্বনীয়। প্রথম শ্রেণীর সহিত সাধারণের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। তাঁহারাই ঈশ্বর ও সংসারের প্রত্যক্ষ সংযোগস্থল। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক, আচার্য্য ও শাস্ত্রবেত্তাগণে

ঈশ্বরজ্ঞানের নির্ম্মল আধ্যাত্মিকতা এই প্রথম শ্রেণীর কার্য্য দ্বারা কিরূপে সমাজে শক্তিসম্পন্ন হয় ও নিয়মিত হয়, তাহাই মধ্যবর্ত্তী হইয়া স্থির করেন, তাঁহারাই প্রথম শ্রেণীর লোকের শিক্ষক।” *

ফরাসি দার্শনিক কুজেঁও কতকটা এইরূপ কথা বলিয়াছেন। † ফরাসি-পণ্ডিত কমটীও এই তত্ত্ব বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা আজকাল অনেকে নিজের ধর্ম্মশাস্ত্রের বাক্যে আস্থাবান্ নহি, এজন্য পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদিগের কথায় এই তত্ত্ব বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি। নতুবা গীতায় শ্রীভগবান্ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইত। তাহা এই—

> লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥
> যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
> স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥

এই লোকসংগ্রহ কার্য্য ক্ষত্রিয়ের। ব্রাহ্মণ তাহার নেতা।

এখন আমরা বাঙ্গালী জাতির অবনতির কারণ বুঝিতে পারিব। বাঙ্গালীর ধর্ম্মহীনতা, তাহার আধ্যাত্মিক দুরবস্থা, তাহার অবনতির প্রধান কারণ। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অবনতি ও অভাব, তাহার দ্বিতীয় কারণ। এই আধ্যাত্মিক অভাব হইতে বাঙ্গালার স্বার্থ সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। দেশের জল বায়ুর বিশেষ অবস্থা, সেই অবস্থার জন্য কতকগুলি বিশেষ ব্যাধির বিকাশ এবং রাজনৈতিক অবস্থা ইহাদের সমবায়ে আমাদের আর্থিক, মানসিক, দৈহিক, নৈতিক প্রভৃতি অনেক গুলি দুরবস্থা ঘটিয়াছে, হারেন্দ্রবাবু তাহা দেখাইয়াছেন। এ সকলগুলিরই মূল কারণ আমাদের আধ্যাত্মিক অভাব।

এই আধ্যাত্মিক দুরবস্থার বীজ বাঙ্গালায় কত শতাব্দী পূর্ব্বে উপ্ত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। বাঙ্গালা পূর্ব্বে অনার্য্যের বসতি ছিল। মধ্যে বাঙ্গালার একবার উন্নতি হইয়াছিল। বোধ হয়, তাহারও মূলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সে উন্নতি প্রধানতঃ বাণিজ্যমূলক। তখন—সে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার কথা—বাঙ্গালার বাণিজ্য রোম প্রভৃতি দেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। বোধ হয় তখন বাঙ্গালার আর্থিক, বাণিজ্যিক ও বৈষয়িক উন্নতির অভাব ছিল না। কিন্তু

* The Life of him in whom learned culture has fulfilled its ends is to realize the Divine Idea in the world, changing and reconstructing it from the very foundation. It may manifest itself in two forms—either in actual external being and action, or only in Idea. The first class comprehends all those who by their own strength and according to their own Idea assume the guidance of human affairs, leading them on to ever new perfection in constant harmony with each succeeding age; who direct their social relations;—thus not only those who stand in the high places of the earth as kings ... but who possess the right and calling to think, judge and resolve independently the original disposal of their affairs.

The second class embrace the Scholars, whose vocation it is to maintain among men the knowledge of the Divine Idea, to elevate it unceasingly to greater clearness and precision. The first class act directly upon the world; they are the immediate point of contact between God and reality; the last are the mediators (as Teachers and authors) between the pure spirituality of thought in the Godhead and the material energy and influence which that thought acquires through the instrumentality of the first class; they are the trainers of the first class.

Fichte. On the Nature of the Scholar.

† The two greatest things in the world are action and thought. The greatest modes of serving humanity are to cause it to advance a step in the road of truth, by elevating the ideas of an age to their highest expression, by carrying them to their utmost metaphysical limits, or by impressing these ideas ...upon the face of the world.

Cousin's, History of Philosophy P. 178.

ধর্ম্মের ভিত্তিতে সে উন্নতি বিশিষ্টরূপে স্থাপিত না থাকায়, পূর্ব্বেকার অন্যান্য বাণিজ্য-প্রধান দেশের ন্যায়, বাঙ্গালার সে উন্নতি বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। এই ধর্ম্মহীনতা বা আধ্যাত্মিকতার অভাবের প্রধান কারণ, বাঙ্গালায় পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ছিল না। আর্য্যগণ বাঙ্গালায় আসিতে চাহিতেন না। বাঙ্গালায় আসিলে তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতার অবনতি হইবে, ইহা তাঁহারা বুঝিতেন। সেই জন্য যদি কেহ বিশেষ কারণে বাঙ্গালায় আসিতেন, তবে তাঁহার "পুনঃ সংস্কার" প্রয়োজন হইত। তখন বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বাস করিতেন না। ঘটনাচক্রে দুই চারি ঘর ব্রাহ্মণ বা দুই দশ ঘর ক্ষত্রিয় দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজা আদিশূর যজ্ঞকালে তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্রাহ্মণত্ব খুঁজিয়া পান নাই। তখন বাঙ্গালা ক্ষত্রিয় হীন "পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশ" ছিল।

রাজা আদিশূর বাঙ্গালী ছিলেন না। শুনিয়াছি, তিনি দাক্ষিণাত্যের ক্ষত্রিয় ছিলেন। পরে বাঙ্গালার রাজা হইয়া, সেনবংশ স্থাপন করেন। তিনি প্রথমে পশ্চিম হইতে সুব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন। সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে কায়স্থও আসিয়াছিল। কায়স্থকে কেহ ক্ষত্রিয় বলিতে চাহেন না—বলিবার প্রয়োজনও নাই। কেন না, এখন কায়স্থে ক্ষত্রিয়োচিত গুণ নাই। পূর্ব্বে তাহা ছিল কি না, জানি না। কিন্তু বাঙ্গালায় পূর্ব্বে কায়স্থও সমাজের মেরুদণ্ড হইতে পারিয়াছিল—বাঙ্গালার কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের স্থান অধিকার করিয়াছিল—ইহা স্থির। সে যাহা হউক, এই সকল আনীত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের স্বধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, বাঙ্গালার সংস্পর্শে তাহাদের অবনতি নিবারণ করিবার জন্য পরে বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আজ তাঁহারই সেই কৌলিন্য প্রথাফলে বাঙ্গালায় প্রায় দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ ও দশ লক্ষ কায়স্থের আবাস হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সে কৌলিন্য প্রথা অক্ষুণ্ণ নাই। বাঙ্গালায় এখন ব্রাহ্মণ কায়স্থের বিশেষ অবনতি হইয়াছে। সেই অবনতি বাঙ্গালীর আধুনিক অবনতির কারণ।

বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ কায়স্থের এ অবনতি কেন হইল। বোধ হয়, বাঙ্গালার আদিম অনার্য্য জাতির সহিত, অথবা অনার্য্য ধর্ম্মাক্রান্ত পূর্ব্বেকার বাঙ্গালী ব্রাহ্মণাদির সহিত, আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণাদির বিবাহ—এই অবনতির এক কারণ। প্রথমে বোধ হয় এইরূপ অসম বিবাহ হেতু তাহাদিগের অবনতি হইতে আরম্ভ হইতেছে দেখিয়া, তাহা নিবারণ জন্যই বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা বিধিবদ্ধ করেন। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে, অসবর্ণ বিবাহে বিভিন্নরূপ রক্তের সংমিশ্রণেই জাতীয় উন্নতি হয়। এ কথা আর্য্য-পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহারা অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের বিরোধী ছিলেন। বিলাতে ব্রিডিং যে নিয়মের উপর স্থাপিত, যাহা হইতে অশ্ব, গো, কুক্কুর, পারাবত প্রভৃতি জাতির ক্রমোন্নতি হইয়াছে—সেই নিয়মই আর্য্য পণ্ডিতদিগের বিশ্বাসের যথার্থতা প্রমাণ করিবে। আমাদের শাস্ত্র মতে অসবর্ণ বিবাহ বা সঙ্কর বর্ণের সৃষ্টিই জাতীয় অধঃপতনের একটী প্রধান কারণ। গীতায় অর্জ্জুন বলিয়াছেন :—

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।

শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন—

সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।

বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের অবনতির আরও এক কারণ আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি

যে, আগে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ছিল না। বাঙ্গালায় অনার্য্যের বসতিছিল। হিন্দুর অধিকারে তাহারা শূদ্র হইয়া হিন্দুদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। এইজন্য দেখিতে পাই, বাঙ্গালায় কৃষিকর্ম্ম বা বাণিজ্য, সমস্তই শূদ্রের কর্ম্ম হইয়াছিল। শূদ্রের প্রকৃতি—তামসিক, কার্য্য—দাসত্ব। কালক্রমে বাঙ্গালায় শূদ্র, কৃষি বাণিজ্য দ্বারা বৈশ্যপ্রকৃতি লাভ করিয়াছিল। তখন বাঙ্গালার একরূপ বৈষয়িক উন্নতিও হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, জগতের অপরিহার্য্য নিয়মবলে সে উন্নতি কালগর্ভে বিলীন হইয়াছিল। বাঙ্গালীরা পুনর্ব্বার শূদ্র-প্রকৃতি হইয়া, প্রথমে বিদেশীয় হিন্দু রাজার, পরে বৌদ্ধরাজার—সেন বা পালবংশীয় রাজার,ও শেষে মুসলমান রাজার অধীনে ছিল। মধ্যে ব্রাহ্মণের ও কায়স্থের শুভাগমনে বাঙ্গালার অদৃষ্টও ফিরিয়াছিল। তখন বৈদেশিক রাজনীতির অধীন থাকিয়াও ধর্ম্মশক্তিতে বাঙ্গালী জীবিত ছিল। শ্রীচৈতন্যদেব ও তৎপ্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম—সেই শক্তির শেষ অভিব্যক্তি। সে শক্তিও ক্রমে লোপ পাইয়াছে। কেননা বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ কায়স্থের অবনতি হইয়াছে। এখন তামসিক শূদ্রপ্রকৃতি বাঙ্গালাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সাত্ত্বিক ও শুদ্ধ রাজসিক (দৈব) প্রকৃতির স্থানে তামসিক বা আসুরিক প্রকৃতি তাহাদিগকে অভিভূত করিয়াছে। এই তামসিক প্রকৃতির ফল শূদ্রত্ব—দাসত্ব। "পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং।" সেইজন্য বাঙ্গালায় এখন ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকলেই শূদ্র। যে দুই দশ ঘর ছত্রী বা দুই দশ ঘর পশ্চিম দেশীয় বণিক্ বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে বাঙ্গালায় বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা ধর্ত্তব্যই নহে। একে ত বাঙ্গালায় পূর্ব্বেই শূদ্রসংখ্যা বাড়িয়াছিল। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, "প্রাচীন কাল অপেক্ষায় একালে শূদ্রজাতির সংখ্যা বিশেষ প্রকারে বৃদ্ধিপাইয়াছে, তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।...অনার্য্য জাতি সকল হিন্দু-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু শূদ্র জাতি বিশেষে পরিণত হইয়াছে।... এইরূপে কালক্রমে শূদ্রের সংখ্যা বাড়িয়াছে। বর্ণসঙ্কর শূদ্র বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।" এখন বাঙ্গালায় কায়স্থগণও শূদ্র মধ্যে পরিগণিত। বাঙ্গালায় এক্ষণে শূদ্রগণকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে। যথা (১) সৎশূদ্র, (২) নবশাক, (৩) আচরণীয় শূদ্র (৪) অনাচরণীয় শূদ্র ও (৫) অস্পৃশ্য শূদ্র। সুধু তাহাই নহে, এই শূদ্র-প্রকৃতির প্রাবল্যে বাঙ্গালার ব্রাহ্মণও অনেকটা শূদ্র প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়াছে। অন্ততঃ তাঁহাদের সকলের সাত্ত্বিকপ্রকৃতি আরনাই। কাজেই এখন দাঁড়াইয়াছে যে, আমরা সকলেই শূদ্র, সকলেই দাস। আমরা সকলেই অনুকরণপ্রিয়। আমরা নিজে ভাবিয়া কায করিতে পারি না। স্বার্থত্যাগের ত কথাই নাই। আমাদের স্বাবলম্বন আদৌ নাই। আজ বিদেশীয় পণ্ডিত আমাদের যেরূপ বুঝাইবেন, আমরা তাহাই বুঝিব। তাঁহারাই এখন আমাদের ব্রাহ্মণ। বিদেশীয়গণ আমাদের রক্ষা করিতেছে, আমাদের সমাজ নিয়মিত করিতেছে, আমাদের কার্য্য দেখাইয়া দিতেছে—তাহারাই এখন আমাদের ক্ষত্রিয়। আজ বিদেশীয়গণ বা বিদেশী শিক্ষা-প্রাপ্ত—বিদেশী-ভাবাক্রান্ত লোকই আমাদের সমাজের নেতা। তাহারাই আমাদের হইয়া কৃষি, বাণিজ্য, গো-রক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্য করিবে, তবে তাহার উন্নতি হইবে। কেননা এখন আমাদের বৈশ্য-প্রকৃতির উপযুক্ত গুণও নাই। বাঙ্গালায়

প্রকৃত বৈশ্যও কখন ছিল না। বাঙ্গালায় কৃষি-বাণিজ্য,শূদ্র ও বাঙ্গালার আদিম নিবাসীরাই করিত, সেইজন্য বাঙ্গালার কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতিও অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। বাঙ্গালার আদিম নিবাসীরা বৈশ্য-প্রকৃতি হারাইয়াছিল। এখন বাঙ্গালার কৃষিবাণিজ্য শিল্প শূদ্রের হাতে। তাই বাঙ্গালায় তাহার উন্নতি নাই। পশ্চিম উত্তর প্রদেশীয় শেঠী বণিক্, কেরে প্রভৃতি সম্প্রদায় কিরূপ শ্রমশীল,কত অধ্যবসায়ী,কিরূপে সামান্য অবস্থা হইতে, অতি অল্প মূলধন লইয়া আপনার অবস্থা উন্নত করে, বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করে, নিজে ধনশালী হয়, জাতীয় ধন বৃদ্ধি করে, তাহা ভাবিয়া দেখিলেই প্রকৃত বৈশ্য প্রকৃতি কি, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালার সে বৈশ্য নাই—সে বৈশ্যপ্রকৃতি নাই। এইজন্য আমরা এখন বাণিজ্য কৃষিকর্ম্ম করিতে যাইয়া —যৌথ কারবার করিতে যাইয়া, আমাদের অশক্তি অক্ষমতা আমাদের বৈশ্যপ্রকৃতির অভাব এবং অতি সামান্য পরিমাণেও স্বার্থ ত্যাগে আমাদের অক্ষমতা, বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। তাই বলিতেছি যে প্রায় সমস্ত বাঙ্গালীই শূদ্রপ্রকৃতিসম্পন্ন হইয়াছে। অনেকে জ্ঞানার্জ্জনের উপলক্ষ করিয়া লেখাপড়া করে বটে—কিন্তু আমরা প্রকৃত জ্ঞান প্রায় কেহ লাভ করি না। তাহা হইতে আমরা কেবল স্বার্থসিদ্ধির অথবা নীচপ্রবৃত্তি অনুশীলন করিবার পন্থা আবিষ্কার করিয়া লই। বড় জোর জীবিকা নির্ব্বাহের একটা উপায় করিয়া লই মাত্র।

সুতরাং অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়াছে। সমাজের স্বাভাবিক নেতা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অবনতিতে,বাঙ্গালী প্রকৃত নেতার অভাবে, স্বধর্ম্ম প্রতিপালনে দিন দিন পরাঙ্মুখ হইতেছে। বাঙ্গালী স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া, বৃথা অভিমানবশে রাজসিক-তামসিককর্ম্মেই কেবল নিযুক্ত হইতেছে। যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সমাজ নিয়মিত করিতেন, লোকহিতার্থ কর্ম্ম করিতেন, তাহাদিগকে জীবন্ত আদর্শ দেখাইয়া দিয়া প্রকৃত কর্ম্মপথ দেখাইয়া দিতেন, তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন, "নবুদ্ধি ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং" এই মহাবাক্য অনুসারে কার্য্য করিতেন—সেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হারাইয়াই বাঙ্গালার এরূপ দুরবস্থা হইয়াছে। শূদ্র বা বৈশ্যপ্রকৃতির লোক নিজ বুদ্ধিবলে কাজ করিতে পারে না। তাহাদের বুদ্ধি ভ্রান্ত, স্বার্থচালিত, অব্যবসায়ী—তাহার ফল মরণ, কেননা "বুদ্ধিভ্রংশাৎ প্রণশ্যতি।" আবার তাহারা সে বুদ্ধিও নিজে পরিচালনা করিতে পারে না—তাহারা যাহাকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহারই অনুসরণ করে—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেইজন্যই এখন বিধর্ম্মী লোক বাঙ্গালী সমাজের শ্রেষ্ঠ বা নেতা হইয়াছে। ইহার ফল, সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও মরণাভিমুখে সমাজের গতি।

সেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রকৃতির লোকের অভাবে বাঙ্গালার ধর্ম্ম লোপ হইতেছে। সমাজশরীর রক্ষার জন্য যে জৈবশক্তির, যে আকর্ষণের, যে স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন পূর্ব্বে বলিয়াছি, সে শক্তি ক্রমে লোপ পাইতেছে। বাঙ্গালী জাতির এক ধর্ম্মের হানিতে, ধর্ম্ম-অর্থ কাম—এই ত্রিবর্গসাধন অসম্ভব হইয়াছে। বাঙ্গালী সমাজশরীর হইতে প্রাণ শক্তি নির্গমোন্মুখ হইয়াছে, সমাজ দেহ বিশ্লেষণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এখন বাঙ্গালী পরের জন্য কর্ম্ম করা—বা "Struggle for existence for others" এই মহাসত্য ভুলিয়া গিয়া-

ছেন। নিজের জন্য কর্ম্ম ও সেই জন্য "Struggle for self-existence" আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গালী ভুলিয়া যাইতেছে যে, ভক্তির দিক্‌দর্শনযুক্ত, সাধনা কল চালিত, অতিবৃহৎ নিঃস্বার্থ পরহিত-জাহাজ ব্যতীত, প্রজ্ঞাহারী আসক্তি-ঝড় অতিক্রম করিয়া জীবন-সাগর পার হওয়া যায় না, কেবল স্বার্থ-ভেলায় চড়িয়া যাইলে বায়ুর্ণাবামবাত্যসি শুধু বিচলিত ও নষ্ট হইতে হয়। তাই বাঙ্গালী এখন স্বার্থবশে চালিত। যে কোন সামাজিক নিয়ম তাহার স্বার্থকে একটুও সঙ্কুচিত করে, তাহার ইন্দ্রিয় সুখের পথে একটুও বাধা দেয়, বাঙ্গালী সে নিয়ম তখনই পদদলিত করিতে প্রস্তুত হয়। সেইজন্য সমাজে যথেচ্ছাচার প্রবেশ করিয়াছে। একজন যথেচ্ছাচারী হইলে, দশজনে যে তাহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিবে, এ কথা আজ কালের শিক্ষিত বাঙ্গালী মনে করে না। সমাজে দৃষ্টান্ত জন্য নিজের স্বার্থ সংযত করিয়া যে কর্ত্তব্য করিতে হয়, যথেচ্ছাচার প্রবৃত্তিদমন করিতে হয়, বাঙ্গালী তাহা এখন বুঝে না। চারিদিকেই স্বার্থ সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। এই মহা স্বার্থ সংঘর্ষণে, সমাজে যে ভয়ানক সমাজবিপ্লবকারী বা বিনাশকারী মহাকাল-রূপী তপ্তশক্তির আভির্ভাব হইয়াছে, তাহাই বাঙ্গালীকে ধ্বংসের মুখে দ্রুতগতিতে লইয়া যাইতেছে। তাহাই বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ কায়স্থকে আরও অবনত করিয়া দিতেছে, সমস্ত বাঙ্গালীকে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিতেছে। বর্ণ-ধর্ম্ম ও কর্ম্ম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। মোহময় তামসিক শক্তি আসিয়া সমস্ত বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছে। সমাজ-বন্ধন শ্লথ করিয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত সমাজ-ধর্ম্ম বা সমাজের ধারণ, রক্ষণ ও পোষণশক্তি লোপ করিবার উপক্রম করিয়াছে। সমাজ মরণের মুখে যাইতেছে। যদি এ দুর্দ্দিনে বিদেশীয় রাজনীতি বাঙ্গালাকে রক্ষা না করিত, তবে বোধ হয় বাঙ্গালীর এতদিন ধ্বংস হইত। অথবা দারুণ ফরাসীবিপ্লবের মত একটা ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত করিয়া সমাজকে ওতপ্রোত করিয়া দিত।

এতক্ষণে বোধ হয় কতকটা বুঝাইতে পারিয়াছি, যে ধর্ম্মের অভাব ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অবনতিই বাঙ্গালীর বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার প্রধান অথবা একমাত্র মূল কারণ। এস্থলে একটা কথা বলিয়া রাখি যে, বাঙ্গালা অপেক্ষা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও দাক্ষিণাত্যে ধর্ম্মের ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অল্প অবনতি হইয়াছিল, সেখানে বর্ণ ও কর্ম্ম বিভাগ কতকটা সুনিয়মিত ছিল, এই জন্য যে বিরুদ্ধধর্ম্মী রাজনৈতিক শক্তির সংঘর্ষে বাঙ্গালী এত আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে, উক্তপ্রদেশবাসিগণ সেরূপ হয় নাই।

এখন কথা হইতেছে, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের এবং সমস্ত বাঙ্গালী জাতির এ অবনতি, এ ধর্ম্মহানতা কি দূর হইবে না? আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, তাহা দূর হওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইলেও একেবারে অসম্ভব হয় নাই। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সাত্ত্বিক ও শুদ্ধ রাজসিক প্রকৃতি ক্রমে হীন হইয়া গিয়াছে। শূদ্রপ্রধান বাঙ্গালায় তামসিকশক্তির প্রাধান্যই তাহার কারণ। এই সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রকৃতির এই তিন গুণের নিয়ম এই যে, ইহার একটার আধিক্যে অপর গুলি অভিভূত হয়।

ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন:—

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা॥

অতএব তমঃ শক্তির প্রভাবই বাঙ্গালীর ব্রাহ্মণের অবনতির প্রধান কারণ। কথাটা

আর একবার বুঝাইব। তমঃ প্রধান বাঙ্গালার উষর ক্ষেত্রে, আদিশূর রাজা কনোজ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বীজ আনাইয়া নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। তমঃ শক্তির 'আওতায়' তাহাদের সাত্বিক ও দৈবী রাজসিক-শক্তি ক্রমে শুকাইতে লাগিল। কৌলিন্য প্রথা তাহা কতক পরিমাণে রক্ষা করিলেও সে'আওতা'দূর হয় নাই। বাঙ্গালার মুসলমান অধিকার হওয়ায় ক্রমে বাঙ্গালার ক্ষত্রিয় প্রকৃতি একরূপ ধ্বংস হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ প্রকৃতি তখন কতকটা ছিল এবং এখনও আছে বটে, কিন্তু তাহার ধারণ ও রক্ষার জন্য, যে ক্ষত্রিয় শক্তির প্রয়োজন, তাহা বাঙ্গালায় লোপ হইয়া গেল। সুতরাং ব্রাহ্মণের সাত্বিক বা ধর্ম্মশক্তি সমাজে (ক্ষত্রিয়ের দ্বারা) সংক্রামিত হইতে পারে নাই। ক্রমে ব্রাহ্মণের সে সত্ত্ব-শক্তি ও একেবারে লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

অতএব প্রকৃত সাত্বিক প্রকৃতির অভাব বা অবনতি হইতেই বাঙ্গালীর অবনতি হইয়াছে। ইহারই নামান্তর ধর্ম্মের অভাব, ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অবনতি। বাঙ্গালার কথা ছাড়িয়া দাও, যে কোন দেশের কথা ধর,সে দেশ স্বাধীন হউক বা অধীন হউক, সে দেশ অধিক উন্নতিশালী হউক আর না হউক, সে দেশের যখনই ধর্ম্ম,সত্ত্বশক্তি ও সাত্বিক ব্রাহ্মণাদি প্রকৃতির অভাব হইয়াছে, তখনই সে দেশ অধঃপাতে গিয়াছে। প্রাচীন রোম,গ্রীস, মিসর, কার্থেজ প্রভৃতি কত জাতি ইতিহাস বক্ষে মাত্র বিচরণ করিতেছে, কেবল নাম মাত্রাবশেষ হইয়াছে—তাহাদের কথ স্মরণ করিলে—তাহাদের ধ্বংসের কারণ ভাবিয়া দেখিলে,এই তত্ত্ব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিব।

এখন যদি আমরা বাঙ্গালার অবনতির প্রকৃত কারণ বুঝিয়া থাকি, তবে ইহার উন্নতির কি উপায় তাহাও বুঝিতে পারিব। যে ধর্ম্ম শক্তির অভাবে বাঙ্গালা এবং অন্যান্য দেশের অধঃপতন হইয়াছে, সেই শক্তির আবির্ভাব ও প্রচার হইলেই তাহার উন্নতি হইবে। ইটালীর কথা ভাবিয়া দেখ, অন্য যে কোন অধঃপতিত জাতির পুনরুত্থান হইয়াছে, তাহাদের কথা ভাবিয়া দেখ, বুঝিবে এই ধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব, বৃদ্ধি ও বিস্তার হইতেই তাহাদের পুনরুদ্ধার হইয়াছে। বাঙ্গালায় যদি আবার ধর্ম্মশক্তি, সত্ত্বশক্তির বৃদ্ধি করিতে পার, যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে পার, তবেই আবার বাঙ্গালার উন্নতি হইবে। আমাদের সমবেত চেষ্টায় তাহার সম্ভব কিনা, বলিতে পারি না। যাহারা নিজেই তামসিক শক্তিতে অভিভূত— আসুরী ও রাক্ষস প্রকৃতি-সম্পন্ন—তাহারা কি উপায়ে সেই তামসিক শক্তিকে অভিভূত করিয়া, আসুরী ও রাক্ষস প্রকৃতি দমন করিয়া, সাত্বিক শক্তি বা ধর্ম্ম-শক্তির বিকাশ ও বৃদ্ধি করিবে,দৈবী প্রকৃতির সৃষ্টি করিবে, তাহা জানি না। তবে এই মাত্র বুঝি যে, এই খানেই অবতারের প্রয়োজন। হীরেন্দ্র বাবুও তাহাই বলিয়াছেন।

যখন প্রকৃতিতে উচ্চ তড়িতাদি শক্তি কার্য্য রূপে প্রকাশিত হইয়া,নিম্নতর শক্তিতে পরিণত হইয়া, নিস্তেজ হইয়া পড়ে; অথবা বৈজ্ঞানিকের কথায় যখন "higher potential, উচ্চসত্ত্বশক্তি kinetic energy কার্য্য-শক্তি উৎপাদন করিয়া lower potential বা নিম্ন শক্তিতে পরিণত (Dissipated) হয় —যখন সূর্য্যের ন্যায় উচ্চ শক্তির আধার পরমাণুস্তূপ চন্দ্রের ন্যায় শক্তিহীন জড়পিণ্ডে পরিণত হয়, তখন ঐশ্বরীয় শক্তি ব্যতীত, তাহাদের সেই প্রলয় অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া,

স্থষ্টি রূপ কার্য্যশক্তির বিকাশের কারণ উচ্চতর সত্ত্বশক্তিতে পরিণত করিতে পারে,এমন কোন তত্ত্ব আজিও বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিতে পারে নাই। সুধু সিদ্ধান্ত কেন, ধারণাও করিতে পারে নাই।

সেইরূপ জীব জগতে বা মনুষ্য জগতে যখন এই নিম্নতর তামসশক্তি জীবকে অভিভূত করিয়া ফেলে, তখন তাহার মধ্যে উচ্চতর সত্ত্বশক্তির বিকাশ করা মানুষের নিজের পুরুষকারের সাধ্যায়ত্ত নহে। তখন যদি ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহার অবতার না হয়,তিনি যদি মানুষকে এই সত্ত্বশক্তি স্বয়ং না বিলান,চুম্বক লৌহকে নিকটে পাইয়া যেমন তাহাতে চুম্বকশক্তির বিকাশ করে, সেইরূপ মানুষকে নিকটে আনিয়া, সেই অবতীর্ণ পুরুষ যদি তাহাকে সত্ত্বশক্তি না বিলান,অথবা অন্যকোন প্রকারে স্বয়ং ঈশ্বর এই সত্ত্বশক্তির উৎপাদন না করেন, তবে অন্য উপায়ে যে সেই তামসিক প্রকৃতি সম্পন্ন মানুষের বা জাতির উন্নতি হইতে পারে,তাহা আমরা কোনরূপ যুক্তিতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।

বিজ্ঞ মন্ত্রী গ্ল্যাডষ্টোন লিখিয়াছেন —

"The philosophy of Incarnation is indeed a great and indestructible philosophy The Incarnation brought righteousness out of the region of cold abstraction, clothed it in flesh and blood, opend for it the shortest and broadest way to all our sympathies, gave it the firmest command over the springs of human action, by incorporating it in a person, and making it liable to love" *On atonement.* Nineteenth Century, Sept 1894

হীরেন্দ্র বাবু যথার্থ বলিয়াছেন যে, যিনি সাধুদের পরিত্রাণ জন্য,দুস্কৃতের বিনাশ জন্য, ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করেন, যিনি অধঃপতিত বাঙ্গালাতে একবার শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, যদি সময় আসিয়া থাকে বা প্রয়োজন হইয়া থাকে, তবে তিনিই আবার অবতীর্ণ হইয়া বাঙ্গালাকে রক্ষা করিবেন। তিনি যেমন এক জনেতে বা একাধারে বিকাশিত হইতে পারেন,তেমনি অনেকের হৃদয়েও এককালে বিকাশিত হইয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিতেপারেন। বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ কি তাহা জানি না। তবে এই মাত্র বুঝিতে পারি যে, বাঙ্গালার বিনাশ যদি বিধাতার নির্ব্বন্ধ না হয়, তবে যেরূপেই হউক, আবার এই সত্ত্বশক্তির এবং ধর্ম্মের সংস্থাপন হইবেই। এখন আমাদের কর্ত্তব্য —যাহার যতটুকু ক্ষমতা, এই সত্ত্বশক্তির-- এই ধর্ম্মের বৃদ্ধি করি, যাহাতে পূর্ণ সত্ত্বশক্তির বিকাশের পথ পরিষ্কার হয়,গুণাতীত ও গুণাধার পুরুষের আবির্ভাব হইবার উপযুক্ত ভূমি প্রস্তুত হয়,তাহারই জন্য যাহার যত সাধ্য চেষ্টা করি। বাঙ্গালায় যদি কেহ সাধু না থাকেন, বাঙ্গালায় যদি ধর্ম্ম না থাকে, যদি বাঙ্গালা কেবল অধর্ম্মে পূর্ণ হয়, তবে কাহার আকর্ষণ বলে, কাহাকে পরিত্রাণ জন্য বা কিসের রক্ষার জন্য এখানে পূর্ণ ঐশ শক্তির আবির্ভাব হইবে? তাই বলিতেছি,আমাদের যাহার যতদূর সাধ্য ধর্ম্মার্জ্জন জন্য চেষ্টা করিতে হইবে—সাধু হইতে চেষ্টা করিতে হইবে-- নিষ্কাম কর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে, স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত আর আমাদের কর্ত্তব্য নাই। অন্য কর্ম্ম নাই। বাঙ্গালার অভাব দূর ও অবস্থা উন্নত করিবার আর অন্য উপায় নাই। আমাদের আর্থিক বণিজ্যিক বৈষয়িক উন্নতির পথ একেবারে বন্ধ আছে,এমনকি অন্নাভাব পর্য্যন্ত দূর করিবার আমাদের নিজের সাধ্য নাই। আমাদের যাহা সাধ্য, যে কার্য্য করিতে আমরা নিজে পারি, যে কর্ম্মপথ উক্তরূপে আবদ্ধ নহে, আমাদের চেষ্টা ও কার্য্য সেই আধ্যাত্মিক

উন্নতির দিকে নিয়মিত হওয়াই প্রয়োজন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যতীত আমাদের অন্য উন্নতির সম্ভাবনা নাই; ধর্ম্ম রক্ষিত হইলে সকলকেই রক্ষা করেন। আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলে,সকল অভাব সকল দুঃখ ঘুচিয়া যায়। সেদিন বক্তৃতা সভায় কোন বক্তা বলিয়াছিলেন,যখন বৃক্ষের শক্তি 'কুড়িতে' পরিণত হয়, তখন জগতে এমন কোন শক্তি নাই যে, তাহার প্রস্ফুটন বন্ধ করিতে পারে। উপন্যাস লেখক লিটন বলিয়াছেন,বৃক্ষ যখন আলোক অভিমুখে, আলোকের আশ্রয়ে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, তখন কোন বাধা তাহার সে স্ফূর্ত্তি বন্ধ করিতে পারে না। ধর্ম্মই জীবের ও জাতির একমাত্র বিকাশশক্তি। যতক্ষণ সে শক্তি থাকে, ততক্ষণ সে জীবের বা জাতির বিকাশ ও উন্নতি কিছুতেই বন্ধ করিতে পারে না। সেই ধর্ম্ম শক্তিহীন হইলেই জীবের ও জাতির বিনাশ হয়।

অতএব আমাদের এ অনন্ত অভাব দূর করিবার,এ শোচনীয় অবস্থা উন্নত করিবার একমাত্র উপায় ধর্ম্ম। ধর্ম্ম, আমাদের আর উপায়ান্তর,অন্য গত্যন্তর নাই। আসিবে আইস আমরা সেই ধর্ম্ম রক্ষার ও বৃদ্ধির জন্য এ চেষ্টা করি, ও যিনি যুগে যুগে ধর্ম্ম রক্ষার জন্য আবির্ভূত হন তাঁহার প্রতীক্ষা করি এবং জাতীয় শক্তির ও সমাজশক্তির উদ্বোধনের জন্য আরাধনা করি। আইস সকলে প্রার্থনা করি—

"উঠ মা জননি জন্মভূমি।
যোগ নিদ্রা ত্যজ একবার;
হের মা শ্মশান চারিভিতে
শবপ্রায় সন্ততি তোমার।
তোমার অমৃত পরশনে
পাবে দেহে চেতনা আবার;
তোমার করুণা বরিষণে
প্রাণে হবে শক্তির সঞ্চার।
নতুবা কালের আবাহনে
সিন্ধু উঠি মরণের সাতে
লবে সবে অতলের কোলে
বিস্মৃতি যেথায় রাজ্য পাতে।"

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

সারদা ও প্রেমদা।

সারদা পশ্চিমে ডুবে, প্রেমদা উঠিছে পুবে,
জীবন-গগন মধ্যে আমি দাঁড়াইয়া;
অপূর্ব্ব সুন্দরী ঊষা, অপূর্ব্ব সন্ধ্যার ভূষা,
পৃথিবীর দুই প্রান্ত শোভিছে ব্যাপিয়া!

২

সারদা ধরেছে ডা'ণে, প্রেমদা বাঁ হাত টানে,
বুঝিতে পারিনা আমি কোন্ দিকে যাই,
দোঁহারি সমান স্নেহ, বেশ্‌কম নহে কেহ,
দু'জনে ওজনে তুল চুকভুল নাই!

৩

দোঁহারি সমান জোর,প্রাণ ছিঁড়ে যায় মোর,
দু'জনেই চাহে তারা পুরাপুরি নেয়,
দু'জনেই করে আশা, পরিপূর্ণ ভালবাসা,
তিলমাষা নাহি চাহে কেহ কারে দেয়!

৪

সারদা যাইতে ডাকে, প্রেমদা ধরিয়া রাখে,
ঠেকেছি বিষম দায়—বিষম সঙ্কটে,
কে হয় বেজার খুসি,কারে রুষি কারে তুষি,
এমন দারুণ দায় কারো নাকি ঘটে?

৫

চে'তে প্রেমদার পানে, সারদাও মরে প্রাণে,
বুঝি না কেমন হিংসা এ কেমন আড়ি,
দু'জনেই বলে তারা, কেবল তোমারে ছাড়া,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চে'লে তা'ও দিতে পারি!

৬

প্রেমদা পদ্মার কূলে, কোমল শেফালি ফুলে,
করিয়া বাসর শয্যা ডাকিছে আমায়,
সারদা 'চিলাই' তীরে, আমকাঠ দিয়ে শিরে,
আঁচল বিছায়ে ডাকে চিতা-বিছানায়!

৭

নাহি নিশি নাহি দিন, দু'জনেই নিদ্রাহীন,
দুই দিকে দুই সিন্ধু গর্জ্জিছে সমানে,
পাষাণহৃদয় স্বামী, 'পানামা' যোজক আমি,
দু'দিকে ভাঙ্গিয়া নামি দু'জনার বানে!

৮

যদি কভু ভুলে চুকে, কারো নাম আনি মুখে,
অমনি আরেক জন অভিমানে ভোর,
না নড়িতে চুল কণা, সাপিনীরা ধরে ফণা,
ভয়ে ভয়ে সদা আছি হ'য়ে গরুচোর!

৯

কিবা ঘুম কিবা জাগা, দু'জনে পিছনে লাগা,
পারি না তিষ্ঠিতে, বড় পড়েছি ফাঁফরে,
একটু নাহিক স্বস্তি, জ্বালায়ে ফেলিল অস্থি,
হায়! হায়! লোকে কেন দুই বিয়া করে!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

স্বামী।

প্রণাম করলো তায় সেই ত দেবতা তব,
জীবন ফুলের মত, হইবেক বিকশিত,
তাঁহার প্রণয়াদরে শিখিবে গরিমা নব,
বিনে সে চরণরজ ভবে কি বিভব তব?
সে পবিত্র পদরজে, মিশালো এ তুচ্ছ কায়া,
কি ভয় অশান্তি মাঝে থাকিতে এ পদ ছায়া!
সেই পদাম্বুজে লিপ্ত জগত সংসার সব,
নমলো তাঁহার পায় সেই ত দেবতা তব।
নিকটে পবিত্রমূর্ত্তি প্রাণের বাসনা মোর
করিব সে পদ সেবি, এ জীবন-নিশিভোর!

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

দুর্গোৎসবে।

সারা বৎসরের পরে, এলি মাগো ধরা' পরে
নে গো কোলে ছেলেদের তুলি;
আশাপথ ছিল চেয়ে, দেখ তোর দেখা পেয়ে,
'মা' 'মা' করে ডাকে ছেলে গুলি।
যতনে তুলে নে কোলে, মধুর স্নেহের বোলে,
তৃষার্ত্তের হৃদয় জুড়াক্।
আদরে তাদের গায়ে, পদ্মহাত দে বুলায়ে,
রোগ, শোক, তাপ দূরে যাক্।
তোরে মা! বলার তরে, সারাটী বৎসর ধরে,
রেখেছে জমায়ে কত কথা।
অশ্রু ও যাতনা জ্বালা, গেঁথেছে কতই মালা,
বুকে ভরা আছে কত ব্যথা।
মুছে দে মা আঁখি জল, দে বুকে নবীন বল,
দুরবল হোক্ বলীয়ান্।
অন্নপূর্ণে! দে মা অন্ন, ঘুচুক বঙ্গের দৈন্য, —
দুরভিক্ষ-পীড়িত-পরাণ
বাঁচুক দয়ায় তোর, কাটুক আঁধার ঘোর,
হাহাকার ঘুচুক তাদের।
(উথলে নয়ন লোর), ত্রিনয়ন মেলি তোর,
দেখ্ দশা ফরিদপুরের।
শুধু অস্থিমাত্র সার, দাঁড়াইয়া সার সার,
হাজার হাজার তোর ছেলে,
অশন বসন-হীন, কাঙ্গাল দরিদ্র দীন,
ডাকে ওই 'মা'-'মা'-'মা'-'মা' বলে।
কাতর কণ্ঠের ধ্বনি, শূন্যে হয় প্রতিধ্বনি,
জাগাইয়া তোলে দশ দিক্।
এ আর্ত্ত কাতররবে, স্থির আছে যারা সবে,
তাহাদের শতবার ধিক্!
দয়াময়ী তুই মা তো, কভু স্থির রবি না তো,
গেহ হীন, অন্ন বস্ত্র হীন,
এই শত শত ছেলে, মাগো তোর দয়া পেলে,
রক্ষা পায়; ওই স্বল্প-ক্ষীণ

বাজেনা কি তোর কাণে ? পরশে না কি
তোর প্রাণে ?
না না তুই নিদয়া ত নয়,
সন্তানের আঁখি জল, দেখিয়ে কোথায় বল্
জননী অধীরা নাহি হয় ?
এ অভাগী তোর কাছে, আর কিছু নাহি যাচে,
অনাথ সে ভাই বোন্‌দের,
জগন্মাতা মহামায়া ! দে মা তোর পদছায়া,
ঠাঁই আর কোথাব তাদের ?
ঘুচুক্ বঙ্গের দৈন্য, অন্নপূর্ণে ! দে মা অন্ন,
দারুণ ক্ষুধিত ভাই বোনে,
প্রসারি কোমল হস্ত, বস্ত্র হীনে দে মা বস্ত্র,
দে আশ্রয়, নিরাশ্রয় জনে।
মাগো তোর তনয়ার, রেখেছিস্ কিবা আর,
সুখ সাধ নিয়েছিস হ'রে,
সবি তুই দিয়েছিলি, এবি মাঝে কেড়ে নিলি,
এবে এই ধরণী উপরে
আর মোর কিছু নাই—স্বদেশ, ভগিনী, ভাই,
ইহাদেরি মুখ চেয়ে আছি।
এদের দেখিলে দুখ, বিদরে যেন গো বুক,
তাই তোর কাছে এই যাচি।
পূজিতে চরণ মা'র, লয়ে পুষ্প অর্ঘ্য ভার,
কা'রা ভাই দুয়ারে দাঁড়ায়ে,
এ নয় পূজার রীতি, যদি চাও মা'র প্রীতি,
দাও হস্ত দরিদ্রে বাড়ায়ে।
পাপ, তাপ, মলিনতা, ঘুচাও ব্যথীর ব্যথা,
ভেদাভেদ কোরো না গণন।
সাধু-ইচ্ছা, ভাই ! যার, জননী সহায় তার,
এই ব্রত করহ মনন ;
আনন্দ ভকতি স্নেহ, পূর্ণ হোক-বঙ্গ-গেহ,
আত্মপর উচ্চ নীচ জ্ঞান,
হিংসা, দ্বেষ, কুটিলতা, ঘৃণা, ক্রোধ, নিঠুরতা,
সবে তারা করুক্ প্রয়াণ।
সারা বৎসরের মাঝ, শুভদিন ভাই আজ,
এসগো ধরিবে কে এ ব্রত !
ছুঁইয়া চরণ মা'র, কর এ প্রতিজ্ঞা সার,
পরউপকারে রবে রত।
মা'র পূজা এরি নাম, অন্য পূজা নাহি চান,
জননী তোদের কাছ হতে,
বৎসরান্তে একবার, আগমন হয় মা'র,
হিসাব, কাজের তাঁর, ল'তে।
নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম ভাবে, তাঁর প্রিয় সাধ সবে,
আনন্দিতা হবেন জননী।
প্রেমানন্দ শান্তিময়—স্বর্গ আর কারে কয়,
হবে স্বর্গ মোদেরি ধরণী।

শ্রীমতী মৃণালিনী।

শ্রীমৎ রূপ-সনাতন প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

এতদ্দেশীয় মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক প্রভৃতি পত্রিকায় পুরাবৃত্ত, ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজ-নীতি, রাজনীতি, সাধুচরিত, বৈজ্ঞানিক, ও ঐতিহাসিক যাহা কিছু প্রকাশ হয়, বা হই-তেছে, তাহা স্বদেশোন্নতি ও শিক্ষোন্নতির একটী প্রকৃষ্ট উপায়। কারণ,তৎপাঠে লোকের অন্তঃকরণ সুনির্ম্মল এবং বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইয়া ক্রমশঃ

"শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।"

ঈশ্বরের গুণ লীলাদি বীর্য্যের সম্যক্ জ্ঞানলাভ ও হৃদয় কর্ণ আনন্দে আপ্লুত এবং ভক্তি মার্গে শ্রদ্ধা হইবারই কথা। এই জন্য দেশের বড়

বড় লোক, বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায় বহু-চিন্তা ও গবেষণা পূর্ব্বক নানা বিষয় লিখিতেছেন,এবং দেশের হিতানুষ্ঠানে অনেকে মনোযোগ দিয়াছেন। বস্তুতঃ,এ সকল দেখিতে ও শুনিতে বড়ই সুখ।

সংবাদপত্রসমূহের প্রধান কর্ত্তব্য, প্রকৃত ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করা, প্রকৃত সত্যের অবমাননা না করা,আর আপামর সাধারণকে নীতিশিক্ষা প্রদান করা কিন্তু,—

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্নব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।"

যে বিষয় হউক না কেন,সত্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া সত্য এবং প্রিয় বলা উচিত। ফলতঃ কোন প্রসঙ্গ ন্যায়বিরুদ্ধ অথবা শ্রুতিকটু হইলে, কি ভাল দেখায়?

পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমাদের আর্য্য ঋষিতুল্য শ্রীপাদ গোস্বামী মোহান্তগণ ধর্ম্ম বলে বলীয়ান্ হইয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ক্ষমতাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। যাঁহাদের যোগ সাধন প্রভৃতি সত্ব প্রধান ছিল, যাঁহাদের উদার ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি,সমাজনীতি, অমানুষিক শক্তি এবং শিক্ষা দর্শনে এক সময় সমস্ত বিভাগ আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন; যাঁহাদের প্রণীত অভ্রান্ত অপরিহার্য্য ভক্তি শাস্ত্রের এক একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে ইদানীন্তন কালে অনেকের মস্তক ঘূর্ণিত হয়,কি সর্ব্বনাশ! তাঁহাদের লইয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপ।

প্রবাদ সত্যই হউক,আর মিথ্যাই হউক, যে নিন্দায় মহতের মহিমাকে বিনষ্ট করে, ইচ্ছা করিয়া তেমন কথা লিখিয়া প্রকাশ করিতে নাই।

বড়ই দুঃখের বিষয়, বৈষ্ণবজগতের আদি-গুরু,গোস্বামীর প্রধান শ্রীমদ্রূপ ও শ্রীমৎ সনাতন প্রভুদ্বয়, দস্যু, মিথ্যাবাদী, কপট, যবন ও যবন সম্রাটের সামান্য বেতনভুক্ চাকর, প্রজাপীড়ক, এবং অবৈধ উপায়দ্বারা বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন,বিগতভাদ্র আশ্বিন-পঞ্চম-ষষ্ঠ সংখ্যক নব্যভারত পত্রিকায় এবম্বিধ একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যারপর নাই ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়াছি। প্রস্তাবলেখক অজ্ঞ লোক নহেন, অজ্ঞ হইলে কোন কথাই ছিল না। অসত্য উক্তির প্রতিবাদ করিতে আমাদিগের ইচ্ছাও হইত না; কথা গুলি হাসিয়া উড়াইতাম। লেখক অতি বিজ্ঞ,লব্ধনামা শ্রীযুক্ত মিঃ উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম, এ, সি, এস্,। তাই এক চোখে হাসিয়া, এক চোখে কাঁদিয়া প্রতিবাদ ও সমালোচন করিতে হইতেছে।

ভক্তিশাস্ত্র অগাধ সমুদ্র, তন্মধ্যে ডুবিয়া রত্নোদ্ধার কঠিন কথা, তিনি সে গভীরতার ভিতর প্রবেশ করেন নাই। সমস্ত না দেখিয়া, না শুনিয়া না বুঝিয়া কোন বিষয় সিদ্ধান্ত করা কেবল অস্থিরমতিত্বের পরিচয়। মহাকবি কর্ণপুর কৃত (সংস্কৃত) শ্রীচৈতন্যচরিতকাব্য এবং শ্রীশ্রী জীবগোস্বামী প্রণীত লঘুতোষিণী গ্রন্থ যদি তাঁহার দেখা থাকিত,তাহা হইলে উক্ত ভ্রমে পড়িতেন না এবং ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করিতেন না।

উজ্জ্বল ভক্তিশাস্ত্রের মতানুসারে উচিত লেখা হয় নাই। সুতরাং সত্যের পথ হইতে তিনি স্খলিতপদ হইয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্রের কুটিল অর্থ করিয়া সাধারণকে প্রতারিত করা কি তাঁহার ন্যায় মহাশয় ব্যক্তির কর্ত্তব্য?

(১) "অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণায়াবতীর্ণঃ কলৌ।"

বাল্যে সংস্কৃত শিক্ষা না হইলে এমন কবিত লেখনীতে আসা অসম্ভব। শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু প্রথমে যে এই এক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আর শ্রীরূপ ও সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম

শ্রীবল্লভ এবং ভগিনী-পতির নাম শ্রীকান্ত,ইহা হিন্দু নাম থাকাতে তাঁহারা হিন্দু ছিলেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ঠিক।

(২) শ্রীরূপ সনাতনের মধ্যে কে ছোট কে বড়,সে বিষয়ে তিনি সন্দিহান্ হইয়াছেন, অর্থাৎ সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, কিন্তু এ দিকে "রূপস্যাগ্রজ" বলিয়া শ্রীসনাতনের সমসাময়িক শ্রীকবিকর্ণপুর কৃত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। ফলতঃ যখন শ্রীসনাতনের সঙ্গের সঙ্গী শ্রীকবিকর্ণপুর সুস্পষ্ট বিধানে "রূপস্যাগ্রজ" বলিয়া শ্রীসনাতনের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,তখন আবার ছোট বড় লইয়া সন্দেহ কেন? লঘু-তোষিণী গ্রন্থে শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন:—

" আদিঃ শ্রীলসনাতনস্তদনুজঃ শ্রীরূপ নামা ততঃ।
শ্রীমদ্বল্লভ নামধেয় বলিতো নির্ব্বিদ্য যে রাজতঃ॥
ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডের চতুর্থে শ্রীসনাতন শ্রীবল্লভের পরিচয়ে বলিয়াছেন; "আমি আর রূপ তার জ্যেষ্ঠ সহোদর"ইহার অর্থে শ্রীবল্লভের জ্যেষ্ঠ শ্রীরূপ আর শ্রীরূপের জ্যেষ্ঠ শ্রীসনাতন। শ্রীরূপ জ্যেষ্ঠ হইলে শ্রীসনাতন কখনই শ্রীরূপ নাম উল্লেখ করিতেন না। কনিষ্ঠ বলিয়াই নামোল্লেখ করিয়াছিলেন। ফলতঃ শ্রীসনাতনের জ্যেষ্ঠ কেহই ছিলেন না। শ্রীসনাতনের পিতা শ্রীকুমার দেবের অনেক গুলি পুত্র সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু জ্যেষ্ঠ শ্রীসনাতন,মধ্যম শ্রীরূপ,কনিষ্ঠ শ্রীবল্লভ ব্যতীত অন্য কেহ জীবিত ছিলেন না। সকলেই অকালে কালকবলে নিহিত হইয়াছিলেন, এই জন্য তাহাদের নাম পর্য্যন্ত শ্রীজীব কৃত বংশাবলীতে পরিকীর্ত্তিত নাই।

"তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।"

ইহার অর্থে শ্রীরূপ শ্রীসনাতনের জ্যেষ্ঠ নহেন। তাহার অর্থ স্বতন্ত্র। বিগত মাঘ-একাদশ খণ্ড দশমসংখ্যক নব্যভারতের ৫২৪ পৃষ্ঠায় তাহার মীমাংসা আছে। শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু শ্রীরূপ,শ্রীসনাতনের জ্যেষ্ঠ বলিয়া কোথা হইতে সে অর্থ টানিয়া লইয়াছেন, আমরা কোন গ্রন্থে সে নজীর খুঁজিয়া পাইলাম না। তবে ছোট বড় লইয়া এই এক প্রশ্ন হইতে পারে, যদি শ্রীরূপই কনিষ্ঠ, তবে শ্রীসনাতনের নামের পূর্ব্বে রূপের নাম কেন?

উত্তর। সম্বোধন স্থলে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ লইয়া অনেক স্থলে উল্টাপাল্টা নাম ব্যবহৃত হয়; যথা—কানাই বলাই, কার্ত্তিক গণেশ, অতুল-উমেশ,প্রভৃতি এমন উদাহরণ অনেক আছে। তা'তে কি আসে যায়? স্ত্রীলোকেরা কথায় বলে;—

" যে যে নামে মানায় ভাল।
সেই সেই নাম, বাসি ভাল॥
ছোট বড়য়, কিবা কাজ।
যে দুষে তার, মুণ্ডে বাজ।"

সম্বোধন কালে যে যুক্তনাম কোমল হয়, সেই সেই নাম লোকে ব্যবহার করে। রূপ-সনাতন বলিলে যত মিষ্ট হয়, সনাতন রূপ বলিলে তত মিষ্ট হয় না। কোন কোন ভক্ত বলেন, শ্রীরূপ অগ্রে বৈরাগ্য করিয়াছিলেন, শ্রীসনাতন তৎ পশ্চাৎ বৈরাগ্য করেন, এজন্য শ্রীরূপ বৈরাগ্যে বড়, কিন্তু সনাতন অপেক্ষা বয়সে বড় নহেন।

(৩) দুই ভাই রাজ সংসারে মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত হইবার কালে তখনকার নিয়মানুসারে শ্রীরূপ "দবীর খাস" এবং শ্রীসনাতন "সাকের মল্লিক" এই উপাধি পাইয়াছিলেন। দবীরখাসের অর্থ সুলেখক, উমেশ বাবু তা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ সাকের

শব্দের অর্থ দাতা, অর্থাৎ উর্দ্দু ভাষায় সাওকর। খাসমন্ত্রীশব্দে "দাবা" শতরঞ্চক্রীড়ায়, মূর্খেরাও তা বুঝে।

হরিভক্তি প্রকাশিকা নামক গ্রন্থে বিদিত আছে, শ্রীসনাতনের পিতৃদত্ত নাম "অমর", আর শ্রীরূপের নাম "সন্তোক" যথা,—

"অমর সন্তোক নাম, পূর্ব্বেতে আছিল।
সনাতন রূপ নাম, পশ্চাৎ হইল॥"
"দবীর খাস আব, সাকের মল্লিক।
খেতাবেতে এ দোঁহার, প্রভাব অধিক॥"

ফল কথা, দবীর আব সাকের ইহা প্রকৃত মুসলমান নাম নহে। উপাধি—উপাধি—রাজপ্রদত্ত উপাধি।

প্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী যে উত্তম লেখক ছিলেন, সে পরিচয় অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার অক্ষরের স্তুতি ও প্রশংসা করিয়াছিলেন। যথা;—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডের প্রথমে;—

"শ্রীরূপের অক্ষর যেন, মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হয়ে করে প্রভু, অক্ষরের স্তুতি॥"

সুতরাং দবীর খাস নামের অর্থ ইহাই যথেষ্ট। শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু দবীর খাস নামের স্থলে যে সনাতন বলিয়া, বার বার উল্লেখ করিয়াছেন, সেটী তাঁহার ভুল। আরো একটী মহৎ ভুল এই যে, শ্রীরূপ ও সনাতনের অবরজ বল্লভ ও ভগিনীপতির নাম শ্রীকান্ত থাকায়, যখন তাঁহাদিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন আবার মুসলমান বলিয়া সন্দেহ কেন? তাঁহার লেখনী না হয় দ্বিজিহ্বা, কিন্তু তিনিও কি তাই? তিনি নিজের মত সমর্থন করিয়া বলুন দেখি, মুসলমানের বালক কে কোথায় বাল্যে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছে? আমরা অনেক মুসলমান বালক কে অধ্যয়ন করিতে দেখিয়াছি, তাহারা বাল্যকালে স্বজাতীয় ধর্ম্ম পালনের নিমিত্ত কোরাণের মতানুসারে শিক্ষার পূর্ব্বে "আম সোওরা" নামে আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা ও আলোচনা করে। রাজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার কালে শ্রীরূপ সনাতন যবন হন্ নাই, কলমাও পড়েন নাই; নবগুণ পৈতাও ত্যাগ করেন নাই।

"আসনাচ্ছায় নাদানাৎ সম্ভাষাৎ সহ ভোজনাৎ।
সংক্রামন্তীহ পাপানি, তৈল বিন্দু রিবাম্ভসি॥"

মহর্ষি পরাশরোক্ত বচন ক্রমে হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পালন করিতেন। যবনের সহিত একাসনে বসিয়া কাজ করা দূরে থাক্, তাহাদের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াইতেন না।

কথিত আছে, শ্রীরূপ সনাতনের পিতা শ্রীকুমার দেব বড়ই শুদ্ধাচার ছিলেন। এমন কি, অকস্মাৎ যবন দেখিলে অন্ন গ্রহণ করিতেন না। "পশ্চাদ্ জ্ঞানতো বাপি কুর্য্যাদ্ভাস্কর দর্শন।"

প্রায় শিশু স্বরূপ সূর্য্য দর্শন করিয়া পবিত্র হইতেন।

ভক্তিরত্নাকরে আছে,—

"শ্রীমুকুন্দ দেবের, নন্দন শ্রীকুমার।
বিপ্রকুল প্রদীপ, পরম শুদ্ধাচার॥
সদা যজ্ঞাদিক ক্রিয়া, নিভৃতে করয়।
অনাচার জন স্পর্শে, অতি ভীত হয়॥
যদি অকস্মাৎ কভু, দেখয়ে যবন।
করয় প্রায়শ্চিত্ত অন্ন না করে গ্রহণ॥"

শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ এবম্প্রকার পিতৃধর্ম্ম সতত রক্ষা করিতেন। অনান্যত নিবন্ধন বিশেষ রাজদণ্ড ভয়ে তাঁহাদিগকে মন্ত্রিত্ব পদ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এখনকার কালে ম্লেচ্ছসেবা, এমন অনেক ম্লেচ্ছভক্ত আছে; "খানা পিনা পান পানীর, না করে আয়েব।" যাঁহারা আলালের ঘরের দুলাল আর "বোয়াটিয়া গোছ" সেই সকল হিন্দু সন্তান ইংরাজি শিক্ষার কাল হইতে শিক্ষার চূড়ান্ত পর্য্যন্ত, কি খাদ্যে কি পরিচ্ছদে সকল বিষয়েই ম্লেচ্ছ অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়া মাতা, বিমাতা, ভগ্নী ও ভ্রাতৃজায়া প্রভৃতির প্রস্তুত অন্নাদি অর্থাৎ স্বাভাবিক খাদ্য পরিহার করতঃ অমৃত বোধে ম্লেচ্ছখানা অবলেহন করে। পান পানা দোষ বলিয়া গণ্য করে না। ম্লেচ্ছ তাহাদিগের গায়ের ঘাম, এমন কি "কাজী সাহেব হাত ধরিলে জাতির ছারে করবে কি?" তা কাজের জন্য বা পেটের দায়ে অনেকে ইংরেজের পদানত ও খানায় প্রবৃত্ত। কিন্তু শ্রীরূপ ও সনাতন, সে ধরণের লোক ছিলেন না।

"আঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজনং।"

পাছে রন্ধনের গন্ধ নাসা রন্ধ্রে প্রবেশ হয়, তাঁহারা সেই ভয়ে রাজমহল ছাড়িয়া গৌড়ে আজ পর্য্যন্ত শ্রীরূপ সনাতনের যে "বারদুয়ারি" নামে প্রসিদ্ধ অট্টালিকা আছে, তাঁহারা তাহাতে বসিয়া এবং কেবলমাত্র হিন্দু ভদ্রসন্তানদিগকে লইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন।

শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু, শ্রীরূপ ও সনাতনের যবনত্বের বিষয় এই কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—

(১) চৈতন্যের অনুচর বর্গের মধ্যে হরিদাস রূপ, সনাতন, শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতেন না।

(২) রামকেলী গ্রামে চৈতন্যের সহিত তাহাদিগের যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন তাহারা ম্লেচ্ছজাতি ম্লেচ্ছসঙ্গা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল।

(৩) সনাতন কারাবদ্ধকালে কারাধ্যক্ষের নিকট মক্কায় যাইবার কথা প্রকাশ করিয়া মুক্তি প্রার্থনা করে।

(৪) সনাতন যখন কারাগার হইতে পলাইয়া কাশীতে গিয়া চৈতন্যের নিকট উপস্থিত হয়, তখন তাহার মুসলমান বেশ ছিল।

উত্তর। প্রথমতঃ হরিদাস যবনকুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্ম ঔরসে ব্রহ্মকুলে (জেলা যশোহরের অন্তর্গত) বুঢ়ন গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া তত্রস্থ বেণাপুরের জঙ্গলে থাকিতেন। পূর্ব্বে রাজা দুষ্মন্তের পত্নী দেবী শকুন্তলা, শকুনীকর্ত্তৃক যেরূপ রক্ষিতা ও পশ্চাৎ মহাতপা কণ্বমুনি কর্ত্তৃক পালিতা হইয়াছিলেন, ব্রহ্ম হরিদাস সেইরূপ শৈশবে পিতামাতা বিয়োগ জন্য, জনৈক যবন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া পশ্চাৎ (নদীয়া জেলার অন্তর্গত) গঙ্গাতীরস্থ "ফুলিয়া গ্রাম" যে গ্রামে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বসতি, আর সপ্তকাণ্ড রামায়ণ প্রণেতা পণ্ডিত কৃত্তিবাস বাস করিতেন, কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইবার কালে "হরিদাস" তথায় পর্ণকুটীর বাঁধিয়া বাস করিতেন। এবং তত্রস্থ ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণে শ্রীহরিদাসের অটল ভক্তি ছিল। তিনি শান্তিপুর স্বামী শ্রীশ্রীঅদ্বৈত মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রতিদিবস তিন লক্ষ হরিনাম করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু যখন নীলাচলে, তখন হরিদাস শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকটে গমন করিয়া প্রভুর নিকটে থাকিতেন অন্য কোথাও যাইতেন না; এবং হরিনাম নিয়ম ভঙ্গ করিতেন না। নির্জ্জনাশ্রমে থাকিয়া অহর্নিশি হরিনাম করিতেন। একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিদাসের মনোবৃত্তি জানিবার নিমিত্ত হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করেন;" হরিদাস? শাস্ত্রে আছে যে,

"জগন্নাথমুখং দৃষ্টা, পুনঃ জন্ম ন বিদ্যতে॥"

জগন্নাথের মুখ দর্শন করিলে পুনঃজন্ম হয় না, সেরূপ সুগম পথ থাকিতে তুমি পুরীর মধ্যে প্রবেশ বা শ্রীজগন্নাথ দর্শন না কর কেন? হরিদাস উত্তর করিলেন;—

"তোমাছাড়ি কাঁহা যাইতে মন নাহি লয়।
কিজানি যাইলে পাছে নিয়ম ভঙ্গ হয়॥"

প্রভু! পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরের শ্রীমুখ দর্শন করিবার আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য্য দর্শনে আমার ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ হরিনাম নিয়ম ভঙ্গ করিয়া অথবা তোমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে আমার মন অগ্রসর হয় না। কল্প বৃক্ষতল আশ্রয় করিয়া অন্যত্র গমনে কোন ফল নাই, ফলেরও প্রত্যাশা নাই। যাঁহারা সে ফলের আকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে জগন্নাথ দর্শন করুন, আপনার শ্রীচরণ আমার একমাত্র আশ্রয়। মাধুর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে বহু ভেদ। কথায় আছে; "আমতলায় থাকিলে যদি আম পাওয়া যায়, অন্য তলায় যাইবার দরকার কি?"

প্রভু হরিদাসের এই উত্তর শুনিয়া বলিলেন, সাধু! সাধু! সাধু! হরিদাস, তুমি যে নামই ব্রহ্ম বলিয়া সার করিয়াছ, ইহাতে তুমি ধন্য! ভগবদ্‌মূর্ত্তি দর্শন অপেক্ষা নামের ফল অধিক যথা;—পদ্মপুরাণে;—

'নামৈব পরমং ধর্ম্ম, নামৈব পরমন্তপঃ।"

ইহাতে সুস্পষ্ট বোধ হইবে (যবন বলিয়া নহে) শ্রীহরিদাস একমাত্র হরিনাম সার করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন পুরী মধ্যে প্রবেশ করিতেন না। ক্রমশঃ।

শ্রীহারাধন দত্ত ভক্তিনিধি।

দ্বাদশ খণ্ড—দশম ও একাদশ সংখ্যা। মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩০১।

নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

কলিকাতা,

১/১ শঙ্করঘোষেরলেন, নব্যভারত-বসুমতী প্রেসে, শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত,

২১০/৪নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, নব্যভারত-কার্য্যালয় হইতে

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৫ই ফাল্গুন, ১৩০১।

সমেত বার্ষিক মূল্য ৩৲]

[এই সংখ্যার মূল্য ৷৵০ আনা।

সম্পাদকের নিবেদন।

মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা নব্যভারত, পূর্ব্ব বিজ্ঞাপনানুসারে, একত্রে প্রকাশিত হইল। চৈত্র সংখ্যা নব্যভারত যথা সময়ে প্রকাশিত হইবে, আশা করি। আমার অসুস্থতা-নিবন্ধন কিছু বিলম্ব হইলে গ্রাহকগণ ক্ষমা করিবেন। ফাল্গুনের বাকী ৩ ফর্ম্মা ঐ সংখ্যার সংলগ্ন হইবে।

আমার শরীর বড়ই অপটু হইয়াছে; চারি মাসের অধিক কাল যাবৎ একটু জ্বর অবিচ্ছিন্নভাবে লাগিয়া রহিয়াছে, তাহার উপর আবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুইবার জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি হয়। বায়ুপরিবর্ত্তন জন্য ২রা মাঘ মধুপুর *(E.I.R.)* আসিয়াছি। আজও দারুণ জ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাই নাই। এই বিপদের সময়ে অর্থ চিন্তাতে অস্থির আছি। চৈত্রমাসে আমাদের সমস্ত দেনা পরিশোধ করিতে হইবে। গ্রাহকগণ এই বিপদের দিনে যদি আমাদিগকে অর্থচিন্তার হস্ত হইতে রক্ষা করেন, জীবন পাইব। আশাকরি, দয়া করিয়া সকলেই কিছু কিছু পাঠাইবেন। টাকাকড়ি পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্যালয়ের ঠিকানাতে ২১০।৪ কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীটেই পাঠাইবেন।

নব্যভারতের এজেণ্ট বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদার এবং বাবু যজ্ঞেশ্বর মল্লিক মূল্য আদায় করিতে কোথাও উপস্থিত হইলে, গ্রাহকগণ আমার স্বাক্ষরিত রসিদ লইয়া ও টাকার পরিমাণ চেকের মুড়িতে লিখিয়া দিয়া মূল্য প্রদান করিবেন।

মূল্যাদি প্রেরণের সময় গ্রাহকগণ দয়া করিয়া নামের নম্বর লিখিবেন, নচেৎ আমাদিগকে বড় কষ্ট পাইতে হয়।

কটক কলেজের প্রোফেসর বাবু জয়গোপাল দে মহাশয়ের "গীতা-সমালোচনা" প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কেহ কেহ এত বিরক্ত হইয়াছেন যে, গয়েবুল্লা পত্র দ্বারা আমাদিগকে কদর্য্য ভাষায় গালাগালি দিয়া ধর্ম্মবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ কাপুরুষতা এ দেশের গৌরব। আমরা যে কোন প্রবন্ধের প্রতিবাদ, উপযুক্ত হইলেই, ছাপাইয়া থাকি। এ প্রবন্ধ শেষ হইলে ইহার উপযুক্ত প্রতিবাদ পাইলেও ছাপাইব। এ পত্রিকার সম্পাদক কোন প্রবন্ধের মতামতের জন্য দায়ী নহেন। আমরা স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী।

বহু সমালোচনার পুস্তক জমিয়াছে, শরীরের অসুস্থতার দরুণ সমালোচনা হইতেছে না, গ্রন্থকারগণ ক্ষমা কবিবেন।

ভীষ্ম।

বুঝিবা কাব্য-জগতে ভীষ্মের সমতুল্য চরিত্র আর নাই। প্রতিজ্ঞার অটল সিংহাসনে উপবিষ্ট, স্বার্থত্যাগের উজ্জ্বল কিরীটে সুশোভিত,জ্ঞানও বীরত্বের সমন্বয় স্বরূপ এতাদৃশ দেবচরিত্র আর কোথায় আছে? রামের পিতৃভক্তি ও কৃষ্ণের নিষ্কাম ধর্ম্ম,ভীষ্মের পিতৃভক্তি ও নিষ্কাম জীবনের নিকট ছার! বিপুল ঐশ্বর্য্যের পরিত্যাগ, প্রবল ইন্দ্রিয়ের সংযমন, দীর্ঘ জীবনের নিষ্কাম ভোগ, কাব্য-জগতের কি অতুল্য সৃষ্টি!!! যদি ধর্ম্মই কাব্য, তবে এই কাব্য-জীবনের উপাসনা কর না কেন?

উপাসনা করিবে কি? পৌরাণিক হিন্দু রত্ন চিনে কই? বসু-শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে ভস্মে সমাবৃত করিয়াছে! দেবোপম দেবব্রতকে নরাধমরূপে পরিণত করিয়াছে!

এই নিষ্কাম জীবন নাকি মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল? এই বীরশ্রেষ্ঠ ও ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠের জীবন নাকি অন্নসংগ্রহে অক্ষম হইয়া অধার্ম্মিক ও মহাপাপী দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল? শুন, ভীষ্মচরিতে রজনীকান্ত গুপ্ত বলিতেছেন কি! যথা—

"মানুষ অন্নের দাস। আমি যৌবনে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কুরুরাজের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছি, এক্ষণে আমার বার্দ্ধক্যদশা উপস্থিত হইয়াছে। এত দিন যাঁহাদের অন্নে জীবন ধারণ করিলাম, এখন তাঁহাদের আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য। তোমরা ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ উভয় পক্ষই আমার সমক্ষে তুল্য। কিন্তু আমি ধৃতরাষ্ট্র তনয়ের অন্ন গ্রহণ করিতেছি, সুতরাং প্রতিপালক প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তী না হইলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইব।"

ভীষ্মচরিত, ১৭০ পৃষ্ঠা।

আর এক মহাপ্রভু তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় শিশু মহাভারতেও ঐ কথার রোমন্থন করিয়াছেন।

"কিন্তু কর্ণ ও ভীষ্ম প্রভৃতি সকলে এতদিন কুরুগণের নিকট জীবন ধারণ করিয়াছেন, এই জন্য কুরুপক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকাই তাঁহারা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া স্থির করিলেন।" শিশুমহাভারত ৭৬।৭৭ পৃষ্ঠা।

তবে এ সকল স্কুল-সাহিত্য; এবম্বিধ পৌরাণিক মাল আমদানি করাই এ সকল পুস্তকের পাস-মার্কা। দুরাদৃষ্টের কথা এই, রজনী বাবুর ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিতও এরূপ জিনিষের ফেরি করাই শ্লাঘ্য মনে করিতেছেন!

কেবল রজনী বাবু কেন,নবীন বাবুও কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মকে "পাপের আশ্রয় দাতা"বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"শিষ্য। মানিলাম দুর্য্যোধন পাপী দুর্বিনীত;
কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ নৃপতি মণ্ডল?
ব্যাস। পাপের আশ্রয়দাতা অধর্ম্মে পতিত
জ্বালাইল সবে এই সমর-অনল।
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, নরপাল যত
অসংখ্য বীরেন্দ্র বৃন্দ না হলে সহায়
হইত কি দুর্য্যোধন এই পাপে রত,
নদীস্রোতে রক্তস্রোত বহিত কি হায়?"

কুরুক্ষেত্র—১ম সর্গ ৮ পৃঃ।

এ কথাগুলি কি নবীন বাবুর হৃদয়ের কথা? নবীন বাবুর ত রজনী বাবুর মত ফেরি করিবার আবশ্যক নাই। যাঁহার হৃদয়ে অতুল্য কবিত্ব, আর্ত্তের জন্য সহানুভূতি ও মহত্ত্বের সমাদর নিঃসন্দেহ বিদ্যমান, তিনি এই মহামহিম চরিত্রকে "পাপের আশ্রয় দাতা" কেন বলিলেন,তাহা বুঝিতে পারি নাই। এই নবীন বাবুই কৃষ্ণের মুখে ভীষ্মের কি মহিমা গান গাইয়াছেন, শুন;—

"কহিলেন কৃষ্ণ—আর্য্য। একি কথা হায়,
জগতে কাহাকে তবে করিব প্রণাম?
পবিত্র জীবন যার বীরত্বের গাথা,
জগতের ইতিহাসে রবে অতুলিত;

দশ দিবসের যুদ্ধ শরশয্যা যার
করিবে মানবজাতি বিস্ময়ে পূরিত ;
পিতৃভক্তি, নিষ্কামজ আত্মবিসর্জ্জন,
প্রতিজ্ঞা জিতেন্দ্রিয়তা, হইবে ঘোষিত
অনন্তকালের কণ্ঠে প্রবাদের মত,
মানবের কর্ম্মপথ করি আলোকিত ;
মানব জগতে রবে হিমাদ্রির মত,
বিরাট গগনস্পর্শী মূরতি যাহার,
তার পদ-তীর্থে নাহি প্রণমিবা হায়।
নমিব মানব আমি চরণে কাহার ?"

কুরুক্ষেত্র ৯ম সর্গ ১২৬।১২৭ পৃ"।

ভীষ্মের শর-শয়নে এই কবির হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব বিস্ময়জনক ভাব উদ্ভূত হইয়াছে, দেখ ;—

"লিখিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি কালের হৃদয়ে
অস্ত্রমুখে, রণক্ষেত্রে রুধির প্লাবিত,
সিন্ধুগর্ভে অস্তমান অংশুমালী মত
ভীমকর্ম্মা ভীষ্মদেব শরশয্যাগত।"

কুরুক্ষেত্র—১০ম সর্গ—১৪৯ পৃ"।

"সিন্ধুগর্ভে অস্তমান অংশুমালী মত"ভীষ্মের "পবিত্র জীবন" আবার এই কবিরই বিবেচনায় "পাপের আশ্রয় দাতা।" যাঁহার "পদ তীর্থে"কৃষ্ণপ্রণত,যাঁহার পিতৃভক্তি নিষ্কামজ ; আত্মবিসর্জ্জন,প্রতিজ্ঞা,জিতেন্দ্রিয়তা মানবের কর্ম্ম-পথ আলোকিত" করিয়া "অনন্তকালের কণ্ঠে প্রবাদের মত ঘোষিত হইবে," তিনিই নাকি পাপের আশ্রয়দাতা!!! জাতীয় কাব্যেরপক্ষে এতদপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কি আছে ?

আর নবীন বাবুর নিকটে থাকিলে আমাদের আশা মিটিতেছে না। আমরা সেই নৈমিষারণ্যের পুরাণ গুদামের নিকটই উপস্থিত হইব। দেখি, ভীষ্মের পাপ-পক্ষাবলম্বনের সেখানে কি উত্তর আছে ?

বোধ হয় পাঠকেরা অবগত আছেন, যখন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন ত প্রথমতঃ এক কিস্তি গীতা পাঠ হইয়া অর্জ্জুনের বৈরাগ্য নিবারিত হইল। গীতার মত উপদেশবাক্য বলিবার জন্য কৃষ্ণের আর সময় হইয়াছিল না!!! অর্জ্জুনেরই বা আর সময় কই—রথে বসিয়াই গীতা শুনিয়া লইলেন। ইহাতেও নৈমিষারণ্যের মস্তিষ্ক থামিতেছে না। যুধিষ্ঠির এত বড় যুদ্ধের আয়োজন করিলেন ; ভীষ্মাদি গুরুজনের পদবন্দন হইয়াছে কই। তাঁহাদের অনুমতি ত লওয়া হয় নাই। লঘুগুরুভেদ না হইলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মর্ম্ম বিনষ্ট হয়, এজন্য যখন "ভেরী, পেশী ও গোশৃঙ্গ বাজিয়া উঠিল"যুদ্ধআরম্ভ হইতে আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব নাই, তখন যুধিষ্ঠির "কবচ পরিত্যাগপূর্ব্বক ও আয়ুধনিক্ষেপপূর্ব্বক রথ হইতে অবতরণ করিয়া" ভীষ্মের পদদ্বয় "দৃঢ়রূপে ধারণ" করিতে অগ্রসর হইলেন। ভীষ্মের "অনুমতি" ভিন্ন ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করা কি প্রকারে হইবে ? কতবার দূতের আসা যাওয়া হইয়াছে,এবম্বিধ অনুমতি গ্রহণ বাকী ছিল,তাহা এখন গৃহীত হইল। আর হইল, ভীষ্ম কেন কৌরব পক্ষাবম্বন করেন, তাহার কৈফিয়তের কাটাকাটি। আমরা এই অংশ বিস্তারিত রূপে উদ্ধৃত করিতেছি।

"মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ পরিবৃত হইয়া শর শক্তি সমাকুল শত্রুসৈন্য অবগাহন পূর্ব্বক শীঘ্র ভীষ্ম সমীপে উপনীত হইলেন এবং যুদ্ধ নিমিত্ত সমুপস্থিত শান্তনুনন্দন ভীষ্মের চরণদ্বয় করদ্বয় দ্বারা দৃঢ়ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, হে দুর্দ্ধর্ষ। আমি আপনাকে নিবেদন করিতেছি, আপনার সহিত আমরা যে যুদ্ধ করিব, তাহাতে আপনি আমাকে অনুমতি করুন। ভীষ্ম কহিলেন, হে পৃথিবীপতি ভারত! যদি তুমি আমার নিকট এইরূপে না আসিতে,তাহা হইলে আমি তোমার পরাভব নিমিত্ত অভিশাপ দিতাম। হে বৎস! আমি তোমার প্রতি প্রীত হইলাম, তুমি যুদ্ধ কর, যুদ্ধে জয়লাভ কর এবং অন্য যাহা তোমার অভিলাষ থাকে, তাহাও প্রাপ্ত হইবে ; তুমি আমার নিকট কি বর প্রার্থনা করিবে, তাহা ব্যক্ত কর, এরূপ হইলে

তোমার পরাজয় সম্ভাবনা নাই। মহারাজ, পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, ইহাই সত্য; আমি অর্থ দ্বারা কৌরবদিগের নিকট বদ্ধ রহিয়াছি, অতএব তোমার নিকট আমার এই নিরর্থক বাক্য বলা হইতেছে যে, আমি কৌরবদিগের নিকট অর্থের বশতাপন্ন হইয়া ভুক্তিভুক্ হইয়াছি, তুমি যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কি ইচ্ছা কর প্রকাশ করিয়া বল।"

ভীষ্মপর্ব্ব (বঙ্গবাসী সংস্করণ) ৪২ অধ্যায় ৮৭০পৃঃ।

অতঃপর কিঞ্চিৎ শিষ্টালাপের পর, যুধিষ্ঠির মনের কথা বলিয়া ফেলিলেন;—

"আপনি সমরে শত্রুকর্তৃক পরাজয়ের উপায় বলুন।"

"ভীষ্ম কহিলেন হে তাত। সমরে আমাকে যে কেহ জয় করিতে পারে, তাহা দেখিতেছি না এবং এক্ষণে আমার মৃত্যুকালও উপস্থিত হয় নাই। অতএব তুমি পুনর্ব্বার একবার আমার নিকট আগমন করিও।"

ঐ পর্ব্ব, ঐ অধ্যায়।

আবার ঐ পর্ব্বের ১০৪ অধ্যায়ে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

"তোমার হিতনিমিত্ত আমি সুমন্ত্রণা প্রদান করিব, কোন ক্রমেই যুদ্ধ করিব না অপিচ দুর্য্যোধনের নিমিত্ত যুদ্ধ করিব, সত্য জানিবে।"

পাঠকেরা বোধ হয় অবগত আছেন, নবম দিবসের যুদ্ধের পর ভীষ্ম স্বীয় পরাভবের উপায় যুধিষ্ঠিরকে বলিয়া দিয়া শরশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন।

এই কথাগুলি ভাবিয়া দেখিলে কি ভীষ্মকে মীরজাফরের মত বোধ হইতেছে না? ভীষ্ম দুর্য্যোধনের সেনাপতি। মহারাজ দুর্য্যোধন প্রাণতুল্য বন্ধু কর্ণকে পরিত্যাগ করিয়াও পিতামহকে অচল বিশ্বাস সহকারে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। আর সেই ভীষ্ম তলে তলে বিপক্ষকে "সুমন্ত্রণা প্রদান" পূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতেছেন। নিজের পরাভবের অর্থাৎ কুরুসৈন্যের সর্ব্বনাশের উপায় বলিয়া দিয়া শত্রুকে জয়লাভে প্রোৎসাহিত করিতেছেন। ধার্ম্মিকপ্রবর, স্বার্থত্যাগী ভীষ্মের চরিত্রে এবম্বিধ বিশ্বাসঘাতকতা আরোপের কি উত্তর হইতে পারে?

আমাদের শুনিতে হইতেছে, এই বিশ্বাসঘাতকতা আবার তাঁহাকে "অন্নদাস" বা "অর্থদাস" হইয়া করিতে হইয়াছিল। যাহাকে জগতে কেহ পরাজয় করিতে পারিত না, পাপের সহায়তা ও বিশ্বাসঘাতকতা ভিন্ন কি তাঁহার আর অন্নসংস্থানের উপায় ছিল না? যিনি ভারতসাম্রাজ্যের আধিপত্য লোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিলেন, কেন অর্থের বশীভূত হইয়া তিনি পাপাচারে ও বিশ্বাসঘাতকতায় দ্বিধা করিলেন না? জ্ঞানতঃ দুষ্কার্য্য করিয়াই জীবন শেষ করিলেন। কোন পৌরাণিক কি ইহার উত্তর দিতে পারেন? আমাদের সন্দেহ হইতেছে, এই মহামহিম চরিত্রের উপর কৃত্রিমতার তুলি বড় বেশী রঙ্গ ঢালিয়াছে। হইতে পারে, ইহা বঙ্কিম বাবুর মতানুসারে মহাভারতের দ্বিতীয়স্তরের লেখক অনেক মহাকবির শিল্পনৈপুণ্য, কিন্তু ইহাতে জাতীয় চরিত্রের সর্ব্বনাশ করিয়াছে।*

ভীষ্ম চরিত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা দুর্য্যোধন চরিত্রে। দুর্য্যোধনকে যাঁহারা স্বদেশহিতৈষী ধার্ম্মিক বলিয়া বুঝিতে পারেন, ভীষ্মচরিত্র তাঁহাদের পক্ষে বুঝা কঠিন নহে। দুর্য্যোধন অনার্য্যগণের প্রতিনিধি, ইহা পূর্ব্বেই এক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে। ভীষ্ম আর্য্য বটে, কিন্তু অনার্য্যের দুঃখে দুঃখিত। ফলে ভীষ্ম ও দুর্য্যোধন আর্য্যানার্য্যের আদি গ্রন্থি বা হিন্দুত্বের

* ইহা তৃতীয় স্তরের কবির লেখা নহে, কেন না তৃতীয় স্তরের কবি কৃষ্ণ-বিরোধী। ভীষ্মচরিত্র লেখক কৃষ্ণভক্ত। বঙ্কিম বাবু ইঁহাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস নামক কল্পিত কবি বলিয়া ভাবিয়াছেন। (কৃষ্ণচরিত্র দেখ)

বীজ। যাহারা হিন্দু কি বুঝিতে পারে, তাহারা দুর্য্যোধন ও ভীষ্মকে চিনিতে পারে। আর যাহারা হিন্দুত্ব ও ব্রাহ্মণপ্রাধান্য এক পদার্থ বলিয়া ভ্রম করিতেছে, তাহাদের ভীষ্ম ও দুর্য্যোধনকে চিনিবার উপায় নাই।

যে সময় কুরুপাঞ্চালে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, সে সময় ব্রাহ্মণপ্রাধান্য বদ্ধমূল; বর্ণভেদ প্রথা প্রধূমিত। ইতঃপূর্ব্বে অনার্য্যের ভয়ে আর্য্য ভীত। শত শত শ্লোকে ইহার প্রমাণ আছে। গাঙ্গ্য প্রদেশে অনার্য্য কতক পরিমাণে জিত। একটা কড়াকড়ি সমাজবন্ধন দ্বারা তাহাদিগকে নিস্তেজ করিবার সময় এই। এ সময়ে সেই গাঙ্গ্য প্রদেশে অনেক অনার্য্য আর্য্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে; অনেক আর্য্য অনার্য্যের সহিত পরিণীত হইয়া মিশ্রবর্ণ উৎপন্ন করিয়াছে। সমাজ বন্ধন দ্বারা আর্য্যানার্য্যের রক্তসংস্রব নিয়মিত করার চেষ্টা করা হইল। যতদূর নির্ম্মমতা ও কৃপণতা জিতের প্রতি প্রদর্শন সম্ভব, এই সমাজবন্ধনের প্রস্তাবে তাহাব কিছুই বাকী রাখা হইল না। যে সকল আর্য্য অনার্য্যকে কন্যা সম্প্রদান করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকেও অবমানিত করা বিধেয় বোধ হইল। কিন্তু তদানীন্তন অনার্য্য ও আদি সঙ্করবর্ণ সকল একটুকু হীনপ্রভ হইলেও তাহাদেব জাতীয় জীবন নির্ব্বাপিত হয় নাই। এখনকার অনার্য্য ও মিশ্রবর্ণ সকল যেমন ব্রাহ্মণপদলেহন সুস্বাদু মনে করিতেছে, তাহাদের সেই সুদূর পূর্ব্বপুরুষগণের রসনায় ইহা এত সুস্বাদু বোধ হইত না। কুইনাইনের স্বাদ তাহাদের জিহ্বায় কুইনাইনের মতই লাগিত, অভ্যস্ত জিহ্বায় যেরূপ মিষ্ট হয়, সেরূপ মিষ্ট বোধ হইত না। তাহারা সেই সমাজবন্ধনের দুরভিসন্ধি অনুষ্ঠানেই নষ্ট করিতে উদ্যত হইল। অবিলম্বে সমস্ত প্রজাশক্তি দুর্য্যোধন-প্রমুখ মহাসমরে অগ্রসর হইল। এই মহাসমরই কুরুপাঞ্চাল সমর।

ভাবিয়া দেখ, যাহারা ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের বিরোধী, তাহারাই দুর্য্যোধন পক্ষ। মহারাজ দুর্য্যোধন কি কাহাকেও পৌরহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন? অনার্য্য পাণ্ডবগণ যেমন ধৌম্যকর্ত্তৃক স্ব ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণানুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, দুর্য্যোধনের পক্ষে কেহই সেরূপ করেন নাই। মহারাজ দুর্য্যোধনের পক্ষ সেই বিশুদ্ধ হিন্দুত্বের দৃঢ়ভিত্তিতে দণ্ডায়মান। দৈব ও পৈতৃক কার্য্য যথারীতি করা হইত, পাশুপত যজ্ঞ করা হইত, কিন্তু আপনারাই কবিতেন—পুরোহিতের আনুগত্য স্বীকার করিতেন না। আর্য্যকুলধুরন্ধর পিতামহ ভীষ্ম তাঁহাদের সহায়তা করিতেন। গাঙ্গ্যপ্রদেশে আর্য্যপ্রাধান্য স্থাপনে যে সকল কষ্ট ভোগ হইয়াছিল, অনার্য্যগণের সহিত মিশ্রণপ্রবৃত্তি প্রাচীন আর্য্যগণের যে সমীচীন নীতি ছিল, পিতামহেব স্মৃতিতে তাহা তখনও জাগরূক ছিল। দুর্দ্ধর্ষ তেজস্বী অনার্য্যগণকে শত্রুরূপে দেখিলেও তাহাদেব বিরুদ্ধতার ঔচিত্য বিষয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন না। বরঞ্চ স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের জন্য তাহারা দলে দলে মরিতেছে দেখিয়া, তিনি তাহাদিগকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। এই আন্তরিক শ্রদ্ধা বশতঃ তিনি দুর্য্যোধন-প্রমুখ অনার্য্য পক্ষের সহায়তায় ব্রতী হইবেন, বিচিত্র কি?

কেবল এও নয়। ভীষ্মের বাল্য ও যৌবনকাল ব্রাহ্মণ্যের বিরোধী। এই গাঙ্গ্যআর্য্য কিছুমাত্র দ্বিধাচিত্ত না হইয়া কৈবর্ত্তকন্যাকে বিমাতা পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সত্যগন্ধা তাঁহার নমস্যা ছিলেন। সেই তেজস্বিনী অনার্য্য দুহিতা পরামর্শ দিয়া ভীষ্মকে পরিচালিত করিতেন। বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহের

অন্ত আর্য্য কাশীগণের রাজকন্যাত্রয় হরণ,এই তেজস্বিনী রমণীর সাহসক্রমেই হইয়াছিল। সেই কন্যাত্রয় মধ্যে জ্যেষ্ঠা অম্বার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিলে, মৎস্যগন্ধা তাহাকে পুত্রবধূ করিতে সম্মত হইলেন না। কন্যারত্নটী আপাততঃ সন্তুষ্টা হইয়া অভীষ্ট পতি শাম্বরাজের নিকট গমন করত, তাঁহার পাণি প্রার্থনা করিলেন। শাম্বরাজও তাঁহাকে গ্রহণ করা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন না। কতকগুলি ব্রাহ্মণ তখন তাহাকে পরামর্শ দিল "ভীষ্মই তোমার এই অবমাননার কারণ, অতএব তুমি পরশুরামের সহায়তা প্রার্থনা কর। সেই ব্রাহ্মণ ভীষ্মকে জব্দ করিবেন।" বলা বাহুল্য, এই রমণীরত্নের আহ্বানে পরশুরামে ও ভীষ্মে একটা যুদ্ধ হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণগণের আশা পূর্ণ হইল না। পরশুরামই পরাজিত হইলেন। তৎপরে সেই কাশীরাজদুহিতা অম্বা ক্ষোভে ও দুঃখে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইনিই পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া দ্রুপদের গৃহে শিখণ্ডী হইয়া ভীষ্মের পরাভবকারী হইয়াছিলেন।

এই বিবরণ মহাভারতে অম্বোপাখ্যান নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে ভীষ্মকে ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে দেখা যাইতেছে এবং ভীষ্মের পরাভবকারক শিখণ্ডীকে ব্রাহ্মণের অনুগত দেখা যাইতেছে। সুতরাং ভীষ্মের অনার্য্যপক্ষে সহানুভূতি কেবল উদারতা নহে,কতক পরিমাণে স্বাভাবিক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এসময়ে সঙ্কর বা মিশ্রবর্ণের সংখ্যা নিতান্ত কম না হইতে পারে। ইহাদের ক্ষমতাও যে দেশীয়গণের ক্ষমতা অপেক্ষা কম ছিল, এরূপ ভাবিবার কারণ দেখা যায় না। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে যাঁহারা ভবিষ্যদর্শী, তাঁহারা কুরুপক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে (১) দ্রোণ (২) কর্ণ (৩) বিদুর (৪) অশ্বত্থামা ও (৫) কৃপের নাম উল্লেখযোগ্য। দ্রোণাচার্য্যকে সঙ্করবর্ণের মধ্যে ধরিবার কারণ দুইটী। (১)তিনিশ্যামবর্ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন; মহাভারতে ইহার প্রমাণ আছে। এই শ্যামবর্ণত্বই সঙ্করত্বের চিহ্ন। গৌরবর্ণ আর্য্য ও কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্যের যোগেই শ্যামবর্ণের উদ্ভব। দ্রোণাচার্য্যের বর্ণ শ্যামল,তিনি সঙ্কর। (২) দ্রোণি অর্থাৎ ডোঙ্গা হইতে তাঁহার জন্ম এরূপ প্রবাদ দ্বারা তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত প্রচ্ছন্ন করিবার সঙ্করত্ব ভিন্ন আর কি কারণ হইতে পারে? কর্ণ ব্রাত্যক্ষত্রিয়,বিদুর দাসীপুত্র,অশ্বত্থামা শৈব ও সঙ্করজ, কৃপ দ্রোণের কুটুম্ব। ইহাদের কাহারই বর্ণভেদের প্রস্তাবে শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। এ জন্য তাঁহারা সকলে দুর্য্যোধন পক্ষ।

পক্ষান্তরে পাঞ্চালেরা ব্রাহ্মণানুগত। এই যুদ্ধপ্রিয় জাতিই সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্থাপনের মূল কারণ। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে ইহাদের যজ্ঞের বড় আড়ম্বরের কথা লেখা আছে। শস্যশালী ভূতলে আসিয়া পরের অর্থ অপহরণ করিয়া, বিস্তর পশুবধ করিয়া ইঁহারা যজ্ঞ সম্পাদনকে পানাহারের বিষয়ীভূত করিয়াছিলেন। এক শ্রেণী ব্যবসায়ী পুরোহিত ভিন্ন এববিধ যজ্ঞাড়ম্বর যুদ্ধপ্রিয়লোকের সম্ভব হয় না। ইহারাই এক শ্রেণী ব্যবসায়ী পুরোহিতের সৃষ্টি করেন বা করিতে ইচ্ছা করেন। যখন ইহাতে বিরুদ্ধতা উপস্থিত হইল ও সমর আরম্ভ হইল, তখন পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্রাহ্মণপক্ষে সেনাপতি হইলেন। অথর্ব্বাঙ্গিরসগণ দ্বারা উৎসাহিত হইয়া বিরাটেরা আসিয়া ইহাতে যোগ দিল। আর সেই কালাপাহাড় দলের ত কথাই নাই—স্বধর্ম্মভ্রষ্ট ও আর্য্যধর্ম্মে ব্যাপ্তীকৃত পাণ্ডবেরা প্রাণপণে ব্রাহ্মণ্যের জন্য যুদ্ধ করিল। বর্ত্তমান মহাভারত হইতে কুরু-

ক্ষেত্র যুদ্ধের নৈতিক কারণ যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এতদ্ভিন্ন অন্যতর নহে।

আর্য্যবংশধরগণকে কুকার্য্যে রত দেখিয়া, অনার্য্যকে অপমান করিতে উদ্যত দেখিয়া, যেরূপ গভীর দুঃখে দেবব্রত ভীষ্ম অনার্য্যের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, নবীনচন্দ্রের অমর তুলিকায় রৈবতকে ও কুরুক্ষেত্রে একাধিক স্থানে সেইরূপ দুঃখের চিত্র পাওয়া যায়। সকল স্থান উদ্ধৃত করা অসম্ভব ; একটী স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

"সেকি কথা?—কহে ভদ্রা মূর্চ্ছিতা আমায় পথে
পাইলে ভগিনি! তুমি যেতে কি ফেলিয়া?
একটী হরিণী হায়! এরূপে পড়িয়া পথে
দেখিলে কি, তব বুক পড়ে না ভাঙ্গিয়া?"
"পড়ে, কিন্তু আমি নারী অনার্য্যা আমার ছায়া
মাড়ালেও মহাপাপ হয় যে আর্য্যের।
পশু, পক্ষী, যেই দয়া, পায় আর্য্যদের কাছে,
আমরা অনার্য্যা নাহি পাই বিন্দু তার।
হায় নাথ! তুমি পিতা"—চাহি আকাশের পানে
কাতরে, করুণকণ্ঠে, কহে নাগবালা—
হায় নাথ! তুমি পিতা নহ কি অনার্য্যদের,
তবে কেন তাহাদের কপালে এ জ্বালা?
মানব তাহারা নহে, যদি নাথ! তবে কেন
একরূপ রক্ত মাংসে করিয়া সৃজন?
কেন বা হৃদয়ে দিলে, হৃদয়েতে দিলে প্রেম
প্রেমেতে নিরাশা দিলে গভীর এমন?"
[illegible] সুভদ্রার দুই আঁখি ছল ছল;
অন্তরালে আঁখি ছল ছল নারায়ণ,
করুণার এ উচ্ছ্বাস, পরশি উভয় প্রাণ
কাঁদাইল একতান বীণার মতন।

কুরুক্ষেত্র, ৮ম সর্গ ১১১ পৃঃ।

অনার্য্যের দুঃখে এ গভীর উচ্ছ্বাস কি নবীন বাবুর? আমার বিবেচনায় নবীন বাবুর ভিতরে যে পরম পবিত্র কবিত্ব আছে, এ জিনিষটুকু সেই পবিত্র কবিত্বের নিজস্ব, কবির নহে। ইহা কবির জ্ঞানতঃ হইলে, তিনি ভীষ্মকে চিনিতেন ; ভীষ্ম স্থানান্তরে

"পাপের আশ্রয় দাতা অধর্ম্মে পতিত"

এইরূপ কুৎসিত রঙে তৎকর্ত্তৃক চিত্রিত হইতেন না। ফলে যে গভীর দুঃখে ভদ্রার দুই চক্ষু "ছল ছল" হইয়াছিল, নারায়ণ অন্তরালে 'ছল ছল আঁখি" হইয়াছিলেন, দেবব্রত নরহিতৈষী (নারায়ণ) ভীষ্ম সেই দুঃখেই দুর্য্যোধন পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধনও পাপাত্মা নহে, প্রকৃত দেবতা ; দেবব্রত-দেবতারও দেবতা।

যদি কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে চাও, তবে দুর্য্যোধন শত শত ভারতবাসী-প্রমুখ সুরেন্দ্রনাথ, ভীষ্ম হিউম। তবে বোধ হয় বিভিন্নতা এই, বর্ত্তমান যুদ্ধ বাক্‌যুদ্ধ, আর সেটি একটি প্রকৃত যুদ্ধ বৃত্তান্তের উপর একটি বাক্‌যুদ্ধের টপ্পর। শ্রীমধুসূদন সরকার।

মগধের পুরাতত্ত্ব।

মগধের ইতিহাসের সহিত গুপ্ত সম্রাটদিগের অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে, গুপ্তবংশের ইতিহাসের সহিত পরবর্ত্তী সময়ের আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাস সংস্পৃষ্ট।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে কাপ্তান ট্রয়ার (Captain A. Troyer) এলাহাবাদ-প্রস্তরস্তম্ভের লিপি আংশিক রূপে পাঠ করিতে করিতে, গুপ্ত বংশীয় চারিজন নরপতির নাম আবিষ্কৃত করেন। ইতিপূর্ব্বে এই প্রাচীন রাজবংশের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কেহ জানিত না। স্তম্ভলিপির

মর্ম্ম পাঠ করিয়া, তিনি চন্দ্রগুপ্ত, ঘটোৎকচ, চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত এই চারিটী নাম জনসমাজে প্রচারিত করেন। নামের সাদৃশ্য দৃষ্টে তিনি এই প্রস্তর লিপির প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের সহিত অভিন্ন কল্পনা করেন।

কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত সার উইলিয়ম জোন্স (Sir William Jones), তাঁহার দশম সাংবার্ষিক বক্তৃতায় মগধের সম্রাট মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তের নাম ও সময় নিশ্চিত রূপে নির্দ্ধারিত করিয়া, ভারতীয় পুরাতত্ত্বের কালনির্ণয় বিষয়ে মহোপকার সাধন করেন। সংস্কৃত পুরাণাদির অধ্যয়ন কালে তিনি চন্দ্রগুপ্তের নাম সর্ব্ব প্রথম জ্ঞাত হন। মুদ্রারাক্ষস নাটকে তিনি চন্দ্রগুপ্তের বলে ও কৌশলে রাজ্যাধিকারের বিবরণ অবগত হন। পাটলীপুত্র নগরে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই পাটলী পুত্র (বর্ত্তমান পাটনা) গঙ্গা ও শোণ নদের সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। গ্রীকরাজ সেলিউকাস এই চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধিবন্ধন করিয়া মেগাস্থিনিসকে আপনার দূতরূপে মগধের রাজধানীতে অবস্থিতি করিতে প্রেরণ করেন। মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত বা Sandracottas রাজার রাজধানী পালিবোথ্র গঙ্গা ও Erannoboas নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলিয়া স্বরচিত বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন। যদিও পাটলিপুত্র ও চন্দ্রগুপ্তের সহিত Palibothra ও Sandracottas নামের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে, তথাপি উহার অভিন্নতা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় নাই। D'anville নামে ফরাসী পণ্ডিত যমুনাকে গ্রীক দূতের লিখিত Erannoboas বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের ভ্রমজাল আরও বৃদ্ধি করেন। স্যর উইলিয়ম জোন্স একখানি প্রাচীন সংস্কৃত-গ্রন্থ পাঠে শোণ নদের প্রাচীন নাম "হিরণ্যবাহ" বলিয়া অবগত হন, ইহা হইতে তিনি পালিবোথ্র ও পাটলিপুত্রের এবং Sandracottas ও চন্দ্রগুপ্তের অভিন্নতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেন। কাপ্তান ফ্রান্সিস উইলফোর্ড (Captain Francis Wilford) এই আবিষ্ক্রিয়ায় সবিশেষ আস্থাবান হইয়া অবিলম্বে এই বিষয়ের আরও কতিপয় প্রমাণ প্রকাশ করেন। গ্রীক ঐতিহাসিক জাষ্টিনের (Justin) মতে দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ আলেকজাণ্ডারের শাসনকর্ত্তাকে নিহত করিয়া খ্রীঃ পূর্ব্বতন ৩১৭ বর্ষে ভারতবর্ষের সিংহাসন বলপূর্ব্বক অধিকার করেন। সেলিউকাস নাইকেটর (Seleucus Nicator) বেবিলন গ্রহণ ও ব্যাকট্রিয়া পরাজয় করিয়া ভারতবর্ষের সীমান্তভাগে উপনীত হন। চন্দ্রগুপ্তের সহিত সন্ধিবন্ধন ও মিত্রতা স্থাপন করিয়া, তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এণ্টিগোনাসের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ৩১২ খ্রীঃ পূর্ব্বতন অব্দে সিলিউকাস বেবিলনে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই বিবরণ হইতে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ৩১৭ হইতে ৩১২ খ্রীঃ পূর্ব্বতন অব্দে (সম্ভবতঃ ৩১৬ খ্রীঃ পূঃ) আরম্ভ হয়। এইরূপে গ্রীস দেশের জ্ঞাত সময়ের সহিত ভারতবর্ষের সমসাময়িক ঘটনার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া, অন্ধতমসাচ্ছন্ন ভারতীয় ইতিহাস আলোকিত হইতে থাকে। কল্পনার সীমা অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষীয় ঘটনাপুঞ্জ ইতিহাসের রাজ্যে আনীত হয়। চন্দ্রগুপ্তের কাল নির্ণয় দ্বারা মহাত্মা সার উইলিয়াম জোন্স ভারতীয় পুরাতত্ত্ব আলোচনার পথ সর্ব্ব প্রথম প্রদর্শন করিয়া, ভারতবাসী মাত্রেরই চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সুপণ্ডিত কাপ্তান ট্রয়ার ও জেমস্ প্রিন্সেপ সাহেবের আবিষ্কৃত ও এলাহাবাদ শিলাস্তম্ভলিপির

উল্লিখিত চন্দ্রগুপ্ত যে মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা মগধ সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি,তাহা ডাক্তার মিল (Rev. Dr. A. H. Mill) অবিলম্বে ১৮৩৪ খ্রীঃ মে মাসে প্রদর্শন করেন। পুরাণের চন্দ্রগুপ্তকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এই চন্দ্রগুপ্ত সূর্য্যবংশীয় রাজা। মৌর্য্যবংশ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, গুপ্তবংশীয় চন্দ্র গুপ্ত শৈব বলিয়া বর্ণিত। শিলালিপির অক্ষর অপেক্ষাকৃত এত আধুনিক যে, তাহা খ্রীষ্টের পূর্ব্বতন চতুর্থ শতাব্দীর চন্দ্রগুপ্তের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। ডাক্তার মিল কাপ্তান ট্রয়ারের পঠিত প্রথম দুই রাজার নাম শ্রীগুপ্ত ও ঘটোৎকচ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

বহুতর চেষ্টা করিয়াও ডাক্তার মিল ও জেম্‌স প্রিন্সেপ সাহেব নবাবিষ্কৃত গুপ্তবংশকে কোনও পৌরাণিক রাজবংশের বা মধ্যযুগের অসংখ্য রাজপুত বংশের সহিত সংযুক্ত করিতে পারিলেন না। ১৮৩৭ খ্রীঃ তাঁহারা উভয়ে ভিটারির প্রাচীন শিলালিপির মর্ম্মোদ্ধার করিয়া, গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়), কুমারগুপ্ত ও স্কন্ধগুপ্তের নাম আবিষ্কৃত করেন। এই তিনটী নূতন নাম আবিষ্কারের পর, ডাক্তার মিল ১৮৩৭ খ্রীঃ পুরাণে বর্ণিত মগধের গুপ্তবংশের সহিত শিলালিপির গুপ্তবংশের অভিন্নতা অনুমান করেন এবং গুপ্ত বংশের রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী বলিয়া প্রকাশ করেন। ইহার পূর্ব্ববৎসর পণ্ডিতকুলতিলক জেম্‌স প্রিন্সেপ এবংবিধ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া ডাক্তার মিলের বিশেষ সাহায্য করেন, কিন্তু গুপ্তবংশের সময় পুরাণোক্ত কাল অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া শিলালিপির অক্ষর দৃষ্টে তাঁহার প্রতীতি জন্মে।

১৭৮৩ খ্রীঃ কলিকাতার নিকট হুগলী নদীর তটে কতিপয় ... হিন্দুরাজগণের নামাঙ্কিত স্বর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। তাহা দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হয়। তাহার সহিত ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক অক্ষরে লিখিত 'ইণ্ডো-সাইথিয়ান' স্বর্ণমুদ্রার বিশেষ সাদৃশ্য ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল টড প্রথম প্রদর্শন করেন। ১৮২৫ খ্রীঃ অধ্যাপক উইলসন (H, H. Wilson) এবং ১৮৩৩ খ্রীঃ জেম্‌স প্রিন্সেপ, এবম্বিধ আরও কতিপয় স্বর্ণ মুদ্রার বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৮৩৪ খ্রীঃ ডাক্তর মিল ও প্রিন্সেপ সাহেব এলাহাবাদ প্রস্তরলিপির সহিত তাহাদের অক্ষর সাদৃশ্য অনুভব করিয়া, তাহাদের মর্ম্মোদ্ধার পূর্ব্বক ঘটোৎকচ,চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্তের নাম পর্য্যন্তও প্রকাশ করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ ভিটারীর প্রস্তরলিপির উল্লিখিত কুমার গুপ্ত ও স্কন্ধগুপ্তের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া, শিলাস্তম্ভ ও স্বর্ণমুদ্রার উল্লিখিত গুপ্তবংশীয় নরপতিগণের অভিন্নতা প্রতিপাদন করেন। এই সকল সুবর্ণ মুদ্রার মধ্যে কোন কোনটীর পাঠ উদ্ধার করিয়া প্রিন্সেপ সাহেব মহেন্দ্রগুপ্তের নাম প্রাপ্ত হন। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ (E. Thomas, H. H. Wilson and Lassen) প্রিন্সেপের আবিষ্কৃত এই মহেন্দ্রগুপ্তকে প্রথম কুমারগুপ্ত হইতে পৃথক ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদেরা সকলেই একবাক্যে মহেন্দ্রকুমার গুপ্ত প্রথমের উপাধি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। প্রিন্সেপসাহেব গুপ্তবংশীয় যে ত্রয়োদশ জন রাজার নাম প্রকাশ করেন, পরবর্ত্তী গবেষণায় তাহা হইতে এবম্বিধ নামান্তর আরও নির্ণীত হইয়াছে, ডাক্তর বার্জেস ও জেনারেল কানিংহাম নর ও বক্র গুপ্ত নামে আরও দুইটী নূতন গুপ্ত নৃপতির নাম প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ ডাক্তর হরনলি (Dr.

R. Hœrnle ... করেন যে, বক্র গুপ্ত চন্দ্র গুপ্তেরই নামান্তর এবং ভ্রমক্রমে 'চন্দ্র' শব্দ 'বক্র' বলিয়া পঠিত হইয়া থাকিবে।

গুপ্তবংশের নৃপতিদিগের নামাঙ্কিত স্বর্ণ মুদ্রার সহিত যেমন ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক ও ভারতীয় ইণ্ডোসাইথিক রাজাদিগের নামাঙ্কিত মুদ্রার সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়,সেইরূপ তাঁহাদের কতিপয় রৌপ্যমুদ্রায় সৌরাষ্ট্রের সত্রপ (ক্ষত্রপ) রাজাদিগের রৌপ্যমুদ্রার সাদৃশ্য দৃষ্টে ১৮৩৩—৩৫ খ্রীঃ ডাক্তর মিল ও জেমস্ প্রিন্সেপ এই সকল মুদ্রাকে সৌরাষ্ট্রের সত্রপ রাজাদিগের রৌপ্যমুদ্রা বলিয়া প্রথমতঃ অনুমান করেন। মুদ্রালিপির অক্ষর পাঠে তাঁহারা পরবর্ত্তী গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়), কুমার গুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত ও বুধ গুপ্তের নাম প্রাপ্ত হইয়া, উহা যে গুপ্তবংশেরই রৌপ্যমুদ্রা, তাহা নিদ্ধারিত করেন। ১৮৫৫ খ্রীঃ টমাস (E. Thomas) গুপ্তবংশীয় যাবতীয় স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার বিবরণ একত্র সংগৃহীত করিয়া, এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া,আপনার পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দেন।

গুপ্ত সম্রাটদিগের নামাঙ্কিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা বিষয়ক গবেষণায় ও আলোচনায় তাঁহাদের রাজত্বকালের সঙ্গে ২ তাঁহাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃতির বিবরণ প্রকাশিত হয়। গুপ্তবংশ সূর্য্যবংশের শাখা হইতে উদ্ভূত এবং তাঁহাদের নামাঙ্কিত স্বর্ণ মুদ্রার অধিকাংশ প্রাচীন কনোজনগরীর ভগ্নাবশেষ মধ্যে পাওয়া যায়, এই দুই কারণে ডাক্তর মিল ১৮৩৪ খ্রীঃ কনোজ নগরীকে গুপ্তবংশের রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুপণ্ডিত প্রিন্সেপ সাহেব ডাক্তর মিলের এই অভিমত গ্রহণ করেন। গুপ্ত বংশীয় নৃপতিদিগের রৌপ্য মুদ্রা সৌরাষ্ট্র ও উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত হইয়া,প্রিন্সেপ সাহেব পূর্ব্বে মগধ হইতে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে তাঁহাদের রাজ্য বিস্তৃতির বিষয় প্রকাশ করেন। পরবর্ত্তী গবেষণায় প্রাচীন পাটলীপুত্রে তাঁহাদের রাজধানী অবস্থিত ছিল বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য মৌর্য্যবংশীয় বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের শাসিত সাম্রাজ্য অপেক্ষা বড় ন্যূন ছিলনা বলিয়া অবধারিত হয়।

খ্রীষ্টের পূর্ব্বতন তৃতীয় শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের নামাঙ্কিত প্রস্তরলিপির পালী অক্ষর ও খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ কুটিলা অক্ষরের সহিত গুপ্তনরপতিদিগের নামাঙ্কিত স্তম্ভলিপি ও মুদ্রালিপির অক্ষরের তুলনা করিয়া, পণ্ডিতবর প্রিন্সেপ তৃতীয় ও চতুর্থ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে গুপ্তবংশের আবির্ভাব কাল নির্দ্দেশ করেন। ভারতীয় শক (Indo-Scythic) নৃপতিদিগের স্বর্ণমুদ্রার এবং সৌরাষ্ট্রের সত্রপ ও বল্লভী বংশীয় ভূপতিদিগের নামাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রার সহিত গুপ্তবংশীয় সম্রাটদিগের নামাঙ্কিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার সৌসাদৃশ্য দৃষ্টে,তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হনযে, গুপ্তবংশীয় আট জন নরপতি শক ও সত্রপ বংশের পরে এবং বল্লভীবংশের পূর্ব্বে প্রায় দুই শতাব্দী পর্য্যন্ত উত্তর ভারতে রাজত্ব করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে টমাস সাহেব সৌরাষ্ট্রের সাহবংশীয় নরপতিগণের যে বিস্তীর্ণ বিবরণ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর ত্রৈমাসিক পত্রিকার দ্বাদশ ভাগে প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি গুপ্তবংশের তিরোভাব কাল ৩১৯ খ্রীঃ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং আরবীয় ঐতিহাসিক আবুরিহান আলবিরুণিকে তাঁহার উক্তির প্রমাণ স্বরূপে নির্দ্দেশ করেন। জেনেরল ক্যানিংহাম ও জেমস ফারগুসন সাহেব গুপ্ত বংশের রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম

কি ষষ্ঠ শতাব্দী নির্দ্দেশ করিয়া, তাঁহাদিগকে বল্লভীবংশের সমসাময়িক অনুমান করেন।

গুপ্তাব্দের আরম্ভকাল সম্বন্ধে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়। গুপ্তাব্দের ৯৩ বৎসরে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নামাঙ্কিত প্রস্তরলিপি ১৮৩৭ খ্রীঃ প্রিন্সেফ সাহেব কর্ত্তৃক সাঞ্চীর স্তূপে আবিষ্কৃত হয়। ১৮৩৮ খ্রীঃ তিনি এরাণের প্রস্তর লিপিতে ১৬৫ গুপ্তাব্দে বুধগুপ্তের নাম অঙ্কিত দেখিতে পান এবং কুহাওনের শিলা লিপিতে স্কন্ধগুপ্তের মৃত্যুর পরবর্ত্তী ১৩৩ অব্দ পাঠ করেন। ডাক্তর হল (Fitz Edward Hall) ১৮৬১ খ্রীঃ পূর্ব্বোক্ত বুধগুপ্তের অব্দকে সংবতাব্দ ও ১৩৩ কে ১৪১ অব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র শেষোক্ত সনকে ১৪১ গুপ্তাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ১৪৬ গুপ্তাব্দে খোদিত স্কন্ধগুপ্তের নামাঙ্কিত লিপি প্রকাশ করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ ডাক্তর হল ১৫৬ ও ১৬৩ গুপ্তাব্দে খোদিত দুইখানি হস্তীরাজার শাসন লিপি প্রকাশ করেন। ডাক্তর মিত্র এবং মাননীয় বেইলী (E. C. Bayley) সাহেব গুপ্তাব্দকে শকাব্দ হইতে অভিন্ন অনুমান করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ জেনেরল কানিংহাম প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের কাল ১৮৬৬ খ্রীঃ নির্দ্দেশ করিয়া তাহাই গুপ্তাব্দের আরম্ভকাল অবধারণ করেন।

১৮৮৪ খ্রীঃ বোম্বের সুবিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকর মহোদয় স্বরচিত 'দক্ষিণাপথের প্রাচীন ইতিহাস' (Early History of Deccan) নামক ক্ষুদ্রকায় উৎকৃষ্ট ও বহু গবেষণা পূর্ণ পুস্তকে শকাব্দের ২৪১ অব্দে গুপ্তাব্দের আরম্ভ কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই গণনা হইতে তিনি ৩১৯ খ্রীঃ গুপ্তাব্দের আরম্ভ কাল বলিয়া বহুতর যুক্তি প্রমাণের অবতারণা দ্বারা প্রতিপাদিত করেন। তাঁহার মত অতঃপর প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ ফ্লীট ও হারনলি সাহেব গ্রহণ করিয়াছেন। গুপ্ত সম্রাটদিগের সম্বন্ধে স্বসংগৃহীত সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থে (Corpus Inscriptionarum Indicarum, Vol. III) ফ্লীট সাহেব ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দকে গুপ্তাব্দের আরম্ভকাল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

অধ্যাপক রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকর শকাব্দ যে মহারাজ কনিষ্কের প্রবর্ত্তিত অব্দ, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শন করেন। গুপ্তাব্দের সহিত শকাব্দের অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে বিধায়, আমরা এস্থলে শকাব্দের প্রচলন সম্বন্ধে বিস্তীর্ণভাবে আলোচনা করিব।

(শকাব্দ।)

গ্রীক ভূগোলবিৎ টলেমি (১৫১-১৬৩ খ্রীঃ) শক জাতির খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে সিন্ধু দেশে ও রাজপুতানায় প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। উজ্জয়িনীর শকরাজা চষ্টনের নাম তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। চষ্টনের পর তাঁহার পুত্র জয়দামন ও পৌত্র রুদ্রদামন দক্ষিণাপথের অপরান্ত (উত্তর কঙ্কণ) পর্য্যন্ত শকবংশের আধিপত্য বিস্তারিত করেন। সাতবাহন বংশীয় মহাপরাক্রান্ত রাজা গোতমীপুত্র শতকর্ণিকে (১৩৩-১৫৪) দুই বার পরাজিত করিয়া রুদ্রদামন মহাক্ষত্র বা (মহাসত্রপ) উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র রুদ্রসিংহের নামাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা কাঠিয়াবারে (গুজরাট) পাওয়া গিয়াছে। গুজরাটের মহাপরাক্রান্ত সত্রপ (ক্ষত্রপ) বংশীয় সম্রাটগণ উজ্জয়িনীর ক্ষত্রবংশের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সম্পর্কিত বলিয়া অনুমিত হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত সত্রপবংশ গুজরাট ও উত্তর ভারতে রাজত্ব করেন। মগধ ও মিথিলা পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত থাকা অসম্ভব নহে।

এই শক বংশীয় নহপান অন্ধ্রভৃত্য-বংশীয়

এক অজ্ঞাত নামা সম্রাটকে পরাজিত করিয়া প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পর্য্যন্ত দক্ষিণাপথে রাজত্ব করেন। অধ্যাপক ভণ্ডারকরের মতে তিনি অনুমান ৭৮—১২৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ৪৬ বৎসর কাল জুনার নগরে রাজত্ব করেন। বাৎস্য-গোত্রজ ব্রাহ্মণ জাতীয় "অয়ম" তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। দীনীকের পুত্র উষাবদাত ক্ষত্রপ নহপানের তনয়া দখামিত্রাকে বিবাহ করেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর তিনি ১৩০খ্রীঃ পর্য্যন্ত সাত বৎসরকাল সাম্রাজ্যশাসন করেন। নহপান ও উষাবদাতের নামাঙ্কিত কয়েকখণ্ড শাসনলিপি হইতে অধ্যাপক ভণ্ডারকর এই সকল নাম ও বিবরণ সংগৃহীত করিয়া স্বরচিত "Early History of Deccan" নামক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। শক জাতীয় সর্ব্ব-প্রধান নরপতির দ্বারা শকাব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। সাতবাহনবংশীয় সম্রাটদিগের আধিপত্য প্রতি-ষ্ঠার শতবর্ষের মধ্যে যে বৈদেশিক শক রাজা তাঁহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া,শকসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন,তিনি অবশ্যই অসামান্য পুরুষ ছিলেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের কাল হইতে শকাব্দের আরম্ভ হয়, খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত দক্ষিণাপথের বহুতর তাম্রশাসনে 'শক-নৃপকাল' বা 'শককাল' বলিয়া এই অব্দ বর্ণিত হয়। পরে কালক্রমে 'শকে' বা 'শাকে' শব্দ প্রচলিত হয়,এবং শালিবাহন এই শকা-ব্দের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ভ্রান্তজনপ্রবাদ প্রচা-রিত হয়। "শালিবাহন শক" পদের কোনও অর্থ নাই। কারণ এই পদ দ্বারা সাতবাহন (শালিবাহন) ও শক এই দুই রাজবংশ মাত্র নির্দ্দেশ করে। সম্ভবতঃ শক জাতীয় সত্রপ ক্ষত্রাট্ (ক্ষত্রপ সম্রাট্) নহপানের দ্বারা জুনার নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠার সময় হইতে 'শক-নৃপকালের' গণনা আরম্ভ হয়। ৭৮-১২৪খ্রীঃ পর্য্যন্ত ৪৬ বৎসরকাল শকরাজ নহপান জুনারে রাজত্ব করেন। অধ্যাপক ভণ্ডারকর কাশ্মী-রের সম্রাট কনিষ্ককে শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সম্মত নহেন।

অধ্যাপক ভণ্ডারকর এই সম্পর্কে যে চারিটী কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ১২৯৮ সালের শ্রাবণ মাসের নব্যভারতে (নবম খণ্ড,২২২ পৃষ্ঠা) শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। অধ্যা-পক ভণ্ডারকরের "দক্ষিণাপথের প্রাচীন ইতি-হাস" বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া, আমি পূর্ব্বমত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি এবং কনিষ্ক দ্বারা শকাব্দ প্রব-র্ত্তিত হয় নাই, এই মত গ্রহণ করিয়াছি। আমার মত পরিবর্ত্তনের কারণ সংক্ষেপে উল্লেখ করা অনাবশ্যকীয় বোধ হইবে না।

(১) শকাব্দ পৈঠান বা প্রতিষ্ঠান নগরের অধিপতি শালিবাহন উজ্জয়িনার মহারাজা বিক্রমাদিত্যকে পরাজিত করিয়া শকাব্দ প্রতি ষ্ঠিত করেন, এই জনপ্রবাদ দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। এই জন-প্রবাদের মূলে এই সত্য নিহিত আছে যে, শকাব্দ দক্ষিণাপথ হইতে উত্তর ভারতে বা আর্য্যাবর্ত্তে কালক্রমে প্রচলিত হয়। ডাক্তার বার্জেস ও ফ্লিট্ সাহেবের গবেষণায় দক্ষিণা-পথের ৯৭ খানি প্রাচীন শাসনলিপিতে শকা-ব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আর্য্যা-বর্ত্তের প্রাচীনতম শাসনপত্রে শকাব্দের বিরল উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সংবতাব্দ, গুপ্তাব্দ ও হর্ষাব্দ আর্য্যাবর্ত্তে অধিকতর প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। দক্ষিণাপথের সর্ব্বত্র অতি প্রাচীনকাল হইতেই শকাব্দ প্রচলিত হয়, গুজরাটের মহাপরাক্রান্ত 'সত্রপ' বংশীয় সম্রাট-গণ পর্য্যন্ত এই শকাব্দ ব্যবহৃত করিতে থাকেন।

ক্রমে ক্রমে তাহা আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতে থাকে।

(২) শালিবাহন নামে কোনও নরপতি দক্ষিণাপথে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া কোনও প্রমাণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। বহুতর শাসনলিপিতে অন্ধ্রভৃত্যবংশই 'সাতবাহন' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। সাতবাহন বংশের এক শাখা মহারাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রতিষ্ঠান বা পৈঠান নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। মহারাজ পুলুমায়ী ১৩০-১৫৪ খ্রীঃ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠান নগরে এবং ১৫৪-৫৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত তৈলঙ্গ দেশে ধনকটক (ধরণীকোট) নগরে রাজত্ব করেন। তিনি গোতমীপুত্র শতকর্ণির পুত্র। পুলুমায়ী ও তাঁহার পিতা শতকর্ণি উজ্জয়িনীর শক অধিপতি চষ্টন ও তাঁহার পুত্র জয়দামন ও পৌত্র রুদ্রদামনের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া শকদিগের হস্ত হইতে সাম্রাজ্যের উদ্ধার সাধন করেন। এই পুলোমায়ী সাতবাহনই কিংবদন্তীর শালিবাহন বলিয়া অনুমিত হয়। গোতমীপুত্র শতকর্ণি শকরাজ ক্ষহরাট নহপান বা তাঁহার উত্তরাধিকারী ও জামাতা উষবদাতকে পরাজিত করিয়া, প্রায় ৫৩ বৎসর রাজ্যচ্যুতির পর অন্ধ্রভৃত্য (সাতবাহন) বংশের আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি অন্ধ্রভৃত্য সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, যখন বর্ত্তমান গণ্টুর জিলার ধনকটক নগরে (১৩৩-১৫৭ খ্রীঃ) রাজত্ব করিতে থাকেন, সেই সময়ে তাঁহার পুত্র পুলুমায়ী নবনর নগর হইতে মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমস্থ প্রদেশের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হন। দক্ষিণাপথ হইতে শকজাতির আধিপত্য উন্মূলিত করিয়া, শতকর্ণি উজ্জয়িনীর শকাধিপতি জয়দামনকে আক্রমণ করেন। জয়দামন শতকর্ণির দ্বারা পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হয়। অবন্তী (মালব) ও সুরাষ্ট্র (গুজরাট) পর্য্যন্ত শতকর্ণির একাধিপত্য বিস্তৃত হয়। ইহাই কিংবদন্তীতে শালিবাহন কর্ত্তৃক উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের পরাজয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, জয়দামনের পুত্র রুদ্রদামন অনুমান ১৪০ খ্রীঃ গোতমীপুত্র শতকর্ণিকে দুইবার পরাজিত করিয়া শকসাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া, মহাক্ষত্রপ উপাধি গ্রহণ করেন।

(৩) নাসিকের এক গুহায় ক্ষহরাট নহপানের জামাতা উষবদাতের চারি খানি শাসনলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতে শকরাজ উষবদাতকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বোধ হয়। শকাদি বৈদেশিক জাতি ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভারতবাসীদিগের সহিত কালক্রমে সংমিশ্রিত হইয়া উঠে। শকাব্দের প্রবর্ত্তক ক্ষহরাট নহপানও সম্ভবতঃ সম্রাট কনিষ্কের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

(৪) গজনীর সুলতান মামুদের সহচর আরব ইতিহাস লেখক এলবিরুণীর নির্দ্দেশ মতে ২৪১ শকাব্দে গুপ্তাব্দ আরম্ভ হয় এবং বল্লভী সম্রাটগণ এই গুপ্তাব্দ গুজরাটে প্রচলিত করেন। গুপ্ত সম্রাটদিগের আধিপত্য লোপের সময় হইতে গুপ্তাব্দ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, এলবিরুণীর এই উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। রাজ্যাভিষেকের কাল হইতে সচরাচর অব্দগণনার আরম্ভ হয়। রাজ্যচ্যুতির সময় হইতে অব্দগণনা ইতিহাসে কুত্রাপি দেখা যায় না। কর্ণেল টড্ সোমনাথে যে শাসনলিপি প্রাপ্ত হন, তাহাতে ২৪২ শকাব্দ বল্লভী অব্দের প্রারম্ভ বলিয়া, নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বল্লভীরা গুপ্তবংশের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া পরে স্বাধীন হয়। ২৪১ শকাব্দ (৩১৯ খ্রীঃ) গুপ্তাব্দ ও বল্লভী অব্দের আরম্ভ কাল এই

বিষয়ে সংশয় নাই। ফ্লীট,ভণ্ডারকর,হারনলি, স্মিথ,হাণ্টার ও বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের এই মত সুযুক্তিপূর্ণ ও সুসঙ্গত। গুজরাটের সত্রপ-সম্রাটগণ শকাব্দের ব্যবহার করিতেন। গুপ্ত বংশীয় চন্দ্রগুপ্ত (১) সত্রপদিগকে পরাজিত করিয়া সমগ্রআর্য্যাবর্ত্তে গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন এবং সত্রপদিগের নামাঙ্কিত রৌপ্য-মুদ্রার অনুরূপ মুদ্রা সাম্রাজ্য মধ্যে প্রচলিত করেন।

(৫) গুপ্ত সম্রাটদিগের নামাঙ্কিত স্বর্ণ-মুদ্রার সহিত মহারাজ কনিষ্কের স্বর্ণমুদ্রার এতদূর সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় যে,তিনি গুপ্তসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার শতবর্ষের অধিকতর পূর্ব্বতন বলিয়া বোধ হয় না। কাশ্মীররাজ কনিষ্ক, হুবিষ্ক (হুষ্ক) ও বাসুদেবের রাজত্বকাল শতবর্ষের অধিক স্থায়ী ছিল বলিয়া অনুমান করিবার কোনও কারণ পাওয়া যায় না।

(৬) তিব্বতীয় বৌদ্ধদিগের মধ্যে এইরূপ জনপ্রবাদ:প্রচলিত আছে যে,শকরাজ কনিষ্ক বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তির ৪০০ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হন। নাইসার গ্রীকরাজ হার্ম্মিয়া-সকে পরাভূত করিয়া ক্যাডফাইসিস্ যে শক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার রাজধানী কাবুল নগরে অবস্থিত ছিল। কাবুলে ক্যাড-ফাইসিসের সমাধিস্তম্ভ ডাক্তার মার্টিন হোনি গ্বার্জার দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। কনিষ্ক এই বংশের দ্বিতীয় সম্রাট। তিনি বংশের প্রতি-ষ্ঠাতা নহেন। তাঁহার সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে মথুরা ও বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি শকাব্দের প্রবর্ত্তক হইলে, কাবুল, কাশ্মীর, পঞ্জাবাদি প্রদেশে তাঁহার প্রবর্ত্তিত অব্দের নিদর্শন সূচক বহুতর শাসন-পত্র ও মুদ্রাদি পাওয়া যাইত। প্রকৃত প্রস্তাবে দক্ষিণাপথেই শকাব্দাঙ্কিত বহুতর তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণাপথে বৌদ্ধ সম্রাট কনিষ্কের রাজ্য কস্মিন্‌কালেও বিস্তৃত হয় নাই। তিব্বতীয় জনপ্রবাদ কনি-ষ্ককে শকাব্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করে নাই; বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের৪০০বৎসর পরে কনিষ্ক আবির্ভূত হইয়া শকাব্দ প্রবর্ত্তিত করেন, খ্রীঃপূঃ ৭৮ অব্দে শকাব্দের আরম্ভ গণনা হইল। কিন্তু ৭৮খ্রীঃ শকাব্দের প্রতিষ্ঠাকাল বলিয়া যে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার বিশেষ কিছু মূল আছে বলিয়াও বোধ হয় না। বৃহজ্জাতক ও বৃহৎসং-হিতার টীকাকার ভট্ট উৎপল বিক্রমাদিত্যকে শকাব্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য প্রণীত "করণ কুতূহল" গ্রন্থের ৪০০ বৎসরেরও অধিক প্রাচীন একখানি হস্তলিখিত টীকায় টীকাকার সোধল লিখিয়া-ছেন যে 'শক নামক ম্লেচ্ছদিগকে পরাজিত করিয়া বিক্রমাদিত্য শকাব্দ প্রচলিত করেন'। এই উক্তির ন্যায় তিব্বতীয় জনপ্রবাদও অমূ-লক বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধ দেবের (৪৭৮+৭৮) ৫৫৬ বৎসর পরে কনিষ্কের রাজ্যারম্ভ কাল গৃহীত হইলে তিব্বতীয় জনপ্রবাদ অনু-সারে তাঁহার ৪০০ বৎসর পরে। কনিষ্কের অবির্ভাব সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অমূলক হইয়া উঠে।

(৭) বিজাপুর জিলার অন্তর্গত বাদামীর গুহালিপিতে চালুক্যরাজ মঙ্গলী শের নাম অঙ্কিত আছে (Indian antiquary III. 305.) এবং ৫০০ শকাব্দে তাহা লিখিত হয় বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। শকাব্দ শক নৃপতির রাজ্যাভিষেককাল "শক নৃপকাল সংবৎসরে" "শক নৃপতি সংবৎসরে-ষ্বাতিক্রান্তেষু পঞ্চসু শতেষু" বলিয়া বর্ণিত হই য়াছে। রবিকীর্ত্তির নামাঙ্কিত ঐহোলির শাসনলিপি ৫৫৬ 'শক নৃপকালে' লিখিত হয়। উহাতে মহাকবি কালিদাসের নাম উল্লিখিত

হইয়াছে (Indian antiquary VIII. 243) খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীতে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ বরাহমিহির শকাব্দকে 'শকভূপকাল' ও 'শকেন্দ্র কাল' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। একাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য্য স্বরচিত গোলাধ্যায়ে শক নৃপ সময়ের ১০৩৬ বৎসরে নিজের জন্ম হয় বলিয়া(রসগুণ পূর্ণ মহীসম শকনৃপ সময়ে ভবন্মমোৎপত্তিঃ) লিখিয়াছেন। আধুনিক কালের বঙ্গদেশীয় পঞ্জিকাতে 'শকনৃপতেরতীতাব্দ' লিখিত দেখা যায়। শকাব্দ অতি প্রাচীনকাল হইতে কনিষ্কের অনধিকৃত দক্ষিণাপথে প্রচলিত ছিল, ইহা হইতে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে।

(৮) মহারাজ কনিষ্কের নামাঙ্কিত শাসন লিপিতে বৌদ্ধরাজ কনিষ্ক [illegible] কোনও অব্দ প্রবর্ত্তক বলিয়া বর্ণিত হন নাই। ১৮৭০ খ্রীঃ মেজর ষ্টাবস (Major Stubbs R A.) বহাবলপুরের ১৬ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বস্থিত 'সুবিহার'নামক স্থানের গুম্বজযুক্ত গোলাকার গৃহে (tower) কনিষ্কের নামাঙ্কিত যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত করেন, তাহার অক্ষর খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর বা গুপ্তবংশের স্তম্ভলিপির অপেক্ষা অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। এই শাসনপত্র চারিপংক্তিতে কনিষ্কের রাজত্বের একাদশবৎসরে সম্ভবতঃ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হয়। উহার প্রথম পংক্তিতে "মহারাজস্য রাজতিরাজস্য দেবপুত্রস্য কনিষ্কস্য সংবৎসরে একাদশে ১১" লিখিত রহিয়াছে।

কনিষ্কের নামাঙ্কিত শাসনপত্রে তিনি শক নৃপতি বা শকাব্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন নাই। তিনি যে আপনার রাজ্যাভিষেকের কাল হইতে কোনও অব্দ প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাও বোধ হয় না। তিনি কোনও অব্দের প্রবর্ত্তক হইলে, তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী শক নৃপতি হুবিষ্ক (হুষ্ক বা হুয়ার্কি) ও বাসুদেবের শাসনপত্রে উহার বিশেষ উল্লেখ অবশ্যই থাকিত। কিন্তু ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৭০ খ্রীঃ মথুরা হইতে আনীত যে তিনখানি সংস্কৃত শাসনপত্রের বিবরণ ও প্রতিলিপি প্রকাশ করেন, তাহাতে শকাব্দ বা কনিষ্কাব্দের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। হুবিষ্ক ও বাসুদেবের পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কনিষ্ক আবির্ভূত হন বলিয়া অনুমিত হয়।

(ক)"স° ৫৯দি ৪০ মহারাজস্য রাজতিরাজস্য দেবপুত্রস্য হুবিষ্কস্য বিহারে দানং ভিক্ষু জীবকস্য উদিয়নকস্য"

(খ) "মহারাজস্য রাজাতিরাজস্য দেবপুত্রস্য বাসুদেবস্য সংবৎসরে ৪৪ বর্ষে ম...স প্রথম দিবসে।"

(৯) মথুরার তৃতীয়খণ্ড শাসন লিপিতে শকাব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে (দানংসকে ১৪০ বুধমিহিরস্য সিংহপুত্র)। ২১৮ খ্রীঃ (১৪০শকাব্দে) লিখিত লিপির সহিত হুবিষ্ক ও বাসুদেবের নামাঙ্কিত শাসন পত্রের বিলক্ষণ অক্ষর সাদৃশ্য আছে। কনিষ্কের নামাঙ্কিত শাসনলিপির অক্ষর কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ও পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বোক্ত দুই শাসনলিপি হইতে হুবিষ্ক ও বাসুদেব খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে যথাক্রমে অন্ততঃ ৫৯ ও ৪৪ বৎসর রাজত্ব করেন বলিয়া নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতেছে। অথচ রাজতরঙ্গিনীতে কনিষ্ক, হুষ্ক ও বাসুদেব এই তিন ভ্রাতার রাজত্বকাল ৬০ বৎসর মাত্র নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে বলিয়া সুপণ্ডিত বেইলি সাহেব (E. C. Bayley) ১৮৬২ খ্রীঃ কর্ণেল কানিংহামের মত প্রকাশ করেন। পুরাতত্ত্ববিৎ কানিংহাম হুবিষ্কের নামাঙ্কিত শাসনলিপির অঙ্কে ৪৩১ এবং বাসুদেবের শাসনপত্রে ৪০১ দেখিতে পান। ডাক্তার মিত্রের নির্দ্দেশই অধিক সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে।

এই সকল কারণে কনিষ্ক যে শকাব্দের প্রবর্ত্তক নহেন, এই সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ বা তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হইতেছে। দক্ষিণাপথ হইতে শকাব্দের প্রচলন আরম্ভ হইয়া, কালক্রমে আর্য্যাবর্ত্তে প্রবর্ত্তিত হয়। মহাপরাক্রান্ত অন্ধ্রভৃত্য (সাতবাহন) সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া, যিনি ৫৩ বৎসর পর্য্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে তাহা শাসন করেন, সেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ক্ষরাট্ নহপানই শকাব্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া অনুমিত হয়।

খ্রীষ্টীয় ৭৮ অব্দে শকাব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৪১ শকাব্দে (৩১৯ খ্রীঃ) গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগুপ্ত আবির্ভূত হন। শ্রীগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের কাল হইতে (৩১৯ খ্রীঃ) গুপ্তাব্দের কাল গণনা আরম্ভ হয়। শ্রীগুপ্ত ও তাঁহার পুত্র ঘটোৎকচের সময়ে গুপ্তসাম্রাজ্য সবিশেষ সমৃদ্ধ ও পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। শকবংশীয় সত্রপ সম্রাটদিগের শেষ সম্রাটকে পরাভূত করিয়া শ্রীগুপ্তের পৌত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুজরাট পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে মহাপরাক্রান্ত গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সত্রপ সম্রাটদিগের রাজত্বকালে গুজরাটে শকাব্দ প্রচলিত ছিল। ৩০৪ শকাব্দের পরবর্ত্তী কোন শাসনলিপি বা মুদ্রায় সত্রপদিগের উল্লেখ দেখা যায় না। অতএব ৩৮২ খ্রীঃ বা তৎসন্নিহিত কালে চন্দ্রগুপ্ত সত্রপদিগের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত করিয়া গুপ্তসাম্রাজ্যের সীমা সবিশেষ পরিবর্দ্ধিত করেন।

গুপ্তসাম্রাজ্য মগধেই প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া অনুমান হয়। ক্রমে ক্রমে তাহা পশ্চিমে গুর্জ্জর ও মালব এবং পূর্ব্বভাগে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়। বিষ্ণু পুরাণের মতে মগধের গুপ্তগণের রাজ্য গঙ্গার উপকূলভাগে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বায়ুপুরাণ বিষ্ণুপুরাণের অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া পণ্ডিতবর রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকর নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং স্বমতের পরিপোষক নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বায়ুপুরাণের মতে সাকেত (অযোধ্যা) গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মগধের প্রধান নগরী পাটলিপুত্রই গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রধান রাজধানী ছিল। গ্রাণ্ট (A. Grant) সাহেব অযোধ্যা হইতে গুপ্ত সম্রাটদিগের যে সকল স্বর্ণমুদ্রা আহরণ করেন, তাহার অধিকাংশই প্রাচীন সাকেত, ফৈজাবাদের নিকটবর্ত্তী অযোধ্যা নগরের নিকট প্রাপ্ত হন। হুপার (Hooper) সাহেব অযোধ্যার পূর্ব্ব ভাগ হইতে অনেক গুপ্তমুদ্রা সংগ্রহ করেন। এতদ্দ্বারা বায়ু পুরাণের ঐতিহাসিক সত্য নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

বহুতর যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া সুপণ্ডিত ভিনসেণ্ট স্মিথ (A. V. Smith) সাহেব ১৮৮৪ খ্রীঃ কনোজের পরিবর্ত্তে পাটলীপুত্র নগরকেই গুপ্তদিগের প্রধান রাজধানী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। কনোজ, বারাণসী ও এলাহাবাদ গুপ্তসম্রাটদিগের অধিকৃত প্রধান নগরী মধ্যে পরিগণিত ছিল। কনোজ নগরে কনোলি (Lieut. Conolly) কর্ত্তৃক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। এই মুদ্রালিপির পাঠ হইতেই পণ্ডিতকুলচূড়ামণি জেমস্ প্রিন্সেপ বহুতর গুপ্তমুদ্রার মর্ম্ম উদ্ধার করেন। গুপ্তসম্রাটদিগের ৩৭টী মুদ্রার মর্ম্ম প্রিন্সেপ সাহেব উদ্ধার করেন। তন্মধ্যে ৩টী মাত্র কনোজ নগরে পাওয়া যায়। গুপ্তমুদ্রায় গ্রীক ও মুসলমান নৃপতিদিগের মুদ্রার ন্যায় মুদ্রাপ্রস্তুতের স্থান বা টাঁকশালের নাম দেখা যায় না। মুদ্রাবিকৃতির স্থানের দ্বারা তাঁহাদের

সাম্রাজ্যের সীমা নিঃসন্দিগ্ধরূপে নির্ণীত হইতে পারে।

কনোজ নগরী গুপ্ত সম্রাটদিগের রাজধানী থাকিলে তথায় তাঁহাদের নামাঙ্কিত বহুতর স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা কি তাম্র মুদ্রা অবশ্যই আবিষ্কৃত হইত। কিন্তু ৬টীর অধিক স্বর্ণমুদ্রা কনোজ নগরে পাওয়া যায় নাই। কনোজের পশ্চিম ও উত্তরপশ্চিমে ১০ টী স্বর্ণমুদ্রা মাত্র পাওয়া গিয়াছে। কনোজের পূর্ব্ব ভাগে অন্যূন ৬৯০টী স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কনোজের পূর্ব্বভাগে গুপ্ত সম্রাটদিগের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। আফগানিস্থান ও পঞ্জাবে বহুতর শকনৃপতিদিগের নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু একটীও গুপ্তমুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা হইতে অনুমান হইতেছে যে, পঞ্জাবে গুপ্তদিগের অধিকার বিস্তৃত হয় নাই।

যখন ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব ভারতবর্ষের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন, তখন ১৭২টী স্বর্ণমুদ্রা (gold darics) বারাণসীতে আবিষ্কৃত হইয়া বিলাতে ডিরেক্টর সভার নিকট প্রেরিত হয়। ঐ সকল মুদ্রা টাঁকশালে দ্রবীভূত হইয়া চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়। এই সকল গুপ্তমুদ্রা বলিয়া অনুমিত হয। ১৭৮৩খ্রীঃ হুগলীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী কলিকাতার সন্নিহিত কালীঘাটে ২০০ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। তাহা টাকশালে বিনষ্ট না হইয়া, ব্রিটিস মিউজিয়মাদি স্থানে রক্ষিত ও বিতরিত হয়। তাহা নিকৃষ্ট ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত হইলেও, গুপ্তমুদ্রা বটে। ১৮৩৮ খ্রীঃ ট্রেগিয়ার (Tregear) সাহেব জোয়ানপুরের সন্নিহিত "জয়চন্দ্রের মহল" নামক পুরাতন স্থানে কয়েকটী গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হন। ১৮৫১ খ্রীঃ বারাণসীর ১২ মাইল দূরবর্ত্তী ভরসর নামক প্রাচীন গ্রামে বহুসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা মেজর কিটোর (Major M. Kittoe) যত্নে আবিষ্কৃত হয়। সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত (১) মহেন্দ্র, স্কন্দগুপ্ত ও প্রকাশাদিত্যের নামাঙ্কিত ৩২টী মুদ্রার বিবরণ মেজর কিটো প্রকাশ করেন। ১৮৫২খ্রীঃ যশোহর জিলার অন্তর্গত মহম্মদপুরে অরুণখালী নদীর তীরে গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (২) কুমারগুপ্ত (১) এবং স্কন্দগুপ্তের নামাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রার সহিত কিরণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্কগুপ্তদেবের (অনুমান ৬০০ খ্রীঃ) এক রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় ১৮৫৪খ্রীঃ গোরখপুর জিলায় সরযূর তীরবর্ত্তী গোপালপুর গ্রামে ২০টী গুপ্ত সম্রাটদিগের স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। অনুমান ১৮৬৪ খ্রীঃ প্রথম কুমারগুপ্তের নামাঙ্কিত প্রায় ২০০ স্বর্ণ মুদ্রা আলাহাবাদে আবিষ্কৃত হয়। ১৮৭৭ খ্রীঃ প্রথম কুমারগুপ্তের ২০৩০টী স্বর্ণমুদ্রা আলাহাবাদের নিকটবর্ত্তী ঝুসি গ্রামে পাওয়া যায়। ১৮৮৪খ্রীঃ ১৩টী গুপ্তমুদ্রা হুগলীতে আবিষ্কৃত হয়। এতদ্ভিন্ন মেদিনীপুর, মহানদ, মির্জাপুর, গাজীপুর, গয়া, পাটনা, সাহারানপুর, বুলন্দসহর, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, মথুরা, আগ্রা, আজমীর ও উজ্জয়িনী নগরে কতিপয় গুপ্তবংশীয় স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়।

আবিষ্কৃত স্বর্ণমুদ্রার স্থান সকলের নাম হইতে গুপ্তসাম্রাজ্য যে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে বিস্তৃত ছিল, তাহার নিঃসন্দিগ্ধ বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। কনোজ যে গুপ্তসম্রাটদিগের রাজধানী ছিলনা, মুদ্রা প্রাপ্তির স্থান সমূহের নামমালা হইতে তাহাও প্রতীয়মান হইতেছে। কনোজ যে অতি প্রাচীন নগরী, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। গ্রীক ভূগোলবিৎ টলেমি অনুমান১৪০-৬০খ্রীঃ ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ৪০০খ্রীঃ চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান

কনোজ পরিদর্শন পূর্ব্বক তাহার সমৃদ্ধি বর্ণনা করিয়াছেন। উহা তখন গুপ্ত সম্রাটদিগের অধিকার-ভুক্ত ছিল। থানেশ্বর হইতে বর্দ্ধন রাজবংশ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ বা মধ্য-ভাগ কনোজে রাজধানী স্থাপন করিয়া,তাহার গৌরব ও সমৃদ্ধি বিশেষরূপে বৃদ্ধি করেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর তাঁহাদের সম্পর্কিত বর্দ্ধনবংশ কনোজে রাজপাট প্রতিষ্ঠিত করে। বর্দ্ধনবংশীয় শেষ নৃপতি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হর্ষবর্দ্ধনশীলাদিত্যকে (৬০৮ ৪৮ খ্রীঃ) চৈনিক পরিব্রাজক সুবিখ্যাত হিয়াংসাং সমগ্র ভারতের (আর্য্যাবর্ত্তের) রাজাধিরাজ সম্রাট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৬৩৪ খ্রীঃ হিয়াংসাঙ্ কান্যকুব্জ নগরে উপনীত হন। বর্দ্ধনবংশের রাজ্যারম্ভ হইতে গাহড়বার রাজপুত বংশের অধঃপতন পর্য্যন্ত (অনুমান ৫৫০—১১৯৪ খ্রীঃ) কনোজের ধারাবাহিক ইতিহাস ভবিষ্যতে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল। অযোধ্যা, আলাহাবাদ, বারাণসী ও উজ্জয়িনীর ন্যায় কনোজ গুপ্তসম্রাট্‌দিগের অন্যতম প্রধান নগরী ছিল। রাজধানী থাকা সম্পর্কে কোনও প্রমাণ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

কর্ণেল উইলফোর্ড ও গাজীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ওল্ডহাম (Wilson Oldham) সাহেব পাটলী পুত্রকে (বর্ত্তমান পাটনা) গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাটলীপুত্রে মৌর্য্যবংশীয় সম্রাটদিগের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। ৪০০ খ্রীঃ ফাহিয়ানের ভ্রমণ কালেও পাটলীপুত্র সমৃদ্ধ নগরী ছিল। সম্ভবতঃ বৈদেশিক হূনজাতি সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের রাজধানী পাটলীপুত্রকে তদনন্তর এরূপ ভাবে বিধ্বস্ত করে যে,৬৩২ খ্রীঃ চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াংসাঙ্ প্রাচীন শ্রাবস্তীর ন্যায় ভারতের রাজধানীকে এক সামান্য হীনাবস্থ গ্রামে পরিণত দেখিতে পান। গুপ্তসাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর, কনোজের মহতী শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। তৎ সঙ্গে সঙ্গে গুপ্তসাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্র খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পরিত্যক্ত নগরীর হীনাবস্থা ধারণ করে। তদবধি তাহার অবনতি আরম্ভ হইয়া, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সামান্য গ্রামে পরিণত হয়। প্রাচীন পাটলীপুত্র এক্ষণে পাষাণময় কুক্ষিগত হওয়ায় নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

জেনারেল কানিংহাম (Arch Report XI. 153) নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ২২২-২৮০ খ্রীঃ জনৈক চৈনিক পরিব্রাজক পাটলীপুত্রে মহাপরাক্রান্ত এক রাজার রাজধানী দেখিতে পান। এই রাজাকে তিনি কুমারগুপ্ত ১ মহেন্দ্র বলিয়া অনুমান করেন। আমাদের বিবেচনায়,এই নরপতি গুপ্তসম্রাটদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ প্রথম কুমারগুপ্ত ৪১৫ ৪৫৪ খ্রীঃ পাটলীপুত্র নগরীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। গুপ্তসম্রাটদিগের পূর্ব্ববর্ত্তন কালেও যে পাটলীপুত্র মহাসমৃদ্ধ রাজ্যের রাজধানী ছিল, ইহা হইতে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙ্গ (I-tsing) অনুমান ৬৯০-৭০০ খ্রীঃ পর্য্যটন উপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তখন গুপ্তবংশীয় দেবগুপ্ত পূর্ব্ব ভারতের সম্রাটরূপে মগধে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইৎসিঙ্গ তাঁহাকে দেববর্ম্মা নামে উল্লেখ করিয়াছেন। মগধের মহারাজ শ্রীগুপ্ত গঙ্গাতীরস্থ মৃগশিকবন মন্দিরের নিকট চীন দেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আবাস জন্য যে মন্দির নির্ম্মিত করাইয়া দেন,তাহার ভগ্নাবশেষ এই চৈনিক পরিব্রাজক দেখিতে পান। তাঁহার বর্ণনা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে ইহা হইতে গুপ্ত

সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতার নাম যে শ্রীগুপ্ত ও পাটলীপুত্রে যে তাঁহার রাজধানী ছিল, স্পষ্টাক্ষরে তাহারপ্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।*

মহারাজ প্রথম চন্দ্র গুপ্ত সময় হইতে তাঁহার অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র বালাদিত্য নরসিংহ গুপ্তের সময় পর্য্যন্ত (৩৬০-৫৩৩ খ্রীঃ) সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত গুপ্তসম্রাটদিগের পদানত থাকে। তাঁহাদের বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত বঙ্গদেশ হইতে পশ্চিমে গুজরাট পর্য্যন্ত এক শাসন দণ্ডের অধীনে অবস্থিত থাকে। ৪৮৪ খ্রীঃ হুনরাজ তোড়ামন পশ্চিম মালবে আপতিত হইয়া, তাহার রাজা মাতৃবিষ্ণুকে পরাজিত ও নিহত করিয়া অধিকার করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধান্যবিষ্ণু ভ্রাতার মৃত্যুর পর রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন। এই সময়ে পূর্ব্বমালব গুপ্তবংশীয় বুধগুপ্ত শাসন করিতেছিলেন। ৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দের বুধগুপ্তের নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ ৪৯৪ খ্রীঃ পূর্ব্বমালব তোড়ামনের পদানত হয়। এই বৎসর গুপ্তসম্রাট নরসিংহ গুপ্তকে পরাজিত করিয়া তোড়ামন মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। ৪৯৪-৫১০ খ্রীঃ সম্রাট তোড়ামন গুপ্তসাম্রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়া, তাহা শাসন করিতে থাকেন। সম্ভবতঃ ৫১০ খ্রীঃ গুপ্ত সম্রাটের অধীনস্থ গুজরাটের শাসনকর্ত্তা ভট্টারক সেনাপতি কনক সেন ও পূর্ব্বমালবের বুধগুপ্তের উত্তরাধিকারী ভানুগুপ্ত হুনরাজ তোড়ামনকে পরাজিত করিয়া সাম্রাজ্যে সম্রাট্ নরসিংহগুপ্তকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন বুধগুপ্ত, ভানুগুপ্ত ও তোড়ামনের শাসনলিপি পূর্ব্বমালবের অন্তর্গত এরাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ভট্টারক সেনাপতি কনকসেন হইতে গুজরাটের সুবিখ্যাত বল্লভীবংশ উদ্ভূত হইয়াছে ৪৯৫-৫১৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত সম্রাট নরসিংহ গুপ্তের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা রূপে তিনি গুজরাট সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে শাসন করিতে থাকেন কনকসেন মিহিরকুলে জাত হুনরাজ তোড়ামনকে পরাজিত করিয়া "মৈত্রক"-দলঃ বলিয়া বল্লভী সম্রাটদিগের শাসন পত্রে অতঃপর বর্ণিত হইতে থাকেন। বল্লভাবংশের প্রতিষ্ঠাতার হস্তে পরাজয়ের কিছুকাল পরেই তোড়ামনের মৃত্যু ঘটে এবং সম্ভবতঃ ৫১৫ খ্রীঃ তাহার পুত্র মিহির-কুল পৈতৃক রাজ্যলাভ করেন। ডাক্তার মিত্র ইঁহাকে পশুপতি নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পিতার ন্যায় পুত্রও মহাপরাক্রান্ত হইয়া উঠেন এবং গুপ্তসাম্রাজ্যে পুনঃ পুনঃ উপদ্রব করিতে থাকেন। ৫৩০ খ্রীঃ নরসিংহ গুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিক্রমাদিত্য কুমার গুপ্ত (দ্বিতীয়) পাটলীপুত্রের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। শ্রাবস্তী তাঁহার প্রিয় আবাসস্থল ছিল, কিন্তু উহা তাঁহার রাজধানী ছিল কি না, নিশ্চয় বলা যায় না।

৫৩০খ্রীঃ বালাদিত্য নরসিংহ গুপ্তের সেনাপতি প্রবল পরাক্রান্ত হুনরাজ মিহিরকুলকে (পশুপতি) যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, বন্দীভাবে

* "All parts of the world have their appropriate temples, except China, so that priests from that country have many hardships to endure. Eastward, about forty stages following the course of the Ganges, we come to the Mrigasikavana temple. Not far from this is a ruined establishment, called the China Temple. The old tradition says that formerly a Maharaja called Sri Gupta built this for the priests of China. At this time some Chinese priests, some twenty men or so, came from Sz'chuan to the Mahabodhi Temple to pay worship to it, on which the king, seeing their piety, gave them as a gift this plot of land. The land now belongs to the king of Eastern India, whose name is Deva Varmma."

(Journal of Royal Asiatic Society, N. S. P. 571 XIII.)

সম্রাট নরসিংহ গুপ্তের সমীপে আনয়ন করেন। ৫১৫-৫৩০খ্রীঃ পর্য্যন্ত মিহিরকুল পুনঃ পুনঃ গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক অস্থির করিয়া তোলেন। গোয়ালিয়ারের শাসনপত্র দৃষ্টে এরূপ অনুমিত হয়। বালাদিত্য নরসিংহ গুপ্তের মাতার অনুরোধে সম্রাট তাঁহার প্রাণদান করেন। তদবধি তিনি মাতৃগুপ্ত নামে পরিচিত হন। অতঃপর ৪ বৎসর কাল কাশ্মীরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তাহা শাসন করিয়া রাজপদ স্বেচ্ছানুসারে পরিত্যাগ করেন। মিহিরকুল ও মাতৃগুপ্ত যে অভিন্ন ব্যক্তি, সুপণ্ডিত ডাক্তার হারনলি তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরিব্রাজক হিয়াংসাঙ্ এই মিহিরকুল ও বালাদিত্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

মিহিরকুলের পরাজয়ের পর মহারাজ নরসিংহ গুপ্তের (৪৮৫-৫৩০) মৃত্যু হয়। তদনন্তর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় সমুদ্র গুপ্ত (৫৩০-৫৫০ খ্রীঃ) পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করেন। মিহিরকুলের বিজেতা সেনাপতি যশোবর্ম্মন মহারাজাধিরাজ-বিষ্ণুবর্দ্ধন উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হন। ৫৩০-৫৪০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত সম্রাটের পদে বিষ্ণুবর্দ্ধন আসীন ছিলেন। দ্বিতীয় সমুদ্র গুপ্ত আপন রাজত্ব আরম্ভের দুই তিন বৎসরের মধ্যেই বিষ্ণুবর্দ্ধন দ্বারা সম্রাট্ পদ হইতে অবনীত হন। এদিকে গুজরাটে বল্লভীবংশ স্বাধীনতা অবলম্বন করে। তোড়ামনের পরাজয় হেতু বল্লভীবংশের প্রতিষ্ঠাতা সেনাপতি কনকসেনের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র দ্রোণসিংহকে ৫২০ খ্রীঃ মহারাজ পদে সম্রাট্ নরসিংহ গুপ্ত অভিষিক্ত করেন। ৫৩০ ৮০ খ্রীঃ মহারাজ বিষ্ণুবর্দ্ধন কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন বলিয়া ডাক্তার হারনলি অনুমান করেন।

৫৪০-৫৮৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত মৌখরীবর্ম্মন বংশীয় ঈশান বর্ম্মন, সর্ব্ববর্ম্মন, সুস্থিত বর্ম্মন ও অবন্তীবর্ম্মন রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। তদনন্তর কনোজের বৰ্দ্ধন রাজবংশীয় প্রভাকরবর্দ্ধন, রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্য ৫৮৫-৬৪৮ খ্রীঃ পর্য্যন্ত সম্রাটের পদলাভ করেন। হর্ষবর্দ্ধনের পর পূর্ব্ব ভারতে গুপ্তবংশীয় আদিত্য সেন মগধে, এবং বল্লভীবংশীয় তৃতীয় শীলাদিত্য পশ্চিম ভারতের গুজরাটে মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেন। প্রায় এক শতাব্দী পর্য্যন্ত এই উভয় বংশ পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারত অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন করিতে থাকেন। নিম্নে গুপ্তসম্রাটদিগের আনুমানিক সময় নির্দ্দিষ্ট হইল।

গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণ।

(৩১৯—৪০) শ্রীগুপ্ত।
|
(৩৪০—৬০) ঘটোৎকচ।
|
(৩৬০—৮০) চন্দ্রগুপ্ত (প্রথম)—নেপালের লিচ্ছবীবংশীয় কুমারদেবীর পাণিগ্রহণ করেন।
|
৩৮০—৪০০)সমুদ্রগুপ্ত—পত্নীর নাম দত্তাদেবী।
|
(৪০০—৪১৪)চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়)—পত্নীর নাম ধ্রুবদেবী।
|
(৪১৫—৫৪) কুমারগুপ্ত (প্রথম) —অনন্তসেনের ভগিনী অনন্তাদেবী ইঁহার পত্নী।
(মহেন্দ্র)—উচ্ছাকল্প মহারাজবংশীয় জয়দেব ইঁহার ভগিনী কুমারীদেবীকে বিবাহ করেন।
|
(৪৫৫—৬৮) স্কন্দগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) পুরগুপ্ত (৪৬৯—৮৪)—শ্রীবৎসদেবীকে বিবাহ করেন।
|
(৪৮৫—৫৩০) নরসিংহগুপ্ত—শ্রীমতীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন।
(বালাদিত্য)
|
(৫৩০—৫০) কুমারগুপ্ত (দ্বিতীয়)
(বিক্রমাদিত্য)

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

সাকার ও নিরাকার উপাসনা। প্রত্যুত্তর। (১)

নব্যভারতে 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা' বিষয়ে আমার যে প্রবন্ধ ক্রমে ক্রমে ছয়বারে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দুইবার মাত্র বাহির হইতেই শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উহার এক প্রতিবাদ লিখিয়া পাঠান। সমগ্র প্রবন্ধটি প্রকাশিত না হইতেই,—তাহার অতি অল্প অংশ মাত্র প্রকাশ হইতেই,—এক প্রতিবাদ আসিয়া উপস্থিত! সাহিত্য-জগতে ইহা এক নূতন ব্যাপার বটে! ইহা সকলেই জানেন যে, যে প্রবন্ধের উত্তর দিতে হইবে, তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া উত্তর দিতে হয়। কিয়দংশমাত্র পাঠ করিয়া উত্তর দিতে যাওয়া যে অন্যায় ও নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য, ইহা কেনা বুঝেন? বাস্তবিক সব কথা না শুনিয়া,—কেবল কিয়দংশ মাত্র শুনিয়া, কথার উত্তর দিতে গেলে যে, প্রকৃত উত্তর হয় না, ইহা বালকেও বুঝে? কিন্তু গঙ্গেশ বাবু এমনি অসহিষ্ণু যে, আমার প্রবন্ধের কিয়দংশ মাত্র পড়িয়াই অমনি তাহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিলেন;—সমগ্র প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া তাহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক, এই সহজ বিবেচনাটীও তাঁহার মনে আসিল না;—নিরাকারবাদের পক্ষ সমর্থন এবং সাকারবাদের অযুক্ততা প্রদর্শন করিয়া, প্রবন্ধ প্রকাশ হইতেছে দেখিয়াই তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল! অমনি যুদ্ধবেশ ধারণ করিলেন। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বলিবেন, ইহা ন্যায় ও বিবেচনাসিদ্ধ কার্য্য হয় নাই।

গঙ্গেশ বাবু বলিতেছেন, "সাকার ও নিরাকারোপাসনার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি।" ঈশ্বরজ্ঞানে আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থের উপাসনাই সাকার উপাসনা। চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক; বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী মনুষ্য প্রভৃতি আকৃতি-বিশিষ্ট পদার্থের উপাসনা, সাকার উপাসনা। দেশপ্রচলিত মূর্ত্তি-পূজা, অবশ্য, সাকার উপাসনা।

সাকার কাহাকে বলে? যাহার বিস্তৃতি (extension) আছে, তাহাই সাকার।" "নিরাকার কাহাকে বলে? যাহার বিস্তৃতি (extension) নাই, তাহাই নিরাকার। কিন্তু নিরাকার উপাসনা বলিলে, চিন্ময়, নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনাই বুঝায়।

গঙ্গেশ বাবু বলিতেছেন,—"আমি বলি, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা সাকারোপাসনা ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা নিরাকারোপাসনা।" সগুণ বা নির্গুণ, বেদান্তানুসারে ব্রহ্মের যেরূপ অধ্যাস হউক না কেন, ব্রহ্মোপাসনা সর্ব্বথাই নিরাকার উপাসনা। সগুণ ব্রহ্মের যে হস্ত-পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে,—সগুণ ব্রহ্ম যে পরিমিত হইয়া দেশ কালে বদ্ধ হইয়াছেন, এমন নহে। সুতরাং সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা হইলেই যে উহা সাকার উপাসনা হইল, এমন হইতে পারে না। উহা নিতান্তই অযুক্ত কথা।

গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন, "যাহার নাশ আছে, তাহা সাকার, ও যাহার নাশ নাই, তাহা নিরাকার।" গঙ্গেশবাবু অবশ্য বলিবেন না যে, নাশ্য ও সাকার, এবং অবিনশ্বর ও নিরাকার একার্থবোধক শব্দ। যাহার নাশ আছে,—যাহা মৃত্যুর অধীন, তাহা নাশ্য। আর যাহা আকৃতিবিশিষ্ট,—যাহার বিস্তৃতি আছে,—তাহা সাকার। যাহা নাশ্য, তাহা সাকার হইতে পারে, এবং যাহা সাকার, তাহা নাশ্য হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া নাশ্য ও সাকার একার্থবোধক শব্দ নহে। সেইরূপ,

অবিনশ্বর ও নিরাকার একার্থবোধক শব্দ নহে। অবিনশ্বর বলিলে যাহা বুঝায়, নিরাকার বলিলে তাহা বুঝায় না। যাহা অবিনশ্বর তাহা নিরাকার হইতে পারে, এবং যাহা নিরাকার, তাহা অবিনশ্বর হইতে পারে, কিন্তু অবিনশ্বর ও নিরাকার একার্থবোধক শব্দ নহে।

গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন, "যাহার নাশ আছে, তাহা সাকার।" এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, যাঁহারা সাকার উপাসক, তাঁহারা কি নশ্বর পদার্থের উপাসনা করেন? আমাদের দেশবাসী সাকার উপাসকগণ এ কথায় নিশ্চয়ই বিরক্ত হইবেন। যিনি আমার ইষ্ট দেবতা,—যিনি আমার উপাস্য, তিনি নাশ্য;—সুতরাং ঈশ্বর নহেন, এমন কথা কেহই বলেন না,—বলা সম্ভব নহে। বলিলে উপাসনা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন,—"সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা, সাকারোপাসনা, ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা, নিরাকারোপাসনা।" আবার বলিতেছেন,—"যাহার নাশ আছে, তাহা সাকার।" এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, সগুণ ব্রহ্ম কি সাকার ও নাশ্য? সগুণ ব্রহ্মকে সাকার বলিলে, সাকারবাদীগণ, অবশ্য, আপত্তি করিবেন না। কিন্তু তাঁহাকে নাশ্য বলিলে তাঁহাদের মর্ম্মে আঘাত দেওয়া হয়।

গঙ্গেশবাবুর কথাটা কিরূপ দাঁড়াইতেছে দেখুন;—

যাহা নাশ্য, তাহা সাকার;
সাকারোপাসকের উপাস্য সাকার।
সুতরাং সাকারোপাসকের উপাস্য নাশ্য।
যাহা নাশ্য, তাহা পরমেশ্বর নহে;
সাকার উপাসকের উপাস্য নাশ্য;
সুতরাং তাহা পরমেশ্বর নহে।

গঙ্গেশবাবু সাকারবাদীদের উকীল হইয়াছেন। কিন্তু যে উকীল মোকদ্দমা লইয়া মক্কেলের সর্ব্বনাশ করেন, এমন উকীল কে চায়? গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন,—"আমি বলি, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা সাকারোপাসনা, ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা নিরাকারোপাসনা। যাহার নাশ আছে, তাহা সাকার ও যাহার নাশ নাই, তাহা নিরাকার।" প্রথমে বলিতেছেন,—"সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা সাকারোপাসনা।" তাহার পর, আবার বলিতেছেন,—"যাহার নাশ আছে, তাহা সাকার।" ইহাই কি বলা হইতেছে যে, সগুণ ব্রহ্ম সাকার ও নাশ্য? সগুণ ব্রহ্ম বলিলেই যে সাকার ও নাশ্য বুঝায়, ইহার যুক্তি কি? ইহার কি কোন প্রমাণ আছে?

যাহার নাশ আছে, তাহা সাকার; সুতরাং সাকার উপাসনা নশ্বরের উপাসনা। যাহা নশ্বর, তাহা ঈশ্বর নহে, সুতরাং সাকারোপাসনা, ঈশ্বরোপাসনা নহে। গঙ্গেশবাবু কি ইহাই বলিতে চান? ইহা সাকারবাদ সমর্থন করা নহে, সাকারবাদ বিনাশ করা।

কেহ বলিতে পারেন, নাশ্য পদার্থ মাত্রেই সাকার, কিন্তু সাকার মাত্রেই নাশ্য নহে। পশু মাত্রেই জীব, কিন্তু জীব মাত্রেই পশু নহে। এরূপ ভাবে তর্ক করিলে, সাকারবাদীদের উপাস্য দেবতাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করা যায়। কিন্তু "সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা, সাকারোপাসনা" এই কথা বলিয়াই তৎপরক্ষণে, "যাহার নাশ আছে, তাহা সাকার" এরূপ বাক্য বলিবার সার্থকতা কি?

এস্থলে গঙ্গেশবাবু বলিতে পারেন যে, সাকার নাশ্য বটে, কিন্তু আমি যে সাকারোপাসনা বলিতেছি তাহার অর্থ সাকারের উপাসনা নহে। সাকারের অবলম্বনে নিরাকারের উপাসনা।

ইহাই যদি তাঁহার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে তিনি তো প্রকারান্তরে নিরাকার উপাসনারই পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। তাঁহার মত যদি ইহাই হইল যে, সাকার বিনাশশীল,—উহা ব্রহ্ম নহে; সাকারের অবলম্বনে নিরাকারের উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা, তাহা হইলে সাকারবাদ কোথায় থাকিল? প্রকারান্তরে সাকারবাদকে খণ্ডিত করিয়া নিরাকারবাদই সমর্থিত হইল।

"এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কোন পদার্থের অবলম্বনে সেই পরম পুরুষের পূজা হয়।" —আমার লিখিত এই বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়া গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন,—

"ইহাতে বোধ হয় সাকারোপাসকের প্রতিমা বা বিগ্রহ, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোন পদার্থ নহে, যদি না হয়, তবে উহা কি? বনের ফুল ও মালীর প্রস্তুত বাগানের ফুল দেখিয়া যদি ঈশ্বরকে স্মরণ হয়, তবে একটা মৃত্তিকা স্তূপ বা মৃণ্ময়মূর্ত্তি দেখিয়া স্মরণ না হইলে তাহা কুসংস্কার নয় কি?"

এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কোন পদার্থ,—ইট্, কাঠ, পাথর প্রভৃতি যাহা কিছু,—এবং কালীঘাটের কালী, তারকেশ্বরের মহাদেব, দেওঘরের বৈদ্যনাথ, কাশীর বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি যে সকল মূর্ত্তি বা প্রস্তর খণ্ড স্থানে স্থানে দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেছে, এই উভয় কি সমান? কাশীর বিশ্বেশ্বরমূর্ত্তি এবং রাস্তার ঐ পাথর খানা কি সমান? গঙ্গেশ বাবু কি তাহাই বলিতেছেন? তাহা হইলে প্রচলিত সাকারবাদে আমার ন্যায় তাঁহার কিছুই বিশ্বাস নাই দেখিতেছি। এ বিষয়ে তাঁহাতে ও আমাতে প্রভেদ কোথায়?

কালীঘাটের কালীমূর্ত্তি এবং 'মালীর প্রস্তুত বাগানের ফুল', উভয়ই সৃষ্ট পদার্থ,—উহাদের উভয়ের সহিত, পরমেশ্বরের সৃষ্ট ও স্রষ্টা সম্বন্ধ। উভয়ের সহিত পরমেশ্বরের কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ। সুতরাং ফুলটা দেখিয়া ঈশ্বরকে যেমন স্মরণ হয়, কালীমূর্ত্তি দেখিয়াও ঈশ্বরকে সেইরূপ স্মরণ হয়। উভয়ই একশ্রেণী ভুক্ত। কালীমূর্ত্তি যেমন, ঐ ফুলটাও তেমন, ঐ রাস্তার পাথর খানাও সেইরূপ। তবে কালীমূর্ত্তির বিশেষত্ব কি রহিল? (পরমেশ্বরকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার পক্ষে, কৃত্রিম পদার্থ অপেক্ষা স্বাভাবিক পদার্থের উপযোগিতা যে অধিক, ইহা সুবুদ্ধি ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। যাহা হউক, এ স্থলে সে কথার বিশেষ প্রয়োজন নাই।)

ঐ রাস্তার পাথর খানা এবং জয়পুরের গোবিন্দজীর মূর্ত্তি, দুই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত পদার্থ। সুতরাং দুই সমশ্রেণীভুক্ত, এ কথা বলিলে তো পৌত্তলিকতা উড়াইয়া দেওয়া হইল। তাহা হইলে পৌত্তলিকতা কোথায় থাকে? গঙ্গেশবাবু যাহাই বলুন, সাধারণ হিন্দুগণ তাহা কখনই বলিবেন না। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত পদার্থ বলিয়া যদি সাকারবাদীর দেববিগ্রহ এবং যে কোন একটা পদার্থ সমান হয়, তাহা হইলে লোকে চট্টগ্রাম হইতে কালীঘাটে, এবং মান্দ্রাজ হইতে কাশী বৃন্দাবন ছুটাছুটি করেন কেন? বিশেষ বিশেষ দেবতার অস্তিত্বে, এবং মূর্ত্ত্যাদিতে ঐ সকল দেবতার বিশেষ অধিষ্ঠানে বিশ্বাস করেন বলিয়াই, ঐরূপ করিয়া থাকেন। ঐরূপ বিশেষ ভাবে মূর্ত্ত্যাদিতে অধিষ্ঠিত কল্পিত দেবতার পূজা করিতে ব্রহ্মোপাসক প্রস্তুত নহেন। এই স্থলেই প্রভেদ।

গঙ্গেশ বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন;—"হস্তে, পদে, জলে, বায়ুতে ও তাড়িতে যে সকল শক্তি থাকার কথা বলিয়াছেন, উহা-

দিগের দার্শনিক নাম কি, এবং ঐ সকল শক্তি উপাস্য কি না?" শক্তি ই উহার নাম। স্বতন্ত্র কোন দার্শনিক নাম আছে, এমন জানি না। "অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তি।" ব্রহ্মশক্তি অবশ্য উপাস্য। ব্রহ্ম হইতে তাঁহার শক্তি ভিন্ন নহে। সুতরাং ব্রহ্মকে ছাড়িয়া তাঁহার শক্তির স্বতন্ত্র উপাসনা স্বীকার করি না। গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন, "ঐ সকল শক্তি।" বহুশক্তি মানি না। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিতেছেন, নিখিলব্রহ্মাণ্ডে একই শক্তি কার্য্য করিতেছে।

গঙ্গেশবাবু জিজ্ঞাসা করিতেছেন ;—"নিরাকার মনের ক্ষয়ের স্বীকার করেন কি না, যদি না করেন, তবে সমাধি ও সুষুপ্তি কি প্রকারে সম্ভব হয়? মনের সাকারত্ব প্রতিপক্ষ করিয়া লেখক প্রশ্ন করিয়াছেন, "মন দীর্ঘ, কি চতুষ্কোণ, কি ত্রিকোণ, কি আকার? লেখক অন্যত্র বলিয়াছেন, "বায়ু অদৃশ্য হইলেও সাকার, উহা স্পর্শদ্বারা অনুভূত হয়; তাড়িত এক প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ, সূক্ষ্ম জড়।" সাকার বায়ু দীর্ঘ, চতুষ্কোণ, না ত্রিকোণ? সূক্ষ্ম জড় লম্বা না গোল? উহাদিগের আকৃতি, বিস্তৃতি, বেধ কি?"

সুষুপ্তি ও সমাধির অবস্থায় নিরাকার মনের ক্ষয় হয়, ইহা অমূলক কথা। সুষুপ্তি ও সমাধির অবস্থায় যদি মনের ক্ষয় হইত, তাহা হইলে সুষুপ্তি ও সমাধির পর, মন কিরূপে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়? যদি মন ক্ষয় হইয়াই গেল, তবে আবার কোথা হইতে আসে? সমাধি ও সুষুপ্তির পর দেখা যায় যে, যেমন মন তেমনি আছে। তবে কেমন করিয়া বলিব যে, মনের ক্ষয় হইয়াছিল? গাজিপুরের পাহাড়ী বাবা ভূগর্ভে পাঁচবৎসর সমাধির পর, জাগ্রত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যখন তিনি উপরে উঠিলেন, দেখা গেল, তাঁহার কিছুই ক্ষয় হয় নাই। গভীর নিদ্রার পর যখন মানুষ জাগ্রত হয়, তখন সে ষোল আনা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। যদি ক্ষয় হইয়া গিয়া থাকে, তবে আবার কোথা হইতে আসে?

"সাকার বায়ু দীর্ঘ, চতুষ্কোণ, না ত্রিকোণ? সূক্ষ্ম জড়, লম্বা না গোল ইত্যাদি।"

উত্তর ;—জল যেমন পাত্রে থাকে, সেইরূপ আকার ধারণ করে। বায়ু প্রভৃতি সূক্ষ্মজড়ও, সেইরূপ, যেমন আধারে থাকে, সেইরূপ আকার প্রাপ্ত হয়।

গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন,—"বিশ্বের উপাদান কি হইল? ব্রহ্ম স্বয়ং, না, ব্রহ্মেতর কোন পদার্থ? আমরা লেখককে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এই বাক্যটির ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করি। যদি চরাচর মূর্ত্তামূর্ত্ত সমস্তই ব্রহ্ম হয়, ভাল; যদি না হয়, তবে এই বিশ্বকে ব্রহ্মেতর পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে দ্বৈতবাদ আসিয়া পড়ে; আর যদি জগৎকে মিথ্যা বলেন, তবে লেখকের সত্তাও মিথ্যা, সুতরাং বিতণ্ডা নিষ্ফল।"

বিশ্বের উপাদান ব্রহ্মশক্তি। ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে। ব্রহ্মশক্তিতে সকল পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি, লয়; সকলই ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ; ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ ভিন্ন আর দ্বিতীয় কিছুই নাই। এই ভাবে, "একমেবাদ্বিতীয়ং" বাক্যটি বুঝি, ও ব্যবহার করিয়া থাকি। "একমেবাদ্বিতীয়ং" একই আছে, দ্বিতীয় নাই, অর্থাৎ সকলই ব্রহ্মশক্তির বিকার বা প্রকাশ, অন্য কিছু নাই। "চরাচর মূর্ত্তামূর্ত্ত সমস্তই ব্রহ্ম" বটে, অথচ নয়। কি ভাবে সমস্তই ব্রহ্ম? না, সমস্তই ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ; এবং শক্তি হইতে ব্রহ্ম অভিন্ন। ব্রহ্মনয়, কি ভাবে? "চরাচর মূর্ত্তামূর্ত্ত সমস্তই" ব্রহ্মশক্তির পরিমিত, সাময়িক, ও ক্ষণস্থায়ী

প্রকাশ। সুতরাং এসকলের কিছুই ব্রহ্ম নহে। যাহা পরিণত, সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী, তাহা কেমন করিয়া ব্রহ্ম হইবে? সেইজন্য উপনিষদে মহর্ষি এক স্থলে বলিতেছেন, সকলই ব্রহ্ম। আবার অন্য স্থলে বলিতেছেন, এ সকলের কিছুই ব্রহ্ম নহে। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ উভয়ের মধ্যেই সত্য রহিয়াছে।

আমি যাহা লিখিয়াছি, যদি একটু মনোযোগ করিয়া গঙ্গেশবাবু পাঠ করিতেন, তাহা হইলে আমার অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন।

অদ্বৈতবাদে যে সত্য আছে, তাহা আমি এইরূপে প্রকাশ করিয়াছি, "ব্রহ্মশক্তি জগৎ হইল। পদার্থকে ছাড়িয়া তাহার শক্তির স্বতন্ত্র সত্তা সম্ভব নহে। সুতরাং ব্রহ্মশক্তি জগৎ রূপে প্রকাশ হইয়াছে বলিলে, ব্রহ্মই জগৎ রূপে প্রকাশ হইয়াছেন, বলা হয়। ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মস্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। ব্রহ্মশক্তি জগৎ রূপে পরিণত হইয়াছে বলিলে, সৎস্বরূপ ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রকাশ হইয়াছেন, বলিতে হয়। ব্রহ্মের জ্ঞান, আনন্দ, প্রেম, দয়া, শান্তি, পবিত্রতা সকলই তাঁহার সৃষ্টিলীলায় প্রকাশ হইয়াছে। এ ব্রহ্ম ও তাঁহার সত্তায় সত্তাবান।"

আবার দ্বৈতবাদে কি সত্য আছে, তাহা দেখাইবার জন্য লিখিয়াছি,—"পরমেশ্বর নিত্য, জগৎ অনিত্য। পরমেশ্বর সার সত্য, জগৎ অসার, অসত্য। পরমেশ্বর স্থায়ী, অপরিবর্ত্তনীয়, জগৎ অস্থায়ী, চিরপরিবর্ত্তনশীল। যখন উভয়ের লক্ষণে এতদূর পার্থক্য, বা বৈপরীত্য, তখন কেমন করিয়া বলিবে যে, জগৎ ও ঈশ্বর এক? তিনি স্বয়ং এই জগৎ হইয়াছেন? এই জগতের অতীত তাঁহার স্বতন্ত্র সত্তা আছে কি না?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ, উভয়েই সত্য রহিয়াছে। অনেকের নিকট বিরোধী বলিয়া প্রতীত হইলেও, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতেছি। দ্বৈতাদ্বৈতবাদই প্রকৃত তত্ত্ব।

"নিরাকারবাদীর অবলম্বন নাই, একথা কে বলে? সাকারবাদীর অবলম্বন ক্ষুদ্র একটি প্রতিমূর্ত্তি, নিরাকারবাদীর অবলম্বন অখিল ব্রহ্মাণ্ড—ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ।" আমার প্রবন্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধৃত করিয়া গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন,—"ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, নিরাকারবাদীর অবলম্বন সাকার হইল, কি নিরাকার হইল?"

এ প্রশ্নের কি প্রয়োজন ছিল? যখন বহির্জগৎকে অবলম্বন বলা হইতেছে তখন উহা যে সাকার, সে কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়? যে স্থান হইতে ঐ অংশটুকু উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেস্থানে এই সাকার জগতের বর্ণনা রহিয়াছে,—"ক্ষুদ্রতম বালুকণা হইতে অত্যুচ্চ হিমালয় পর্য্যন্ত" ইত্যাদি, তবে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন যে, "অবলম্বন সাকার হইল, কি নিরাকার হইল"?

জড়জগৎ ও তদন্তর্গত পদার্থ অবলম্বন করিয়া যিনি পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, গঙ্গেশবাবুর মতে তিনি নিরাকার উপাসক নহেন, তিনি সাকারোপাসক। গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন,—"আমার সংজ্ঞা অনুসারে ইনি নিরাকারোপাসক পদবাচ্য হইতে পারেন না। যদি জগতে কেহ সাকারোপাসক থাকে, তবে ইনিই স্পষ্টতঃ তিনি।"

গঙ্গেশবাবুর সংজ্ঞা যে যুক্তিযুক্ত নহে, তাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি সুতরাং সেই সংজ্ঞা অনুসারে যাহা নিষ্পন্ন হয়, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। যিনি সাকার জগৎকে অবলম্বন করিয়া নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করেন, গঙ্গেশবাবু তাঁহাকে সাকার উপাসক বলিতেছেন। ইহার

তুল্য অসার কথা আর কি আছে? হিমালয় দর্শনে এক জনের মনে পরমেশ্বরের ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল;—তিনি সুগম্ভীর হিমাচলে বিশ্বপতির সত্তা, শক্তি, জ্ঞান—এক কথায়, তাঁহার আশ্চর্য্য মহিমা প্রকাশিত দেখিয়া আপনাকে কৃতার্থবোধে উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিলেন, —"জগদীশ! ধন্য! ধন্য! ধন্য! ধন্য তুমি! ধন্য তোমার মহিমা!" এই কথাগুলি কি তিনি ঐ সাকার হিমাচলকে বলিলেন? না, যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা চিন্ময়, সচ্চিদানন্দ পুরুষ হইতে হিমাচলের উৎপত্তি ও স্থিতি, তিনি তাঁহারই আরাধনা করিলেন? তিনি সাকার হিমালয়ের পূজা করিলেন না, হিমালয়ের সৃষ্টি কর্ত্তা, নিরাকার পরমেশ্বরেরই পূজা করিলেন। তবে কোন্ যুক্তি অনুসারে, বলেন যে, তিনি সাকার উপাসক? তিনি সাকারের উপাসনা করিলেন না,---করেন না।

ঐ বৃক্ষটী দেখিয়া আমার পরমেশ্বরকে স্মরণ হইল। ঐ বৃক্ষে তাঁহার মহিমা দর্শন করিয়া আমি মনে মনে তাঁহার আরাধনা করিলাম। আমি সাকার বৃক্ষের আরাধনা করিলামনা; যিনি বৃক্ষের সৃষ্টিকর্ত্তা, সেই নিরাকার পরমেশ্বরেরই আরাধনা করিলাম। তবে আমি সাকার উপাসক বলিয়া গণ্য হইব কেন? সাকারের উপাসনা করিলে সাকার উপাসক হয়। সাকার বৃক্ষের তো উপাসনা করিলাম না; বৃক্ষের সৃষ্টিকর্ত্তা নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করিলাম; তবে কেন আমাকে সাকারউপাসক বলিবে? কোন প্রকারে সাকারকে অবলম্বন করি বলিয়া বলিতে পারেন, সাকার অবলম্বী, অথবা সাকার হইতে 'সাহায্য গ্রহণকারী।' কিন্তু 'সাকার উপাসক' এই অমূলক কথা কেন বলেন, ইহা কি অসত্য ও অন্যায় নহে?

ব্রহ্মজ্ঞানের প্রধান শাস্ত্র উপনিষদে, প্রাচীন আর্য্য মহর্ষি বহির্জগতে পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করার কথা বলিতেছেন;—

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
নচেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥

এখানে তাঁহাকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, না জানিতে পারিলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়; অতএব ধীরেরা স্থাবর জঙ্গম সমুদয় বস্তুতে একমাত্র পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হইয়া অমর হয়েন।

পৃথিবীতলে ও গগনমণ্ডলে, আর্য্য মহর্ষি কেমন তাঁহার মহিমার কথা বলিতেছেন,—

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্যস্যৈষ মহিমা ভুবি দিব্যে।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।"

যিনি সামান্যরূপে ও বিশেষরূপে সর্ব্ববস্তু জানিতেছেন, ভূলোকে ও দ্যুলোকে যাঁহার এই মহিমা, যিনি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে, প্রকাশ পাইতেছেন; জ্ঞানদ্বারা ধীরেরা তাঁহাকে সর্ব্বত্র দৃষ্টি করেন।"

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে মেঘ, ও বায়ু ও মৃত্যু ধাবিত হইতেছে। প্রাচীন আর্য্য মহর্ষি সমস্ত জগতে পরব্রহ্মের মহিমা ও লীলা দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। ইহা কি ব্রহ্মের আরাধনা নহে? অথবা বলিবেন কি যে, তাঁহারাও সাকার উপাসক ছিলেন?

তাহার পর গঙ্গেশবাবু বলিতেছেন;—

"আর প্রত্যেক পদার্থ অর্থে, প্রতিমাবাদে বোধ হয় জগতের ইট, কাঠ, জল, পাথর, ঘসী, ঢেলা ইত্যাদি সমস্ত; প্রতিমাটা বাদ দিলেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না, রাস্তার একখানা পাথরের খোয়া বুঝাইবে, তথাপি সাকারোপাসকের নারায়ণ শিলা বুঝাইবে না, ইহারই বা মারপেঁচ কি? আর সাকারবাদীর প্রতিমূর্ত্তি অপেক্ষা একটা ঢেলা বা ঘসী আয়তনে বড় না ছোট? তবে সাকারবাদীর অবলম্বন, ক্ষুদ্র একটী প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াছেন, কেন? এ ক্ষুদ্রত্ব কি হিসাবের?"

"প্রতিমাটা বাদ দিলেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না" কে বলিল যে, প্রতিমাটা বাদ দিয়াছি? আমার প্রবন্ধের কোন স্থলে কি লেখা আছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত পদার্থ নিচয়ের মধ্যে প্রতিমাটা বাদ দেওয়া হউক? গঙ্গেশবাবু এ কথা কোথায় পাইলেন?

সাকারবাদীদিগের দেববিগ্রহ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত পদার্থ সকলের মধ্যে। "জগতের ইট, কাঠ, জল, পাথর, ঘসী ঢেলা ইত্যাদি সমস্ত" যেমন সৃষ্টপদার্থ, সাকারবাদীর প্রতিমাও সেইরূপ সৃষ্ট পদার্থ। সৃষ্টপদার্থ স্রষ্টাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রত্যেক সৃষ্টপদার্থে, স্রষ্টার সত্তা, শক্তি, জ্ঞান প্রভৃতি যেমন প্রকাশ পায়। "ইট, কাঠ, জল, পাথর, ঘসী, ঢেলা ইত্যাদি সমস্ত" পদার্থে যেমন প্রকাশ পায়, প্রতিমাতেও সেইরূপ প্রকাশ পায়। কেননা লোকে যাহাকে প্রতিমা বলে, উহা সৃষ্ট পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং যখন বলিতেছি যে, অখিল ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ ব্রহ্মপূজার অবলম্বন, তখন প্রতিমা কেমন করিয়া বাদ যাইবে? প্রতিমা কি ব্রহ্মাণ্ড ছাড়া? "ইট, কাঠ, জল, পাথর, ঘসী, ঢেলা" যেমন, প্রতিমাও সেইরূপ। সকল পদার্থই ব্রহ্মের মহিমা প্রকাশ করিতেছে সকল পদার্থই ব্রহ্মোপাসনার অবলম্বন।

কিন্তু সাকারবাদীর প্রতিমাকে ব্রহ্মোপাসক প্রতিমারূপে গ্রহণ করিতে পারেন না প্রতিমা শব্দের অর্থ প্রতিমূর্ত্তি। যাহার মূর্ত্তি আছে, তাহারই প্রতিমূর্ত্তি সম্ভব। কিন্তু অনন্তের মূর্ত্তি অসম্ভব।* অনন্ত পরমেশ্বরের মূর্ত্তি অসম্ভব। সুতরাং তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি অসম্ভব সেই জন্য অনন্ত পরব্রহ্মের উপাসক, সাকারবাদীর বিগ্রহকে প্রতিমারূপে গ্রহণ করিতে পারেন না। ব্রাহ্মের যিনি উপাস্য, তিনি সর্ব্বব্যাপী; অসীম। তাঁহার প্রতিমা সম্ভব নহে; প্রতিমা নাই। আমার প্রবন্ধের যে অংশ নব্যভারতে দ্বিতীয় বারে প্রকাশ হইয়াছে, গঙ্গেশবাবু তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিতেন

জগৎ অবলম্বন করিয়া জগদীশ্বরের উপাসনা, এবং আমাদের দেশপ্রচলিত সাকার-উপাসনা, এ উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

১২৯৯ সালের জ্যৈষ্ঠের নব্যভারতে আমার প্রবন্ধের যে অংশ প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতে প্রচলিত পৌত্তলিকতা কি অনন্ত ব্রহ্মের পূজা; এই প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিত রূপে আছে। আমার প্রবন্ধের কিছু অংশমাত্র নব্যভারতে দুইবারে প্রকাশ হইলেই, গঙ্গেশবাবু উহার উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন। তৃতীয়বারে যাহা প্রকাশ হইয়াছে, তাহা দেখিবার পূর্ব্বেই তিনি উত্তর লিখিয়াছেন। সুতরাং তিনি এমন অনেক কথা লিখিয়াছেন, যাহার উত্তর আমার প্রবন্ধের মধ্যেই আছে। যদি তিনি একটু সহিষ্ণু হইয়া সমগ্র প্রবন্ধ প্রকাশ হইলে উহার

* নব্যভারত ১২৯৯; বৈশাখ। সাকার ও নিরাকার উপাসনা। (২) দেখ।

উত্তর লিখিতেন, তাহা হইলে, "প্রতিমাটা বাদ দিলেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না, রাস্তার এক খানা পাথরের খোয়া বুঝাইবে, তথাপি সাকারোপাসকের নারায়ণ শিলা বুঝাইবে না, ইহারই বা মারপেঁচ কি ?,, ইত্যাদি কথা লিখিবার প্রয়োজন হইত না।

"সাকারবাদীর অবলম্বন ক্ষুদ্র একটি প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াছেন কেন ? এ ক্ষুদ্রত্ব কি হিসাবের ?" ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় ক্ষুদ্র ; এবং লোকে ক্ষুদ্র বা পরিমিতে বদ্ধ বলিয়া ক্ষুদ্র বলা হইয়াছে। ক্রমশঃ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গরিব ব্যাঙ্ক।

"তোমার টাকা আছে। আমার টাকা নাই। তুমি কিন্তু খাটিতে পার না। আমি খাটিতে পারি। তুমি টাকা খাটাইতে পার না, আমি টাকা খাটাইতে পারি। কিন্তু আমি টাকা খাটাইব কি করিয়া ? আমার যে টাকা নাই। আমি গরিব কৃষাণ, খাটিয়া খাইতে চাহি, চাষবাস করিয়া সংসার চালাইতে চাহি। কিন্তু পারি কই, চাষ করিতে হইলে যে জমি চাহি, জমিদারকে খাজনা না দিলে যে জমি পাই না। আমার টাকা নাই, খাজনা কেমন করিয়া দিব ? চাষ করিতে হইলে, লাঙ্গল চাহি, গরু চাহি, বীজ চাহি। আমি এ সকল পাই কোথা ? আমার যে টাকা নাই। যদি তুমি এখন আমাকে টাকা ধার দেও, আমি সেই টাকা দিয়া জমি লইয়া, লাঙ্গল ও গরু কিনিয়া, চাষ করিয়া, ফসল হইলে, ফসল বেচিয়া, তোমার টাকা শোধ করিব এবং সেই ফসল হইতে আমার দিন গুজরান হইবে, আমি দুই মুটা খাইয়া বাঁচিব। তুমি আমাকে টাকা অমনি ধার দিবে কেন ? দয়া করিয়া। অতদূর দয়া তোমার নাই ? তুমি কিছু লাভ না পাইলে আমাকে টাকা ধার দিবে না ? আচ্ছা, বেশ, আমি সুদ দিব। তাহাতে তোমারও লাভ হইবে, আমারও লাভ হইবে। তোমার লাভ অর্থ বৃদ্ধি, আমার লাভ জীবনরক্ষা। আমি তোমার টাকা ধার না লইলে তোমার টাকা খাটিবে না, তাহার বৃদ্ধি হইবে না ; তুমি আমাকে টাকা ধার না দিলে আমার খাইবার উপায় হইবে না। তুমি টাকা ধার দিয়া আমার জীবন রক্ষার বিষয় সাহায্য করিবে সুতরাং তোমাকে আমি "মহাজন" বলিয়া স্বীকার করিয়া তোমার খাতাতে আমার নামে হিসাব পত্তন করিলে, আমি তোমার "খাতক" হইব *।

ফসল হইলে যে তোমার কর্জ্জ শোধ করিব, তুমি কেমন করিয়া জানিলে ? বিশ্বাস (credit)। তুমি বলিতেছ, পুরা বিশ্বাস হইতেছে না। ভাল, লেখা পড়া করিয়া লও, এই খত লিখিয়া দিলাম। লিখিয়া লইলে বটে, তবু তুমি সুদসমেত আসল টাকা পাইবে, এই বিশ্বাসে, আমাকে টাকা কর্জ্জ দিলে। ঐ বিশ্বাসটুকু না থাকিলে তুমি আমাকে টাকা কর্জ্জ দিতে না, সুদও পাইতে না। আমি খাইতে পাইতাম না, তোমার টাকাও খাটিত না।"

তাইত, বিশ্বাসের কি মহিমা ! ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিলে ধর্ম্ম হয় না। পরোপকারে বিশ্বাস না থাকিলে মানুষ হয় না। স্ত্রীজাতিতে

* কৃষাণের এই ব্যুৎপত্তি ঠিক নহে।

বিশ্বাস না থাকিলে প্রণয় হয় না। কৃষাণে বিশ্বাস না থাকিলে কর্জ্জ দেওয়া হয় না, চাষ হয় না। বিশ্বাসে সংসার চলিতেছে। বিশ্বাসে টাকা চলিতেছে, মূলধন এক হাত হইতে আর এক হাতে যাইতেছে, অশ্রমীর হাত হইতে শ্রমীর হাতে যাইতেছে। শ্রমীর নিকট গিয়া মূলধন নূতন ধন প্রসব করিতেছে, ধরাকে শস্যময়ী হাস্যময়ী আনন্দময়ী অন্নপূর্ণা-রূপিণী করিতেছে। কিন্তু তাহাতেও সে শ্রমী কৃষাণ ভাইয়ের দুঃখ ঘুচিতেছে না, পেটে দুই বেলা অন্ন যাইতেছে না, হাঁটু তক্ কাপড় পড়িতেছে না। কেন? ভাই কৃষাণ, তুমি বৈশাখের রৌদ্রে পুড়িয়া, শ্রাবণের ধারায় ভিজিয়া, ক্ষেতে সারাদিন মেহনত করিয়া, যে প্রচুর ফসল জন্মাইলে, তাহা কে কাড়িয়া লইয়া যাইল! তুমি মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছ, তোমার স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ কাঁদিতেছে। কে তোমাদিগকে কাঁদাইয়াছে। কি? মহাজন ও জমিদার তোমার পায় সমুদয় ফসল লইয়াছে। মহাজনের সুদ, এবং জমিদারের খাজানা দিতেই ফসল সব ফুরাইল। "মহাজনকে" তোমার রক্ষক বলিয়াছিলে, এখন দেখিতেছ, যে রক্ষক সেই ভক্ষক। গরিব কৃষক এইরূপ মহাজনের হাত হইতে কিসে নিস্তার পাইতে পারে, স্বদেশপ্রেমিকগণ, একবার ভাবিয়া দেখুন। সেদিন কংগ্রেসে সভাপতি ওয়েব (Webb) সাহেব এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। কয়েক মাস হইল কংগ্রেসের মুখপাত্র (India) নামক কাগজে মান্দ্রাজে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমিনন এই বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আমি প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যাহা আসিয়াছিল, নব্যভারতে জমিদারগণের কর্ত্তব্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে এ বিষয় লিখিয়াছিলাম। Court of wards র অধীন জমীদারী গুলিতে এখন টাকা উদ্বৃত্ত হইলে গবর্ণমেণ্ট-সিকিউরিটি ক্রয় করা হয়। তাহা না করিয়া যদি ঐ টাকা হইতে শত করা ৬৲ বা ৯৲ বা ১২৲ টাকা সুদে প্রজাদিগকে কর্জ্জ দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রজারাও বাঁচে, নাবালক জমিদারও কোম্পানির কাগজের অপেক্ষা দ্বিগুণ বা তিন গুণ সুদ পান। এ বিষয়, ষ্টেটস্‌ম্যান নামক ইংরাজি সংবাদপত্রে, কর্তৃপক্ষগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবারজন্য চেষ্টা করিয়াছিলাম।

বেহারে এক বিলাতি কোম্পানি (Messrs Mylne & Co.) তাহাদিগের জগদীশপুর জমীদারিতে কিছুকাল কৃষি-ব্যাঙ্ক চালাইতেছেন। তাঁহারা বার্ষিক শতকরা ১২৲ সুদে টাকা কর্জ্জ দেন। আদায় অনাদায় উভয়ে গড় পড়তা ধরিলে তাহাদিগের শতকরা ৮৲ বা ৯৲ টাকা করিয়া লাভ হইতেছে। বাঙ্গালী জমীদারগণের মধ্যে এইরূপ কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করিবার উদ্যোগ আমরা অদ্যাপিও বড় দেখিতে পাই না। "জমীদারী পঞ্চায়ত সভা" এ বিষয় চেষ্টা করিবারই সম্ভাবনা। কিন্তু করিয়াছেন কি না, তাহা ঠিক জানি না। আমাদিগের দেশের অধিকাংশ জমীদারগণের শিক্ষা ও প্রজাসহানুভূতি যেরূপ অল্প, তাহাতে তাঁহাদিগের নিকট বড় অধিক ভরসা হয় না।

যে সকল লোক দেশের উন্নতির জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন করিতেছেন, দেশের জন্য প্রভূত শ্রম করিতেছেন, তাঁহারা এই মঙ্গল কার্য্যের সূচনা করিবেন, আমরা আশা করি। তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগের বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা যেমন রাজনীতির দিকে দৃষ্টি করিতেছেন, তেমনি একবার প্রজানীতির দিকে দৃষ্টি করুন। এমন অনেক গুলি বিষয় আছে, যাহাতে রাজার দ্বারস্থ না হইয়া,

প্রজার মধ্যে খাটিয়া আমরা দেশের মহীয়সী উন্নতি করিতে পারি। সেই গুলি আর উপেক্ষা করিলে, দেশের মঙ্গল নাই। সেই গুলি উপেক্ষা করিলে কংগ্রেস প্রভৃতির মহৎ উদ্দেশ্য কখনই সিদ্ধ হইবে না।

আমাদিগের দেশের কৃষকগণ অতিশয় গরিব। এখানে মহাজনের সুদও অতিশয় অধিক। এখানে অল্প সুদে কর্জ্জ না পাইলে কৃষক কেমন করিয়া বাঁচিবে?

কৃষকগণ অল্প সুদে কর্জ্জ পাইলে, দেখিবে, তাহাদিগের ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে, তাহাদিগের ঘরে লক্ষ্মী দেবী আসিবেন। যে যে দেশে কৃষকেরা অল্পসুদে টাকা কর্জ্জ পাইতেছে সেই সেই দেশে কৃষকগণের কেবল মাত্র দারিদ্র্য মোচন হয় নাই; অন্য সকল বিষয়েও তাহাদিগের বিস্ময়জনক উন্নতি হইয়াছে।

জর্ম্মনি, অষ্টিয়া, রুষিয়া, ইটালি দেশে গরিবদিগের সাহায্যের জন্য অনেক গ্রামে কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। কৃষকগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম সুদে টাকা কর্জ্জ পাইতেছে। শ্রীযুক্ত উলফ (Mr H. W. Wolff) দেশে দেশে গিয়া গরিবদিগের ব্যাঙ্ক বিষয় অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া তাঁহার Popular Banks নামক একখানি উৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। গত বৎসরে তিনি ওয়েষ্টমিনিষ্টার রিভিউ নামক সাময়িক পত্রে এ বিষয়ে একটী অতীব সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন, যে যে গ্রামে কৃষকদিগকে অল্প সুদে টাকা ধার দিবার জন্য ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই গ্রামের অবস্থা ব্যাঙ্কহীন গ্রামের অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছে।

"Any one acquainted with agriculture can not fail to detect at the very first glance the contrast between an Italian village which has no bank and one in which such a bank has been at work a few years. Where there is such a bank cultivation is sure to be better. Crops look cleaner and heavier. The live stock are better kept. The buildings are in better order. There is, generally speaking, less poverty, a look of greater prosperity about both people and farms; and if any visitor has time to look into the social life of the village, he will find that there is a good deal more still to distinguish a "bank" village from an ordinary one, even apart from increased economy, sobriety, thrift, and saving. The population appear more independent and better conditioned. Hence that marvellous educating power which has made priests own that the bank in their parish has done more to make good men of their parishowners than all their preaching."

সংক্ষেপে, এই গ্রাম্য কৃষিব্যাঙ্ক হওয়ায় কৃষি কার্য্যের উন্নতি হইয়াছে, ঘর বাড়ীর শ্রী হইয়াছে, দারিদ্র্য কমিয়া গিয়াছে, গ্রামের লোক স্বাবলম্বী ও সাধু হইয়াছে। গরিবদিগের এমন হিতকর গ্রাম্যকৃষিব্যাঙ্ক আমরা সংস্থাপন করিবার জন্য কি চেষ্টা করিব না? জর্ম্মনি দেশে গ্রাম্য ব্যাঙ্কগুলিতে ১৫০ ক্রোর টাকা খাটিতেছে, অষ্ট্রীয়াতে ২৫ ক্রোর; রুষিয়াতে ২ ক্রোর, ফরাসি ও ইটালী দেশে গ্রাম্য কৃষিব্যাঙ্কে অনেক টাকা খাটিতেছে। কত কৃষক ইহাতে অল্পসুদে কর্জ্জ পাইতেছে, কত স্থানে ইহাতে কত জনের অন্নের সংস্থান হইতেছে। প্রকৃত স্বদেশহিতৈষীদিগের যত্নে, দীনজন বন্ধুদিগের শ্রমে এই সকল গ্রাম্য কৃষিব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হইয়াছে। আমাদিগের দেশে কি এমন দীনবন্ধু নাই, এই বিষয়ের প্রবর্ত্তক হইতে পারেন? প্রথমে অতি ক্ষুদ্র আয়তনে কার্য্য আরম্ভ করিতে পারা যায়।

প্রথমে, একজন লোক নিজের ৫০০৲ টাকাতে ইহার কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন। তাহার পর তিনি অংশীদার লইতে পারেন। এবং এই মূলধন ক্রমে ৫০০০৲ হইতে পারে। ব্যাঙ্কের কয়েকটী নিয়ম থাকা আবশ্যক। শত

করা ১২৲ বার টাকার অধিক সুদ লওয়া হইবেনা। অংশীদারগণ শতকরা ৬৲ টাকার অধিক লাভ লইবেন না। শতকরা ৬৲ সুদের অধিক যাহা আদায় হইবে তাহা মূলধনে যোগ হইবে। যদি কখন কোন টাকা লোকসান হয়, সুদের এই উদ্বৃত্ত টাকা হইতে তাহা পূরণ করা হইবে। এই গেল কর্জ্জ দেওয়ার কথা। এখন টাকা গচ্ছিত রাখার কথা বলিতেছি। ব্যাঙ্কের এইরূপ কোন নিয়ম থাকা উচিত যে, যাঁহারা ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিবেন, তাঁহাদিগের টাকার উপর শতকরা ৬৲ বা ৫৲ করিয়া সুদ পাইবেন, এবং দুই এক মাস পূর্ব্বে সংবাদ দিলে তাঁহারা টাকা তুলিয়া লইতে পারিবেন। এই গচ্ছিত টাকা ব্যাঙ্ক শতকরা ১২৲ সুদে খাটাইবেন। যদি গড়পড়তা শতকরা ৯৲ সুদ আদায় হয়, তাহা হইলে এই গচ্ছিত টাকার উপরও ব্যাঙ্কের শতকরা ৩৲ বা ৪৲ লাভ হইতে পারে। এই লাভও অংশীদারগণ লইবেন না। মূলধনে ইহা যোগ করিবেন। কোন টাকা লোকসান হইলে, এই বৃদ্ধি টাকা হইতে তাহা পূরণ হইতে পারিবে। এইরূপ করিলে কোন অংশীদারের বা গচ্ছিতকারীর এক পয়সাও কখনও ক্ষতি হইতে পারিবে না। এই ব্যাঙ্ক সুন্দররূপে চলা আর না চলা, ব্যাঙ্কের কার্য্যাধ্যক্ষের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে। কার্য্যাধ্যক্ষ সৎ ও কার্য্যপটু হওয়া আবশ্যক। গ্রামের কোন্ কৃষকের অবস্থা কিরূপ, কাহার চরিত্র কিরূপ, এ সকল বিষয় তাঁহার বিশেষ সন্ধান রাখা আবশ্যক। কাহার নিকট কিরূপ জামিন লওয়া আবশ্যক, তিনিই তাহার সমুদয় অবস্থা জানিয়া স্থির করিবেন। গরিব কৃষকদিগের সম্পত্তি নাই বলিলেই হয়। সুতরাং সম্পত্তি বন্ধক চাহিলে গরিবদিগের ব্যাঙ্ক চলিবে না। তবে জামিন স্বরূপ দুইজন অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিসম্পন্ন ও সচ্চরিত্র কৃষকের নাম খতে লিখিয়া লইলে যথেষ্ট হইবে। যে কৃষক সচ্চরিত্র, তাহার চরিত্রই উত্তম জামিন। যে ব্যক্তি অলস, মদ্যপায়ী, জুয়াচোর, তাহাকে অবশ্য কার্য্যাধ্যক্ষ টাকা কর্জ্জ দিবেন না। কৃষক টাকা কর্জ্জ লইয়া তাহা কি বিষয়ে ব্যয় করে, তাহার প্রতি যথাসম্ভব নজর রাখাও ভাল।

কার্য্যাধ্যক্ষের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও তাহাকে পরামর্শ দিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা থকিবে, অংশীদারগণ যাহাকে যাহাকে মনোনীত করিবেন, তাঁহারাই এই সভার সভ্য হইবেন। যাহাকে যত টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে, তাহার হিসাব সকল অংশীদারের দ্রষ্টব্য থাকিবে। যাহাতে অন্ততঃ কথঞ্চিৎ সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষক টাকা বাঁচাইয়া ব্যাঙ্কে দিয়া সুদ পায়, তজ্জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্টে Savings Bank আছে বটে, কিন্তু তাহাতে ৩৲০ মাত্র সুদ পাওয়া যায়। কৃষিব্যাঙ্কে শতকরা ৬৲ করিয়া সুদ পাইলে কৃষক ঐ ব্যাঙ্কে উদ্বৃত্ত টাকা রাখিতে পারে। ইউরোপে সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষকগণ উদ্বৃত্ত টাকা কৃষিব্যাঙ্কে রাখিতেছে। তাহাতে সঙ্গতিসম্পন্ন কৃষকের টাকা নিঃস্ব কৃষকে কর্জ্জ পাইতেছে। এইরূপে, কৃষকের টাকায় কৃষকের সাহায্য হইতেছে। এই জন্য এই সকল ব্যাঙ্কের কার্য্যকে কেহ কেহ Brotherly Banking বলিয়াছেন। আমাদিগের দেশে কৃষকগণ আপাততঃ ব্যাঙ্কের অংশীদার হইতে পারিবে বা টাকা গচ্ছিত রাখিবে, আমার ততদূর ভরসা হয় না। কিন্তু ব্যাঙ্ক কিছুকাল চলিলে, কৃষকগণ ক্রমে এক দুই জন করিয়া ব্যাঙ্কে যোগ দিতে পারে। জর্ম্মনি এবং ইটালিতে গরিবদিগের জন্য যে সব ব্যাঙ্ক চলিতেছে, তাহাতে এতাবৎকাল একজন অংশীদারের বা গচ্ছিতকারীর একটী পয়সাও লোক-

সান হয় নাই। আমরাও যদি ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয় নিয়মগুলি রক্ষা করিয়া ব্যাঙ্ক স্থাপন করি,এবং ব্যাঙ্কের কার্য্য চালাই,আমাদিগের দেশেও গরিবব্যাঙ্ক বা কৃষিব্যাঙ্ক চলিতে পারে, এবং বর্ত্তমান মহাজনি প্রণালীরূপ রাক্ষসের মুখ হইতে গরিব কৃষকগণকে রক্ষা করিতে পারি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

সামাজিক পবিত্রতা।

অল্পদিন হইল ভবানীপুর সাউথ সুবারবন্ স্কুল-গৃহে সামাজিক পবিত্রতা রক্ষণ সম্বন্ধে একটী বৃহৎ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তথায় শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়লাল দত্ত যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন,তাহার সারাংশ নিম্নে লিখিত হইল :—

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, ও সুশিক্ষিত ও স্বদেশানুরাগী ভদ্র মহোদয়গণ, আমি প্রস্তাবিত আবেদন অনুমোদন জন্য বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে ভার প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সভাস্থলে আমার অপেক্ষা অধিকতর সুশিক্ষিত ও সুবিজ্ঞ অনেক লোক উপস্থিত আছেন,তাঁহাদের কাহারও প্রতি এই ভার অর্পিত হইলে উহা অধিকতর দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইত। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ বক্তাদ্বয় তেজস্বী ইংরাজী ভাষায় সারগর্ভ বক্তৃতায় আপনাদের কর্ণে এতক্ষণ অবিশ্রান্ত মধুধারা বর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয়োন্মাদক বক্তৃতার পর আমার ক্ষীণ কণ্ঠের নিস্তেজ বাঙ্গালা বক্তৃতা আপনাদের প্রীতিপ্রদ হইবে না। পক্ষান্তরে এই সভাস্থলে আমার অনেক আত্মীয় ও গুরুজন উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার শিক্ষা-গুরু—জীবনের প্রভাত সময়ে আমি তাঁহাদের চরণতলে উপবিষ্ট হইয়া বিবিধ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছি। বক্তব্য বিষয়টী এরূপ লজ্জা ও সঙ্কোচজনক যে, অনেকস্থলে আমি তাঁহাদের সম্মুখে আমার মনের ভাব পরিষ্কার রূপে প্রকাশ করিতে পারিব না। এই সমস্ত প্রতিকূল ঘটনা সত্বেও আমি সাধ্যানুসারে সভাপতি মহাশয়ের আদেশ প্রতিপালনে যত্নবান হইব।

বর্ত্তমান সভার উদ্দেশ্য আপনাদিগকে বুঝাইবার জন্য আমাকে অধিক ক্লেশ পাইতে হইবে না—যে পবিত্র উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা আজি এই স্থলে সম্মিলিত হইয়াছি, তদ্বিষয়ে সুশিক্ষিত ও সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই প্রাণগত সহানুভূতি আছে। উক্ত উদ্দেশ্য আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণ কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। আজিকার এই আন্দোলন কোন অংশেই নূতন নহে—প্রায় দুই বৎসর হইতে এই আন্দোলন কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে চলিয়া আসিতেছে। কতিপয় সহৃদয় খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক কর্ত্তৃক প্রথমতঃ এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কলিকাতার চারিদিকে অবাধে যে পাপ ও দুর্নীতির স্রোত বহিতেছে, এবং দিন দিন যে স্রোত পরিপুষ্টি লাভে খরতর বেগে ধাবিত হইতেছে, তাহা দমনপূর্ব্বক সামাজিক পবিত্রতা সংরক্ষণ জন্য তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে যত্নবান হন। কলিকাতার প্রায় প্রত্যেক রাস্তায় ভদ্র পরিবারের নিকট বিদ্যালয়, ধর্ম্ম-মন্দির, উপাসনালয় ও সাধারণের প্রকাশ্য সম্মিলন স্থল প্রভৃতি স্থানের পার্শ্বে অথবা সম্মুখে বেশ্যালয় ও অবৈধাচারী লোকদিগের আবাসজনিত সামাজিক ও পারি-

বাহ্নিক পবিত্রতা ও শান্তি বিনষ্ট হইবার ভয়ে, তাঁহারা পাপ ও দুর্নীতি দমনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সহৃদয় ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হইয়া, সামাজিক পবিত্রতা "Social purity" সমিতিনামে একটিসভা সংস্থাপন করেন। ভদ্র পল্লী, বিদ্যালয়, ও ধর্ম্ম-মন্দির প্রভৃতি স্থানের নিকট হইতে বেশ্যালয় দূরীকরণ, পাপ ব্যবসায়ের জন্য অল্প বয়স্কা বালিকার ক্রয় বিক্রয় নিবারণ ও পাপ-কার্য্যে প্রকাশ্য ভাবে আহ্বান দমন জন্য তাঁহারা বিশেষরূপে আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তাঁহাদের দল পুষ্ট হইতে লাগিল। গত বৎসর ২৭ এ নবেম্বর তারিখে কলিকাতায় টাউন হলে এই পাপ ব্যবসার ও দুর্নীতি দমন করিবার জন্য যে বিরাট সভার আয়োজন ও অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদেরই যত্নের ফল। এই মহা সভায় কলিকাতাবাসী প্রায় সকল সম্প্রদায়স্থ লোক সম্মিলিত হইয়া একবাক্যে এই কলঙ্কিত ব্যবসায়ের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইংরেজ, হিন্দু, মুসলমান ও পার্শী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সুযোগ্য প্রতিনিধিগণ সভাস্থলে জ্বলন্ত বক্তৃতায় এই পাপ ব্যবসায়ের ঘোরতর প্রতিবাদ করেন, এবং উহা হইতে সমাজের যে কি ঘোরতর অমঙ্গল সাধিত হইতেছে, তাহা সুস্পষ্ট রূপে উল্লেখ করেন।

এই সভার পর, দিন ২ উল্লিখিত আন্দোলন ঘনীভূত ও চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। অনন্তর উল্লিখিত Social Purity Committee উক্ত ঘৃণিত ব্যবসায়ের প্রতিবিধান জন্য গত ৩রা এপ্রিল তারিখে আমাদের মহামান্য লেপ্টনেন্ট্ গবর্ণর বাহাদুরের নিকট একখানি আবেদন প্রেরণ করেন। উক্ত আবেদনে তাঁহারা ইংলণ্ডের ১৮৮৫খ্রীঃ অব্দের দণ্ডবিধি আইনের ৪৮ ও ৪৯ ভিক্টোরিয়া ৬৯অধ্যায়ের বিধানানুসারে (English Criminal Law Amendment Act of 1885, 48 and 47 Victoria, Chapter 69) ১৮৬৬সালের ৪আইনের ৪৩ ধারা সংশোধন পূর্ব্বক ভদ্রপল্লী হইতে প্রকাশ্য বেশ্যালয় ও বেশ্যাবৃত্তি দমন ও উল্লিখিত ১৮৬৬সালের পুলিস আইনের ৬৬ অথবা ৬৮ ধারা সংস্করণ পূর্ব্বক প্রকাশ্য ভাবে পাপ কার্য্যে আহ্বান ও অন্যান্য ঘৃণিতকার্য্য নিবারণ জন্য বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

গত ২৮এ এপ্রিল তারিখে তাঁহারা উল্লিখিত মর্ম্মে আর এক খানি আবেদন পত্র এদেশের প্রধানতম রাজপুরুষ মহামান্য গবর্ণর জেনেরলের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই সময় কলিকাতার বিভিন্ন মিসনরি সম্প্রদায় ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ হইতে আরও কতিপয় আবেদন তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। সকলেই একবাক্যে উক্ত দুর্নীতি দমনার্থে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট উক্ত ৩রা এপ্রিল তারিখের আবেদন সম্বন্ধে কলিকাতার পুলিস কমিসনার মহাশয়ের অভিমত ও মন্তব্য অবগত হইবার জন্য তাঁহার নিকট উহা প্রেরণ করেন। পুলিশ কমিসনর সারজন্ ল্যাম্বার্ট্ সাহেব মহাশয় এই বলিয়া প্রস্তাবিত আইনের প্রতিবাদ করেন যে, উহা বিধিবদ্ধ হইলে, উহা হইতে একটি নূতন অপরাধ সৃজিত হইবে। উহা বিস্তর দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোক ও গৃহস্বামীকে আক্রমণ করিবে। তিনি তাঁহার মন্তব্যের উপসংহার ভাগে এই বলিয়া উহার প্রতিবাদ করেন—

"Until a really strong case is made out and until it is shown that the evil as it exists can not be kept in check by the present law, the Government will embark on a change, which the people do not ask for, and which they would resent as an interference with the conditions of Eastern life."

তাঁহার উক্তির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, বর্ত্তমান পুলিশ আইন দ্বারা উক্ত পাপ ও দুর্নীতি দমন করা যায় না, ইহা প্রমাণিত হইবার পূর্ব্বে গবর্ণমেন্ট উক্ত আইনের পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইলে,এমন কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে, যাহার আবশ্যকতা প্রজাবর্গ অনুভব করে না; এবং যাহা পূর্ব্বদেশীয় রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবে বলিয়া তদ্দেশীয় অধিবাসিগণ বিশেষরূপে অসন্তোষ প্রকাশ করিবে। সার জন ল্যাম্বার্টের বিবেচনায় ভারতবাসী স্বস্ব বাসগৃহের নিকট বেশ্যালয় রাখিতে ও বেশ্যাবৃত্তির প্রশ্রয় দিতে আপত্তি করে না। বেশ্যাবৃত্তিটা যেন তাহারা পাপ বলিয়াই গণনায় আনে না, বেশ্যালয় ও বেশ্যাবৃত্তি যেন তাহাদের সমাজের অঙ্গের ভূষণ! অহো লজ্জা। অহো লাঞ্ছনা!!

মহাশয়গণ, আমি জানিতে চাই, আমার স্বদেশবাসী সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এমন কোন্ ব্যক্তি আছেন, জাতীয় চরিত্রের এইরূপ কলঙ্কিত চিত্রে যাঁহার মস্তক ঘোর লজ্জা ও ঘৃণায় অবনত না হয়? আমার স্বদেশবাসী কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টিয়ান, কি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়, আমি বিনীত ভাবে আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, জাতীয় চরিত্রে এই দুরপনেয় কলঙ্কারোপ জনিত আপনাদের মুখমণ্ডল কি লজ্জা ও ঘৃণায় আরক্তিম বর্ণ ধারণ করিবে না? আপনাদের শরীরের প্রত্যেক ধমনীতে কি উষ্ণ শোণিতস্রোত প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে না? যদি আপনাদের প্রকৃত আত্মসম্মান বোধ থাকে,জাতীয় চরিত্রে যদি আপনাদের বিন্দুমাত্রও অনুরাগ থাকে,তবে আপনারা নীরব ও নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া মুক্তকণ্ঠে গভীর স্বরে উক্ত কলঙ্কের প্রতিবাদ করুন। জাতীয় চরিত্রে এরূপ দুর্গন্ধময় কলঙ্ক অপেক্ষা লজ্জা ও ঘৃণার বিষয় আর কি হইতে পারে?

পুলিশ কমিশনর সাহেব মহাশয়ের অভিমত অবলম্বনে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী অনারেবল শ্রীযুক্ত কটন্ সাহেব মহাশয় Purity Committeeর আবেদনের প্রত্যুত্তরে ৮ই জুন তারিখে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন যে,"ভারতবাসীর সামাজিক রীতিনীতির বর্ত্তমান অবস্থা অনুসারে ইংলণ্ডের দণ্ডবিধি আইনের বিধান এদেশের আইনে সন্নিবিষ্ট হইতে পারেনা"।

("......Under the existing conditions of native social life in India the provisions of the English law can not be extended to this country.")

গত২৩এ আগষ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত হিউএট্ সাহেব মহাশয়Purity Committeeর আবেদনের প্রত্যুত্তরে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও সার জন্ ল্যাম্বার্ট সাহেব মহাশয়ের অভিমত অবলম্বিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত বিধান এদেশের পক্ষে অসম্ভব, এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভারতগবর্ণমেণ্ট ডন্নিখিত মন্তব্যে প্রকাশ করিয়াছেন:—

"The Government of India decided that no change of the kind was called for on any consideration of the Criminal ... and that the adoption of the proposal on social grounds was open to objection under the present circumstances of the Indian society."

বড়ই দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, পুলিস কমিসনর মাননীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর ও ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রধানতম রাজ কর্ম্মচারী গবর্ণর জেনেরল, সকলেই ভারতবাসীর সামাজিক পদ্ধতি ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় প্রকৃত অবস্থা জানিতে চেষ্টা না করিয়া,অতি সহজে, একবাক্যে, সভ্য জগতের নিকট এই ঘোষণা

করিলেন যে, প্রস্তাবিত আইনের পরিবর্তন ভারতবাসীর সামাজিক রীতিনীতির প্রতিকূল বিধায়, উহার প্রবর্তনে ভারতবাসিগণ অসন্তুষ্ট হইবে, সুতরাং উহা বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। যে ভারতবাসী চিরদিন পবিত্রতার পক্ষপাতী, যে ভারতবাসী, কি হিন্দু কি মুসলমান, স্বীয় ধর্ম্ম নীতি হইতে সামাজিক পবিত্রতার সম্মান করিতে শিক্ষাপায়, যে ভারতবাসী মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা স্বরূপা ভারত-ললনার চরিত্র কোন রূপ কলঙ্কস্পর্শ হইতে বিমুক্ত রাখিবার জন্য দীর্ঘকাল হইতে রমণীগণের অবরোধ প্রথার পক্ষপাতী, সেই ভারতবাসীর সামাজিক রীতি নীতির প্রতি এরূপ অশ্রদ্ধা ও অসম্মান প্রদর্শন একান্ত অসঙ্গত ও অন্যায়।

আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, সুশিক্ষিত ও হিতাহিত জ্ঞান-সম্পন্ন ভারতবাসীগণের মধ্যে এমন একজনও হৃদয়বিহীন ব্যক্তি নাই, ভারতবর্ষের সামাজিক ও পারিবারিক পবিত্রতা ও শান্তি অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন মঙ্গলকর বিধান প্রবর্তন করিলে যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট চিত্তে উহার প্রতিবাদ করিবে। জননী, স্ত্রী, ভগিনী ও পুত্রকন্যা প্রভৃতিকে লইয়া পবিত্র সমাজে শান্তিময় গৃহে বাস করিতে কাহার অনিচ্ছা? কয়জন লোক সাধ করিয়া দুর্গন্ধময়, অপবিত্র, অস্বাস্থ্যকর ও পীড়াজনক স্থানে বাস করিতে ভালবাসে? আবর্জ্জনা পরিপূর্ণ মল মূত্রাদি দূষিত দুর্গন্ধময় রাস্তা অথবা পয়ঃপ্রণালীর ধারে বাস করিলে যেমন তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ সাধারণের শারীরিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া উৎকট রোগ জন্মে, তেমনই দুর্নীতি ও পাপের লীলাক্ষেত্র, অনন্ত প্রলোভনময় বেশ্যানিবাসের সন্নিকটে কোন ভদ্র পরিবার বাস করিলে, উক্ত পরিবারের পবিত্রতা ও শান্তির প্রতি আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা। মানসিক সুখশান্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ যাহাতে কণ্টক-শূন্য হয়, তৎপক্ষে দূরদর্শী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। যে প্রলোভনময় দূষিত স্থান হইতে চিত্তবিকার জন্মিবার বিশেষ সম্ভাবনা এবং যাহা হইতে দুর্ব্বল নরনারীর অধঃপতন অনিবার্য্য, সেই ঘৃণিত প্রলোভনময়স্থান ভদ্র পরিবার মাত্রেরই সযত্নে পরিত্যাগ করা উচিত।

এই কলিকাতা সহরের চারিদিকে দিন দিন দুর্নীতি ও পাপের স্রোত যেরূপ দ্রুতবেগে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, তাহার প্রতিবিধান একান্ত আবশ্যক। সমস্ত কলিকাতার মধ্যে ৫।৭ পাঁচ সাতটি প্রকাণ্ড রাস্তা ভিন্ন এমন রাস্তা নাই, যেখানে ভদ্র পরিবার, স্কুল, ধর্ম্মমন্দির ও প্রকাণ্ড সম্মিলন স্থল প্রভৃতি স্থানে বেশ্যালয় ও অবৈধাচারী লোকদিগের আবাস না আছে। অনেক স্থানে এই সকল শ্রেণীর লোকেরা এমন ভাবে সজ্জিত ও দলবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান থাকে যে, সেই সকল স্থানের নিকট দিয়া পিতা পুত্রের সহিত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠের সহিত এক সঙ্গে গমনাগমন করিতে একান্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ করেন। ভিন্ন ভিন্ন পল্লীগ্রামবাসী প্রায় দুই তিন সহস্র বালক ও অপরিণত বয়স্ক যুবক কলিকাতার স্কুল ও কলেজ সমূহে বিদ্যাভ্যাস করিয়া থাকে, এখানে তাহাদের অভিভাবক অল্পই আছেন, অনেক স্থলে তাহারা আপনারাই স্ব স্ব তত্ত্বাবধায়ক। তাহারা যে সকল স্কুল বা কলেজে পাঠ করে, সেই সকল স্কুল ও কলেজের নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান বেশ্যানিবাসে পরিপূর্ণ। প্রতিদিন বিদ্যালয়ে আসিতে ও তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে উল্লিখিত বালক ও যুবকগণ কি দেখিতে পায়? পাপ-পঙ্কের

প্রলোভন প্রতিদিন দেখিয়া দেখিয়া কয়জন পুণ্য-পথে স্থির থাকিতে পারে? কয়জন অবিকৃত চিত্তে স্ব স্ব চরিত্রের বিমলতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়? অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, এই সকল প্রলোভন প্রতিদিন তাহাদের সম্মুখে অবারিত ভাবে বিদ্যমান থাকায় অনেকের পদস্খলন হইয়াছে—তাহাদের কলঙ্কিত চরিত্রের দোষে তাহাদের ভবিষ্যজ্জীবন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে!

আমরা আজি যে বিদ্যালয়ে সম্মিলিত হইয়াছি,এই বিদ্যালয়ের অবস্থা ক্ষণকালের জন্য আপনারা চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, এখানে সুকুমারমতি বালকদিগের অধ্যয়ন কতদূর আশঙ্কার বিষয়। এই স্কুলের সম্মুখস্থ সদর রাস্তার উভয় পার্শ্বে অনেকগুলি বেশ্যালয় বিদ্যমান রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের অল্প বয়স্ক ছাত্রগণ রাস্তা দিয়া আসিবার ও যাইবার সময় কি দেখিতে পায়? কোন্ বিষয় তাহারা ভাবে? এই সকল পাপ-প্রলোভন হইতে অনেক দুর্ব্বল-চিত্ত বালকের চরিত্র কলুষিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। সাধারণ হিতকর-স্থানের নিকট হইতে এই সকল কলঙ্ক দূরীকরণ সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

কেহ কেহ মনে করেন, পুরুষের চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে দুশ্চরিত্রা বেশ্যা,সমাজের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। এই জন্য তাঁহারা সময়ে সময়ে প্রকাশ্য ভাবে পুরুষজাতিকে এই উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, "অগ্রে তোমরা ভাল হও, পরে বারাঙ্গনাদিগের চরিত্র সমালোচনা পূর্ব্বক তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য উদ্যোগী হইও। তোমাদের মন দৃঢ় হইলে কে তোমাদিগকে অসৎ পথে লইয়া যাইতে পারে? পুরুষের সঙ্গে মিলিত হইতে না পারিলে তাহারা আপনারাই পাপ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিবে, অতএব তাহাদের ভয়ে ভীত হইবার কোন কারণ নাই।" এইরূপ উপদেশ যে কতদূর সুসঙ্গত, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমার বিবেচনায় যাঁহারা এরূপ উপদেশ দান করেন, তাঁহারা অদূরদর্শী ও মানব হৃদয়-তত্ত্ব-অনভিজ্ঞ। বারাঙ্গনাদিগের প্রলোভন ও বিবিধ বিভ্রম-বিলাস অনেক সময় অন্তঃপুরবাসিনী কুসুম-শোভনা বালিকা ও সরলতাময়ী যুবতীর চিত্ত বিকার ও অধঃপতনের কারণ হইয়াছে, একথা তাঁহারা ভুলিয়া যান। পক্ষান্তরে এমন সুকৃতিশালী যুবক কতজন আছেন, যাঁহারা সহজে সমস্ত প্রলোভন জয় করিয়া স্ব স্ব চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষণে সমর্থ? মানুষ যতই জ্ঞানী ও দূরদর্শী হউন, যতই তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবল ও অন্তঃকরণ সমুন্নত হউক, তিনি দুর্ব্বল; সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পুরুষগণও অনেক সময় স্ব স্ব চিত্তের দুর্ব্বলতা বশতঃ প্রলোভনের দাসত্ব স্বীকার করেন, অধঃপতনের পথ যখন অতি সুগম, এবং একবার সে পথে ধাবিত হইলে সহজে যেমন পুণ্য-পথে প্রত্যাবর্ত্তন দুঃসাধ্য, তখন দুর্ব্বল নর-নারীর সম্মুখ হইতে প্রলোভনজনক পদার্থ দূরে রাখা কি প্রার্থনীয় নহে? প্রলোভন জয় করিতে না পারিয়া কত লোক পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে—প্রলোভনের অনিবার্য্য মোহিনী ও উন্মাদিনী শক্তিতে কত নর-নারীর সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে। পৃথিবীর নানা জাতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে এই সকল দুর্দ্দশাগ্রস্ত নর-নারীর দুর্গতির অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। আমি আপনাদিগকে আমাদিগের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবৎ হইতে এইরূপ একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব। যাঁহারা এই ধর্ম্মগ্রন্থ ধীর মনে পাঠ

করিয়াছেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহ ব্রাহ্মণকুমার বিশুদ্ধস্বভাব সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ অজামিলের উপাখ্যান ভুলিয়া যান নাই। অজামিল জনৈক গৃহাশ্রমবাসী সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণের পুত্র। ইনি শ্রুতসম্পন্ন, সুস্বভাব, সদাচার, ক্ষমাদি বিবিধ গুণে অলঙ্কৃত, শুদ্ধ ব্রতধারী, মৃদু, দান্ত, শুচি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও শাস্ত্রানুশীলনানুরাগী ছিলেন। ইনি অহঙ্কার শূন্য হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বান্তঃকরণে গুরু ও বৃদ্ধবর্গের সেবা করিতেন। একদিন এই আদর্শ-চরিত্র অজামিল পিতৃআজ্ঞায় বনে গমনপূর্ব্বক তথা হইতে ফল, পুষ্প, সমিধ ও কুশ আহরণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় তিনি সহসা তাঁহার সর্ব্বনাশের বস্তু সম্মুখে দেখিয়া একান্ত মোহিত হইলেন—তাঁহার ঘোরতর চিত্তবিকার জন্মিল, মহাগ্রন্থে উহার এইরূপ বর্ণনা আছেঃ -

"দদর্শ কামিনং কঞ্চিচ্ছূদ্রং সহ ভুজিষ্যয়া।
পীত্বা চ মধু মৈরেয়ং মদা ঘূর্ণিত নেত্রয়া॥
মত্তয়া বিশ্লথন্নীব্যা ব্যপেতং নিরপত্রপং।
ক্রীড়ন্তমনু গায়ন্তং হসন্তমনয়ান্তিকে॥
দৃষ্ট্বা তাং কামলিপ্তেন বাহুনা পরিরম্ভিতাং।
জগাম হৃচ্ছয় বশং সহসৈব বিমোহিতঃ॥

আমি এই শ্লোকের অনুবাদ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না—এই সভাস্থলে অনেক সুকুমারমতি বালকের সমাগম হইয়াছে, উহার লজ্জাজনক অনুবাদ তাঁহাদের নিতান্ত অশ্রাব্য। সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সেই নীচ জাতীয় বেশ্যার কুহকে ভুলিয়া অজামিল স্বীয় অমূল্য ধন পবিত্র চরিত্রে জলাঞ্জলি দিলেন, জ্ঞান ও ধর্ম্ম হারাইলেন, অবশেষে পিতার সমস্ত বিষয়সম্পত্তি বিনষ্ট করিয়া পথের ভিখারী হইয়া নিতান্ত হীনবেশে জীবন অতিবাহিত করিলেন।

দীর্ঘকাল চরিত্রের চারু শোভায় আত্মীয় বন্ধুগণের প্রীতিবর্দ্ধন ও ভালবাসা লাভ করিয়া, সহসা একদিন সম্মুখে দুর্জ্জয় প্রলোভনের দ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছে, এরূপ নরনারীর বিস্তর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা একান্ত অনাবশ্যক—একমাত্র অজামিলের দৃষ্টান্ত যথেষ্ট শিক্ষা ও চিন্তার বিষয়। এখনও কি বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সানুনাসিক স্বরে পুরুষদিগকে এই বলিয়া উপদেশ দিবেন—"তোমরা আপনারা ভাল হও, বারাঙ্গনাগণ সমাজের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না!"

বারবিলাসিনীদিগকে একবারে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত কর, বেশ্যাবৃত্তিটা চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়া যাউক, এমন হাস্যজনক প্রস্তাব করিতে আমরা কখনই প্রস্তুত নহি। আমরা জানি, এমন দেশ নাই, যেখানে বারাঙ্গনা ও অসতী রমণী নাই; এবং এমন সমাজ নাই, যেখানে প্রকাশ্যভাবে অথবা গোপনে বারাঙ্গনা-বৃত্তি চরিতার্থ না হয়। দেশ হইতে এই জঘন্য কলঙ্কিত বৃত্তির বিলোপসাধন একটি অভাবনীয়, অসম্ভাব্য বিষয়। সমাজের সমবেত শক্তি প্রয়োগেও যে পাপের অস্তিত্ববিলোপ দুঃসাধ্য, সেই পাপের চিহ্ন মাত্র দেশ হইতে বিলুপ্ত হউক, এরূপ অসঙ্গত বাক্যের অবতারণায় আমরা জগতের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু আমরা সাহসের সহিত এই ন্যায়ানুমোদিত প্রস্তাব ও প্রার্থনা করিতে বাধ্য যে, যখন উল্লিখিত পাপ এককালে সমাজ হইতে চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইতে পারে না, তখন সামাজিক ও পারিবারিক মঙ্গলের জন্য, উহা স্বকীয় দুর্গন্ধময় ঘোরতর মানসিক বিকারজনক কলঙ্ক রাশি লোক চক্ষুর অগোচরে গভীর অন্ধকারে লুকাইয়া

রাখুক—উহাকে উজ্জ্বল আলোকে লোক-চক্ষুর সম্মুখে উহার অনিবার্য্য মোহময় প্রলোভন রাজি বিস্তার করিবার অবসর ও সুবিধা দান করিও না। তাহা হইলে সহজেই সামাজিক ও পারিবারিক পবিত্রতা ও শান্তি সুরক্ষিত হইবে।

বালিকা ক্রয়-বিক্রয় রূপ ঘৃণিত ব্যবসায় দ্বারা সমাজের যে কি ঘোরতর অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা মনে হইলে সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। বালিকার পবিত্র জীবন লইয়া ব্যবসায়? প্রলোভন অথবা ভয়ে বাধ্য করিয়া চারুশীলা বালিকাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কলঙ্কিত পশুবৃত্তিতে নিয়োজন? এই লোমহর্ষণ ঘৃণিত পাপদমনের জন্য যথার্থই কি কোন উপায় বিহিত হইবেনা? যাহারা সংসারের কোন ছলনা, কোন প্রলোভন জানে নাই, সেই অবোধ সরল প্রকৃতি বালিকাদিগকেও তাহাদের দরিদ্র পিতামাতার নিকট হইতে শাক-মাছের ন্যায় সামান্য অর্থে ক্রয় করিয়া অশেষবিধ যন্ত্রণা দানে তাহাদিগকে কলঙ্কিত পাপব্যবসায়ে দীক্ষিত করিয়া, তাহাদের ক্লেশকর জীবনের উপার্জ্জিত অর্থে কত পাষণ্ড অনায়াসে পরম সুখে স্ব স্ব জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। সমাজ এই সকল পামরদিগের দণ্ডবিধানে অক্ষম; কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের সুসভ্য খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কি তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধানে উদাসীন থাকিবেন? প্রতিবৎসর সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে কতশত নিষ্কলঙ্ক বালিকা, ছলে, কৌশলে বা অর্থবলে সংগৃহীত হইয়া দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণের ভরণ পোষণের জন্য ভয়াবহ দুষ্কর্ম্মে নিয়োজিত হইতেছে—কত শত নয়নাভিরাম কুসুম-কোরক কালে নরকের কীট-দষ্ট হইয়া অনুতাপ, ক্ষোভ, জলন্ত মর্ম্ম বেদনা ও নিরাশার অন্ধকারে স্ব স্ব দুর্ব্বহ জীবন ভার কোন রূপে বহন করিতেছে—কে তাহাদের মরুময় জীবনে শান্তিবারি বর্ষণ করিবে? সুনীতিসম্পন্ন উদার পরদুঃখকাতর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট, এই পাশব-বৃত্তি হইতে অবলা সরলা বালিকাকে রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমান আইনের সুসংস্কৃত বিধান প্রণয়নে তুমি ভীত? অহো লজ্জা! অহো ঘৃণা!! যে পুণ্য-পুঞ্জময় প্রভূত পরাক্রমশালী জাতি, জগতের বিশাল বক্ষ হইতে চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত দাস ব্যবসায়ের উচ্ছেদসাধন জন্য এক সময় অকাতরে কোটী কোটী মুদ্রা ব্যয় ও প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রমে সমগ্র সভ্য জগতের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, সেই মহৎ জাতীর সুসন্তানগণ, যাঁহাদের হস্তে এই বিশাল ভারতের শাসনদণ্ড শোভা পাইতেছে—যাঁহারা কোটী কোটী নিস্তেজ, দুর্ব্বল ভারতবাসীর অদৃষ্ট-বিধাতা স্বরূপে ভারতক্ষেত্রে বিরাজিত রহিয়াছেন, সেই অতুল ক্ষমতাশালী মহাত্মাগণ কি সৃষ্টির সার নারীজাতির এই মর্ম্মভেদী দুর্গতি দমনের জন্য বর্ত্তমান আইনের সামান্য রূপ পরিবর্ত্তন সাধনে সাহসী হইবেন না? সুসভ্য খ্রীষ্টান গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সদনুষ্ঠানের প্রতি এরূপ উপেক্ষার পরিচয় পাইলে আমাদের হৃদয় গভীর বিষাদে পরিপূর্ণ হয়।

কেহ কেহ মনে করেন যখন গবর্ণমেণ্ট Age of Consent Bill বিধিবদ্ধ করেন, তখন সমগ্র ভারতবর্ষে যে তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল, তদ্দর্শনে গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইয়াছেন। আবার যদি সেই রূপ ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং প্রজাবর্গ অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করে, এই ভয়ে গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত আইন প্রবর্ত্তন করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের এরূপ ধারণা নিতান্ত অমূলক। Age of Consent Bill ও বর্ত্তমান আইনের প্রস্তাবিত সংশোধন ও

পরিবর্তন, দুইটী বিভিন্ন প্রকৃতির বিষয়। একটি চির প্রচলিত সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি কঠোর হস্ত ক্ষেপ করিতে প্রয়াসী ভাবিয়া, সমাজের সমবেত শক্তি, তাহার বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল, অপরটি সমাজের কোন প্রথা বা রীতি নীতির প্রতি হস্ত ক্ষেপ করিবেনা ; অথচ পাপ ও দুর্নীতি হইতে সমাজকে অক্ষুন্নভাবে রক্ষা করিবে, এই ভাবিয়া, সমাজের সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই, কোন বিশেষ পাপ দমনের জন্য, বর্তমান আইনের পরিবর্তন প্রয়াসী। (Age of Consent Bill) যখন ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইয়াছিল, তখন সমাজের অনেক প্রধান প্রধান চিন্তাশীল ব্যক্তি এই ভয়ে ভীত হইয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে যাইতেছেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, এদেশের সমাজসংস্কার এদেশের অধিবাসিগণ কর্তৃক বিহিত হওয়াই প্রার্থনীয় ; বিদেশীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী এবং দেশীয় আচার ব্যবহারানভিজ্ঞ রাজপুরুষগণ কর্তৃক কোন সংস্কার সাধিত হইলে তাহা জনসাধারণের প্রীতিপ্রদ হইবে না। পক্ষান্তরে অনেক স্থলে তাহা অশান্তি ও অত্যাচারের কারণ হইবে। এই ধারণা হইতেই সমস্ত দেশ মধ্যে উহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উত্থিত হইয়াছিল। প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে কাহারও সেরূপ কোন ভয়ের কারণ নাই ; সুতরাং উহার বিরুদ্ধে কোন সামাজিক আন্দোলন উপস্থিত হইবারও সম্ভাবনা নাই।

কেহ কেহ মনে করেন, আমাদের দেশীয় অনেক ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি এই আন্দোলনের বিপক্ষাচরণ করিবেন, তাঁহাদের নিজ নিজ স্বার্থ তাঁহাদিগকে উক্ত কার্য্যে উৎসাহিত ও নিয়োজিত করিবে। তাঁহাদের অনেকগুলি বাড়ী সহরের মধ্যে বেশ্যাগণের নিকট ভাড়া দেওয়া রহিয়াছে, অথবা এরূপ ব্যক্তির নিকট ভাড়া দেওয়া আছে, যাহারা তাহা পাপ ও দুষ্ক্রিয়ার জন্য সর্ব্বক্ষণ উন্মুক্ত রাখিয়াছে। উল্লিখিত গৃহস্বামিগণ ঐ সকল গৃহ হইতে মাসে মাসে বিস্তর টাকা ভাড়া পান। এই পাপব্যবসায় ও দুষ্কার্য্য নিবারিত হইলে তাঁহাদের বিশেষ ক্ষতি হইবে, সুতরাং তাঁহারা বর্তমান আন্দোলনের প্রতিবাদ করিবেন। তাঁহাদের অনুমান কিয়ৎপরিমাণে সত্য হইলেও, আমি কখনই ইহা বিশ্বাস করিতে পারিনা যে, উল্লিখিত গৃহস্বামিগণ স্ব স্ব স্নেহাস্পদ পুত্রকন্যা ও সমাজের কল্যাণের প্রতি মমতাবিহীন হইয়া নিলর্জ্জভাবে উক্ত আন্দোলনের প্রতিকূলাচরণ করিবেন। কয়দিনের জন্য এই সংসার, কয়দিনের জন্য এই সংসারের ঐশ্বর্য্য ও সম্পদের গৌরব ? অল্পদিন পরেই আমাদিগকে এই পৃথিবী হইতে চিরবিদায় লইতে হইবে। যখন অল্পদিনের জন্যই এই পৃথিবীর সহিত আমাদের সম্বন্ধ, তখন মৃত্যুর সময় এই সংসার হইতে বিদায় লইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ঐশ্বর্য্যশালী পিতামাতা স্ব স্ব প্রাণারাম পুত্রকন্যাগণকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়া অনন্ত প্রলোভনময় পাপ ও দুর্নীতপূর্ণ স্থানে রাখিয়া যাইবার পরিবর্ত্তে পরিমার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ সমাজে তাহাদিগকে নিরাপদে রাখিয়া বিপুল ধনসম্পত্তির সহিত তাহাদিগকে চরিত্রের বিমলতা ও সুনীতির প্রতি অনুরাগ উইল করিয়া যাইতে পারিলে কি তাঁহারা আপনাদিগকে যথার্থ সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিবেন না ? এইরূপ মহৎ ও পবিত্র কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রত্যেক সন্তান-হিতৈষী পিতা স্বীয় পুত্রকন্যার প্রতি

তাঁহার প্রকৃত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবেন। কত ঐশ্বর্য্যশালী যুবক প্রলোভন ও কুসংসর্গে পতিত হইয়া পিতা-মাতার বিপুল সম্পত্তি বিনষ্ট করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছে। তাহাদের দুর্দশা দেখিয়াও কি ধনশালী পিতামাতা সাবধান হইবেন না? যে সমাজে পবিত্রতা ও সুনীতির বাতাস বহিতে থাকে, সেখানে লোকে জন সাধারণের মতকে অবজ্ঞা করিয়া প্রকাশ্যভাবে অবৈধাচরণে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হয় না; সেইরূপ স্থান ভদ্র পরিবারের বাসের উপযুক্ত। পক্ষান্তরে যেখানে দুষ্কর্মপরায়ণ নরনারী সাধারণের মতকে তৃণবৎ অবজ্ঞা করিয়া শতবিধ পাশবিক আচার ব্যবহারে সমাজের মুখ দুর্গন্ধময় কলঙ্কে সমাচ্ছন্ন ও পারিবারিক পবিত্রতা ও সুখশান্তি চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত করিতে প্রয়াসী, সেই ঘৃণিত স্থান ভদ্র পরিবারের অবাস ভূমি না হইয়া ভূত প্রেতদিগের ক্রীড়াভূমি হইবে. প্রকৃত হৃদয়বান মনুষ্য সেই অপবিত্র স্থানকে একান্ত ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিবে।

মহাশয়গণ, যখন এই সভার আয়োজন হয়, তখন অনেক গুলি সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী লোক এই বলিয়া নিরাশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, "সভার উদ্দেশ্য সুমহৎ হইলেও উহার সমস্ত অনুষ্ঠান বিফল হইবে—সভার সমস্ত প্রার্থনা ন্যায্য হইলেও উহা অরণ্যে রোদনের ন্যায় শূন্যে বিলীন হইবে। কে তাহাতে কর্ণপাত করিবে? আমাদের প্রবল ক্ষমতাশালী গবর্ণমেন্ট যেমন অনেক সময় আমাদের অনেক ন্যায়ানুমোদিত সকাতর প্রার্থনায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, এই সভার ন্যায্য প্রার্থনাতেও সেইরূপ অনাস্থা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করিবেন।" আমি বুঝিতে পারিনা, তাঁহাদের নিরাশার প্রকৃত কারণ আছে কিনা। আমি একথা কখনই বিশ্বাস করিতে পারিনা যে, আমাদের সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট দুর্নীতি ও পাপ দমন পূর্ব্বক প্রজাবর্গের কল্যাণ সাধনে উদাসীন থাকিবেন। সে দিন ব্রহ্মদেশের প্রধান কমিসনর ন্যায়পরায়ণ ও সুনীতির সম্মানকারী স্যার আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জি সাহেব মহোদয়ের পবিত্রতার প্রতি অনুরাগ ও সৎসাহসের পরিচয় পাইয়া আমরা যারপরনাই পুলকিত হইয়াছি। দীর্ঘকাল হইতে ব্রহ্মদেশবাসী অনেক গুলি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও ব্যবসায়ী ইংরেজের চরিত্র কলুষিত হইয়াছে। তাহারা তদ্দেশীয় রমণীগণের সহিত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ভাবে পাপে লিপ্ত হইয়া ইংরেজচরিত্রে গভীর কলঙ্ক নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছিল। একজন রমণীকে ছাড়িয়া অপরের প্রতি আসক্ত হইয়া, তাহাদের সংসর্গজাত পুত্রকন্যাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়া, ইতিপূর্ব্বে কত উচ্চপদস্থ ইংরেজ নির্ভয়ে স্বদেশে বা স্থানান্তরে গমন করিয়াছে। এই সকল কর্মচারীর দুর্নীতি ও দুরাচার হইতে অনেক স্থলে রাজকার্য্যে কতই বিঘ্ন ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইত। ইতিপূর্ব্বে আর কোন প্রবল ক্ষমতাশালী শাসনকর্ত্তা এ সকল দুর্বৃত্ত কর্মচারীদিগকে শাসন পূর্ব্বক সৎপথে আনিতে যত্নবান হন নাই। স্যার আলেকজাণ্ডার বাহাদুর ব্রহ্মদেশের বর্ত্তমান দূষিতচরিত্র রাজপুরুষদিগের কলঙ্ক আর সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি প্রথমতঃ তাহাদিগকে গোপনে সতর্ক হইতে বলেন, তাহাতেও তাহারা সাবধান হইল না দেখিয়া সংপ্রতি তিনি প্রকাশ্য সভাস্থলে তাহাদিগকে বিশেষরূপে ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি মুক্তকণ্ঠে ঐ সকল দুরাচারী লোকদিগকে জানাইয়াছেন যে,

তাহাদের সহিত আচরণে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনিষ্ট জন্মিতেছে, অতএব উহা দমন করা একান্ত আবশ্যক। যে মগ রমণীর সহিত বাস করে, সে ইংরেজকুলের কলঙ্ক স্বরূপ—সে আর ইংরেজ নামে পরিচিত হইবার উপযুক্ত নয়—সে এ দেশে কোন সদনুষ্ঠানের অনুপযুক্ত। ইংরেজশাসনপ্রণালী যে কেবল বিশুদ্ধ হইবে, তাহা নহে, ব্রহ্মদেশবাসিগণ যেন বুঝিতে পারে যে, ইংরেজশাসনপ্রণালী সর্ব্বথা নিষ্কলঙ্ক। রাজকর্ম্মচারিগণ তদ্দেশীয় রমণীগণের সহিত অবৈধ সংসর্গ করিলে, তদ্দেশ-শাসন কখনই কলঙ্কপরিশূন্য হইতে পারে না। তিনি ঐরূপ কর্ম্মচারীকে দেশের কলঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের ভয়ের কারণ জ্ঞান করেন। তিনি তাহাদিগকে এই বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তিনি কাহারও গুপ্ত চরিত্র অন্বেষণ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু যে সকল কর্ম্মচারী দুশ্চরিত্র বলিয়া পরিচিত, তিনি কখনও তাহাদের পদোন্নতি বিধান করিবেন না এবং নানারূপে তাহাদিগকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করিতে যত্নবান হইবেন। আশা করি, স্যার আলেকজ্যাণ্ডারের এই কঠোর দণ্ডাজ্ঞা হইতে ব্রহ্মদেশে শুভ ফল উৎপন্ন হইবে।

আমাদের দেশের শাসনকর্ত্তৃগণ স্যার আলেকজ্যাণ্ডারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্ব্বক এদেশের পাপাসক্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি ঐরূপ শাসন ভয় প্রদর্শন করিলে, বর্ত্তমান দুর্নীতির স্রোত অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। শুনিতে পাই, এদেশের অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ভাবে দুর্নীতি ও দুষ্কার্য্যের প্রশ্রয়দান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের চরিত্র সুসংযত নহে; আমাদের ন্যায়বান, সুনীতির উপাসক লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর তাঁহাদিগের প্রতি সাহস পূর্ব্বক কোন রূপ ভয় প্রদর্শন করিলে বর্ত্তমান দুর্নীতির প্রতি অনেকের নিরুৎসাহ ও অনাস্থা জন্মিবে; সুতরাং পাপের স্রোত আপনা হইতেই সঙ্কুচিত ও মন্দীভূত হইবে। প্রজার হিতের জন্য উদার শাসন প্রণালীর প্রয়োজন। প্রজার মঙ্গলেই গবর্ণমেণ্টের মঙ্গল; প্রজার সুখশান্তি ও তৃপ্তিতেই ন্যায়ানুরাগী গবর্ণমেণ্টের সুখ-শান্তি ও সম্পদ নির্ভর করে। আমাদের বর্ত্তমান মাননীয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর মহাশয় কি লক্ষ লক্ষ প্রজার কল্যাণের জন্য আমাদের এই ন্যায়ানুমোদিত প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন না? আমাদের আবেদন কি সত্য সত্যই নিষ্ফল হইবে? একথা ভাবিতেও অত্যন্ত কষ্ট হয়!

মহাশয়গণ, আজিকার এই সভাস্থলে আপনারা ঈশ্বরের নাম স্মরণপূর্ব্বক পাপকার্য্যার্থে বালিকা বিক্রয় রূপ জঘন্য ব্যবসায়ের অস্তিত্ব লোপ ও ভদ্রপরিবার ও সাধারণ হিতকর স্থানের নিকট হইতে বেশ্যালয় দূর করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন। যাহাতে কলিকাতার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এইরূপ অনেকগুলি মহাসভার আয়োজন হয়, তজ্জন্য আপনারা সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নবান হউন। কলিকাতা মহানগরীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান এই আন্দোলনে উত্তেজিত হউক। একদিনে সহজে এই গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান একান্ত অসম্ভব, দশ দিনেও উহার কিছুই হইবে না; পক্ষান্তরে দশমাস কাল নিয়ত যত্ন ও পরিশ্রম করিলেও যদি উহার প্রতিবিধান না হয়, তথাপি যেন আমাদের অধ্যবসায় শিথিল না হয়। আবশ্যক হইলে দশ বৎসরেও যেন আমাদের উৎসাহ ও উদ্যমনির্ব্বাপিত না হয়। যতদিন আমাদের

উদ্দেশ্য সংসাধিত না হইবে, ততদিন যেন আমরা আমাদের সমবেত শক্তি প্রয়োগে এই আন্দোলন ঘনীভূত করিতে সাধ্যানুসারে যত্নবান হই। দিন দিন এই আন্দোলন স্রোত চতুর্দ্দিকে খরতরবেগে প্রবাহিত হউক। ক্ষীণ জলস্রোত যেমন অনিশ্চিত পর্ব্বত-গুহা হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রথমতঃ অতি ধীরে, অতি নিস্তেজভাবে অগ্রসর হইতে থাকে, ক্রমশঃ যতই দূরবর্ত্তী হয়, ততই তাহার কলেবর পরিপুষ্ট ও শত শাখায় বিভক্ত হইয়া উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার পূর্ব্বক গ্রাম, নদী, বন, উপবন প্রভৃতি স্থান প্লাবিত করিয়া ভীম গর্জ্জনে দ্রুতবেগে সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, এবং তখন যেমন কেহই তাহার গতিরোধ করিতে পারে না, তেমনই বর্ত্তমান আন্দোলন, যাহা প্রথমতঃ কতিপয় শান্তপ্রকৃতি সদাশয় মিসনরীগণের যত্নে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, টাউন হলের মহাসভার পর দিন দিন যাহার অঙ্গ পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে, যতই দিন যাইতেছে, ততই যাহার তেজ ঘনীভূত হইতেছে, ক্রমে যখন দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ও ক্ষমতাশালী লোক উহাতে যোগদান করিবেন, তখন কোন বিঘ্ন বাধা উহার গতিরোধ করিতে পারিবে না—তখন এদেশের গবর্ণমেণ্ট আমাদের ন্যায্য প্রার্থনায় আর উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে সাহসী হইবেন না। সেই জন্য আমি বিনীতভাবে বলিতেছি যে, যদি আমাদের বর্ত্তমান আবেদন বিফল হয়, তাহা হইলে আমরা যেন হতাশ না হইয়া এইরূপ আর দশটি আবেদন প্রেরণ করিতে প্রস্তুত হই। অবিচলিত অধ্যবসায়-পূর্ণ কঠোর সাধনায় জগতের কোন্ বস্তু সুসিদ্ধ না হয়? বঙ্গদেশের পরলোকগত সুকবি দীনবন্ধু মিত্র অতি সুললিত কথায় একটি মহান্ শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেনঃ—

"যে মাটিতে পড়ে লোক উঠে তাই ধ'রে,
বারেক হতাশ হ'য়ে কে কোথায় মরে?
তুফানে পতিত কিন্তু ছাড়িব না হাল,
আজিকে বিফল হ'ল হ'তে পারে কাল।"

আমাদের উদ্যম আজিকে বিফল হইলেও, কালি হয় ত উহা সফল হইতে পারে, এই বিশ্বাস-প্রণোদিত হইয়া যেন আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমরা যদি সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নবান হই, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ আমাদের সমাজ পাপ ও কলঙ্ক স্পর্শ হইতে সহজে বিমুক্ত হইবে। সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হইতে হইবে, স্ব স্ব চরিত্রে বিমলতা প্রদর্শনে সাধারণের বিশ্বাস উৎপাদন ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে হইবে—কোনরূপ দুর্নীতি জনক কার্য্য যেন আমাদের দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় না পায়। যখন আমাদের দল দিন দিন পরিপুষ্টি লাভ করিবে, —যখন সমাজের চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র লোক স্ব স্ব বিশুদ্ধ চরিত্রের চারুশোভায় প্রতিবাসিগণকে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তখন দুর্নীতি ও পাপকার্য্যের প্রশ্রয়দাতা বিস্তর লোক তাঁহাদের প্রদর্শিত উজ্জ্বল আদর্শে স্ব স্ব চরিত্র সংগঠনে যত্নবান হইবেন। তখন উল্লিখিত ঘৃণিত পাপ ব্যবসায় ভদ্র সমাজের নিকট হইতে দূরে রাখিতে অধিক ক্লেশ পাইতে হইবে না। তখন যদি আমরা সামাজিক শাসনে উক্ত পাপ দমন করিতে সক্ষম না হই, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের সকাতর প্রার্থনা বিনীতভাবে জানাইলে তাহা উপেক্ষিত হইবে না। ইতিপূর্ব্বে অনেকবার আমাদের প্রবল ক্ষমতাশালী গবর্ণমেণ্ট এদেশবাসিগণের অনেক ন্যায্য প্রার্থনায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। কোন কোন উচ্চপদস্থ সুবিজ্ঞ লোকের মনে এই বিশ্বাস আজিও প্রবলরূপে বিদ্যমান আছে

যে, Age of consent Bill বিধিবদ্ধ হইবার সময় দেশের নানা স্থানে বিস্তর লোক উচ্ছৃ-ঙ্খল ও দুর্ব্বিনীত ভাবে আন্দোলন ও গবর্ণ-মেণ্টের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এজন্য এদেশের বিপুল বলশালী গবর্ণমেণ্ট স্বীয় বল বিক্রমের পরিচয় দিবার জন্য জিদ করিয়া উক্ত আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। উহাকে পরিবর্দ্ধিত ও সুসংস্কৃত আকারে বিধি-বদ্ধ করিলে পাছে লোকে মনে করিত যে, গবর্ণমেণ্ট জন-সাধারণের ভয়ে ভীত হইয়া উক্তরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এই আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্ট কাহারও প্রার্থনা ও পরামর্শে কর্ণ-পাত করেন নাই। এ কথা সত্য কি মিথ্যা, তাহা বিচার করিবার এ সময় নয়। আমাদের বর্ত্তমান আন্দোলন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ন্যায়ানু-মোদিত। দেশের চতুর্দ্দিক হইতে যখন সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক ধীরভাবে, বিনয় সহকারে, ব্যথিত অন্তরে সকাতর প্রার্থনা সুস্পষ্টরূপে গবর্ণমেণ্টের নিকট জানাইবেন, তখন আমাদের প্রবল শক্তিশালী শাসনকর্ত্তা-গণ তাঁহাদের ধর্ম্মানুমোদিত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। বঙ্গদেশের একজন সুবিজ্ঞ দার্শনিক কবি সুললিত কবিতায় একটি মহাসত্য প্রচার করিয়াছেন। সেই সুন্দর কবিতাটি এই—

> "অশ্বতেজে ভরা, মৃত্যু হস্তে মরা,
> চারুতার কাছে আর দর্প খাটে কার।"

হৃদয়ের চারুতার সহিত যে সকাতর ন্যায্য প্রার্থনা এদেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহা-দের মহাতেজী শাসনকর্ত্তৃগণের নিকট উপ-স্থাপিত করিবেন, খ্রীষ্টধর্ম্মের উপাসক রাজ-পুরুষগণ দর্পের সহিত কখনই তাহা অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইবেন না।

আমাদের বর্ত্তমান লেফ্‌টনেণ্ট গবর্ণর মাননীয় সার চার্লস ইলিয়ট্‌ একজন সুনীতি ও পবিত্রতার সম্মানকারী সুবিজ্ঞ রাজপুরুষ। তিনি দেশীয় বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক ও ছাত্রগণের সুনীতির একান্ত অনুরাগী। দেশীয় যুবকগণের চরিত্র সংশোধন ও নৈতিক উন্নতি বিধান জন্য কলিকাতায় "Society for the higher training of young men" নামক যে একটি সভা কয়েক বৎসর হইল সংস্থাপিত হইয়াছে, তিনি তাহার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক বন্ধু। দেশীয় লোকের সুনীতি ও সচ্চরিত্রের প্রতি যাঁহার এরূপ আন্তরিক যত্ন ও অনুরাগ, তিনি বঙ্গদেশের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকিতে যদি বঙ্গ-দেশের সামাজিক পবিত্রতা ও পারিবারিক শান্তি সুরক্ষিত না হয়, তাহা হইলে আমা-দের দুঃখ ও ক্ষোভের সীমা থাকিবে না। আশা করি বর্ত্তমান আন্দোলনের প্রতি তাঁহার প্রসন্নদৃষ্টি নিপতিত হইবে। তাঁহার যত্নে ও অনুগ্রহে আমাদের ন্যায়ানুমোদিত প্রার্থনা সফল হইবে।

মহাশয়গণ, ইতিমধ্যেই আমি আপনা-দের অনেক সময় অধিকার করিয়াছি, আর আমার নূতন বক্তব্য কিছুই নাই। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণ অতি দক্ষতার সহিত যে প্রস্তাবের অবতারণা ও অনুমোদন করিয়া-ছেন, আমিও সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার পোষ-কতা করিতেছি। *

---

* সামাজিক পবিত্রতা বিষয়ক আন্দোলনে আমা-দের গভীর সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য এই প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইল। আশা করি, এই বিষয় লইয়া সহযোগী সম্পাদকগণ বিশেষ আন্দোলন করিবেন। ন, স।

শ্রীকৃষ্ণ-যাত্রা।

দেশ হইতে অনেক উপাদেয় পদার্থ অন্তর্হিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-যাত্রা একটি। পূর্ব্বে এই সংস্কার ছিল যে, "কানু ছাড়া গীতই নয়।" অর্থাৎ যে গানে কৃষ্ণ নাম নাই, সে গানই নয়। প্রকৃতই তাই। ভগবানের একটী সর্ব্ব উচ্চ আশীর্ব্বাদ সংগীত। বস্তুতঃ সংগীত ভগবানের নিজস্ব ধন। একটি কথা দ্বারাই ইহা প্রমাণিত হইবে। শ্রীভগবান্ ভক্তগণকে লইয়া নানারূপ লীলা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লীলা কি? অবশ্য রাসলীলা। এই রাসলীলার সময় তিনি কি করিয়াছিলেন? তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে লইয়া শাস্ত্রালাপ কি তত্ত্ব কথা বিচার করিয়াছিলেন না। সরলা ও কামগন্ধহীন গোপিকাদের সহিত নৃত্য গীত করিয়া মহাভাবে বিভাবিত হইয়াছিলেন। সুতরাং যাঁহাদের কস্মিন্ কালে শ্রীভগবানের উচ্চতম লীলা দর্শন করিবার অভিলাষ থাকে, তাঁহাদের শুদ্ধ তত্ত্বকথা ও শাস্ত্র বিচার শিখিলে হইবে না, তাঁহাদের সংগীত-লম্পট হইতে হইবে। কারণ রাসমণ্ডলীতে নৃত্যগীত বই আর কিছুই ছিল না।

রাসলীলা অনেক দূরের কথা। বিশেষ চিহ্নিত ভক্ত ভিন্ন ভগবানের সে লীলা দর্শন করিবার কাহারও অধিকার নাই। কিন্তু সাধারণতঃ শ্রীভগবানের ভজনা সম্বন্ধে সংগীত কিরূপ উপকারী তাহা দেখুন। অধিকাংশ লোকেই শ্রীভগবান্‌কে পুষ্পদিয়া পূজা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ফুলের ন্যায় সুন্দর পদার্থ জগতে আর দেখা যায় না। শ্রীভগবান্ স্বয়ং কিরূপ সুন্দর, তাহা কুসুম কাননে প্রবেশ করিলেই বুঝা যায়। সুতরাং যখন সুগন্ধময় বেল কি বাতাবীলেবুর ফুল শ্রীভগবানের পাদপদ্মে কোন ভক্ত অর্পণ করেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে যে আনন্দ উদয় হয়, তাহা পরিমাণ করা যায় না। কিন্তু সংগীত দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে পূজা করা, ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। অতি সহজ উপায়ে এই শ্রেষ্ঠত্ব পরীক্ষিত হইবে। কোন ভক্ত একটী অতি মনোহর কুসুম হস্তে করিয়া "হরি হরয়ে নমো, কৃষ্ণ যাদবায় নমো" বলিয়া শ্রীভগবানের চরণে উহা অর্পণ করিলে, অবশ্য বিপুল আনন্দ ভোগ করিবেন। কিন্তু ভক্ত আবার "হরি হরয়ে নমো ইত্যাদি" কথা গুলি লইয়া যদি একটী সংগীতের মালা রচনা করেন, এবং উহা শ্রীভগবানের গলায় পরাইয়া দেন, তাহা হইলে তিনি যে আনন্দ ভোগ করিবেন, তাহা পূর্ব্ব আনন্দ অপেক্ষা ঢের বেশী।

সকলের সুকণ্ঠ হয়না, অনেকের সংগীত শিক্ষা করার ক্ষমতা নাই। ইহাতে কিছু আসে যায় না। সংগীত শুনিয়া হৃদয় দ্রবীভূত হয়, শুদ্ধ এই অধিকার টুকু হইলেই যথেষ্ট। যাহার এই টুকু আছে, তিনিই কোন না কোন কালে, শ্রীভগবানের চরণআশ্রয় করিয়া তাহার রাসলীলা আস্বাদ করিতে পারিবেন। কিন্তু যাঁহার এই বৃত্তি প্রস্ফুটিত হয় নাই— তাহার কাছে কোকিলের ধ্বনি আর কাকের কোকুলি সমান—তিনি পরম ভক্ত হইলেও, রাসলীলা দর্শন ও শ্রবণ তাঁহার ভাগ্যে নাই,

নিগূঢ় কথা এই। শ্রীভগবান্‌কে হৃদয় দ্বারাই পূজা করিতে হইবে, জড়দেহ দ্বারা নয়। হৃদয় যদি জড়দেহের মত কঠিন রহিল,

তাহা হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার অর্চ্চনাই হইল না। সুতরাং যিনি কোমল হৃদয়ে শ্রীভগবান্‌কে পূজা করিতে পারেন,তাঁহার ভজনাই প্রকৃত পক্ষে সফলজনক। কিন্তু হৃদয়কে দ্রব করিবার ঔষধ যেরূপ সংগীত,এরূপ আর কিছুই নয়। অবশ্য শুদ্ধ ভগবানের নাম কি তাঁহার লীলা স্মরণ করিলেও হৃদয় বিগলিত হওয়া উচিত। কিন্তু এই নাম কি লীলাগুলি যদি সুস্বরে সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে হৃদয় পাষাণের মত হইলেও দ্রবীভূত হইবার সম্ভাবনা। এমন কি, কখন কখন নাম কি লীলাগুণ শ্রবণে হৃদয় স্পর্শ করিবে না, কিন্তু শুদ্ধ একটী সুস্বর শুনিবামাত্র,হৃদয় তরলিত হইবে, ক্রমে উথলিয়া উঠিবে, এবং ননীর মত কোমল হইয়া যাইবে। সুতরাং পাষাণ হৃদয়, কোমল করিবার অমোঘ অস্ত্র যেরূপ সংগীত, এরূপ আর কিছুই নয়।

জীবের, সঙ্গীতের ন্যায় আশীর্ব্বাদ,কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, দেখা যাউক। প্রথম, সঙ্গীত শ্রবণ দ্বারা হৃদয়টী কাদার মত নরম করিয়া লউন। শেষে সেই বিগলিত হৃদয়ের উপর শ্রীভগবানের লীলার ছবিগুলি অঙ্কিত করুন। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা আরো পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। "হরি বলে আমার গৌর নাচে," এই গীতটি সম্মুখে রাখুন। মুখে বলিতেছেন,"হরি ব'লে আমার গৌর নাচে," কিন্তু হৃদয় পাষাণের মত কঠিন, বাক্যগুলি অন্তর্হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। এরূপ অবস্থায় "হরি ব'লে আমার গৌর নাচে," ইহার একটী উপযোগী সুর দিয়া গাহিতে থাকুন, কি কাহারও দ্বারা গাওয়াইয়া শুনুন। খুব সম্ভবতঃ গীতাকারে পদটী শুনিবামাত্র হৃদয় কোমল হইবে, আর হৃদয়ের উপরস্থ কঠিন আবরণটী খসিয়া পড়িবে। অমনি অন্তর্হৃদয়ে "হরি ব'লে আমার গৌর নাচে" কথাগুলি প্রবেশ করিবে, আর সেগুলির ছাঁচ বসিয়া যাইবে। তখন অন্তর্জগতে একটী অপূর্ব্ব ছবি দেদীপ্যমানরূপে দর্শন করিতে থাকিবেন। সে ছবিটি কি,—না, শ্রীগৌরাঙ্গ মধুর স্বরে হরি বলিতেছেন, আর নৃত্য করিতেছেন; তাঁহার কমল-নয়নে শত শত প্রেমধারা বহিতেছে; উর্দ্ধমুখ হইয়া তিনি বারম্বার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতেছেন, আর আনন্দে সঙ্গীদের কোলে গলিয়া গলিয়া পড়িতেছেন। এইরূপে হৃদয় ভাবময় হইয়া উঠিবে; তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিতে থাকিবে; ক্রমে ক্রমে এরূপ বিভোর হইয়া যাইবেন যে, যেন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকৃতই আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া,—আর তিনি যেন প্রকৃতই নয়ন-বাণ হানিতেছেন।

সঙ্গীতের দ্বারা এইরূপে কৃষ্ণ ও গৌর-লীলা সংক্রান্ত ঘটনাগুলি হৃদয়ে জীবন্ত করা যাইতে পারে। এই জন্যেই সে কালে গৌর-সন্ন্যাস যাত্রা শুনিয়া অনেকে "বাউরী" হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, আর সংসারে প্রবেশ করিতেন না। এই জন্যই লোকে সেকালে কৃষ্ণযাত্রা শুনিয়া সংজ্ঞা শূন্য হইয়া যাইতেন।

উপরে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে "কানু ছাড়া গীতই নয়," অর্থাৎ যে গানগুলির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কি শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা ও গুণ বর্ণিত না হয়, সে সমস্ত গানই বৃথা। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অবতারের মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারই উচ্চতম। সুতরাং যখন ভগবানকে আস্বাদ করিবার সর্ব্বপ্রধান উপায় সঙ্গীত,তখন তাঁহার সর্ব্বপ্রধান দু'টি অবতারের ঘটনাগুলি লইয়াই গান করা কর্ত্তব্য।

এই নিমিত্ত পূর্ব্বে প্রায়ই কৃষ্ণ কি গৌর-যাত্রা ভিন্ন অন্য কোন যাত্রা ছিল না। মাল,

মাথুর, অক্রুর সংবাদ, প্রভাস, গৌর-সন্ন্যাস, প্রধানতঃ এই পালা গুলিই গীত হইত। বছরের প্রতি পার্ব্বণে লোকে এই যাত্রাগুলি উপর্য্যুপরি শুনিত, তবু যখনই শুনিত, তখনই উহা নূতন বলিয়া বোধ হইত, এবং তখনই মোহিত হইত। গানগুলিতে যেন কোন মাদক দ্রব্য মিশান থাকিত। উহা শুনিবামাত্র লোকে উন্মত্ত হইত।

প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণ যাত্রা শুনিয়া আমাদের দেশীয় দুই জন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির হৃদয়ে কিরূপ ভাবের উদয় হইত, তাহা শুনিলে অনেকে বুঝিতে পারিবেন যে, এই যাত্রা কিরূপ ক্ষমতাশালী জিনিস। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ডবলিউ,সি, বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের সহিত একদিন কৃষ্ণযাত্রা সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা হইতেছিল। বাঁড়ুয্যে মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "উহুহু, ও কথা আর মনে করে দিও না। একদিন কাল আমি কৃষ্ণ যাত্রা শুনিয়া পাগল হইতাম। সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত এক আসনে বসিয়া গান শুনিতাম, আর কাঁদিতাম, আর হৃদয়ে কত তরঙ্গই উঠিত। এমন কি, যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেলেও দুই তিন দিন আমি বিভোর থাকিতাম। আমার বোধ হয়, এখনও অশ্রুপাত না করিয়া কৃষ্ণ যাত্রা শুনিতে পারি না।"

হাইকোর্টের জজ বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিতও একদিন ঐরূপ কৃষ্ণযাত্রা সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার বয়স যখন ১২।১৩ বৎসর, তখন তিনি শোভাবাজার রাজবাটীতে এক ব্যক্তি বদন অধিকারীর যাত্রা শুনিতে গিয়াছিলেন। বদন মানের পালা গাহিতেছেন। গুরুদাস বাবু তখন কৃষ্ণকেও চেনেন না, বৃন্দাবনও জানেন না, এবং মানের পালা কি, তাহাও অবগত নহেন। কিন্তু গান শুনিতে শুনিতে তিনি যেন একটী নূতন জগতে প্রবেশ করিলেন। বদনের প্রেমপূর্ণ সুস্বর, তাঁহার অঙ্গ ভঙ্গি, তাঁহার হাব ভাব দেখিয়া গুরুদাস বাবুর হৃদয়ের কবাট যেন খুলিয়া গেল, এবং "শ্রীবৃন্দাবন" দৃশ্যটী তাঁহার মনে অঙ্কিত হইল! গুরুদাস বাবু বলিলেন যে, যদিও সে ৪০ বৎসরের কথা, তবু সেই ছবিটী তাঁহার হৃদয়ে জাজ্জ্বল্যমানরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এমন কি, যদি কেহ বৃন্দাবন শব্দটী উচ্চারণ করেন, কি কোন পুস্তকে তিনি উহা পাঠ করেন, তখনই তাঁহার বদনের যাত্রা ও সেই "পুর্ব্বের" ভাবগুলি মনে উদয় হয়।

হৃদয় দ্রব ও পবিত্রকারী এই অব্যর্থ যন্ত্র লুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান যাত্রা গুলিতে প্রায় কৃষ্ণ ও গৌর নাম ভিন্ন আর সবই আছে। আবার পূর্ব্বে দুটী বিষয় ভিন্ন যাত্রা হইত না, অর্থাৎ সুসঙ্গীত ও নৃত্য। কিন্তু এখনকার যাত্রায় আর সবই আছে, কেবল গান ও নৃত্যের অভাব। এখনকার যাত্রায় কৃষ্ণ কি গৌর নাম নাই; নৃত্য ও গীত নাই; তবে আছে কি, না বক্তৃতার ছটা, ঢাল তরোয়াল লইয়া লড়াই, আর "ছিন্নমূল দ্রুমের" ন্যায় চিৎপট্ করিয়া পড়া। এখনকার যাত্রা ইংরেজি থিয়েটারের অপভ্রংশ মাত্র। তবে যাঁহারা থিয়েটার করেন, তাঁহারা রাত্রে ঘরের মধ্যে ভাল ভাল দৃশ্যগুলি দেখাইয়া দর্শকমণ্ডলীর একরূপ মনোরঞ্জন করিতে পারেন। কিন্তু যাত্রাওয়ালারা অনেকে কোর্ত্তা পরিয়া, মেয়ে মানুষ সাজিয়া, থিয়েটারের নকল করিতে গিয়া লোকের মনে কিরূপ ভাবের উদয় করেন, তাহা সহজে অনুভব করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান যাত্রা সম্বন্ধে

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর একটী রহস্য-জনক কথা বলিয়া থাকেন। তিনি বলেন যে, "এখনকার যাত্রা ত শুনিতেই পারি না। তবে কোন বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে যদি কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা শুনিতে যাই, তবে একটী বিষয় দেখিয়াই আমি প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করি। যখন দেখি যে, তবলা ও বাওয়া সরাইতেছে, তখনই বুঝিতে পারি যে, যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে একজন না একজন ঝপাৎ ক'রে পড়্‌বে। পড়ার আগেই আমি প্রায় প্রস্থান করিয়া থাকি।"

সকলেই, বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যাত্রা পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা হইতেছে। বস্তুতঃ এইরূপ একটী দলের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং এই দলটীর কিঞ্চিৎ সৌরভও বাহির হইয়াছে। বঙ্গদেশের একখানি প্রধান পত্রিকা "হিতবাদী" এই যাত্রা সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল :—

"আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠকগণকে জানাইয়াছি যে, সম্প্রতি এই কলিকাতা নগরে একটী কৃষ্ণযাত্রার দল হইয়াছে। যাঁহাদের আশ্রয়ে এই দলটী প্রস্তুত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই কৃতবিদ্য, মনস্বী ও রসজ্ঞ বলিয়া দেশ-প্রসিদ্ধ, সুতরাং ইহা যে অতি অপূর্ব্ব হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ অমৃতবাজার পত্রিকার অধ্যক্ষেরা এই দলটি প্রস্তুত করিতে কেবল প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই, বিস্তর কায়িক পরিশ্রম দ্বারাও ইহার অঙ্গপুষ্টি করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণে না জানিতে পারেন, কিন্তু অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকগণের বিশেষ বিশেষ বন্ধু বান্ধবগণ জানেন যে, ইঁহারা সংগীত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী এবং ইঁহাদের ন্যায় সুগায়ক অতি অল্প পাওয়া যায়। আবার ইঁহারা যেরূপ কালোয়াতী গানে পটু, তেমনি কীর্ত্তন পারদর্শী। সুতরাং ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে যে দল প্রস্তুত হইয়াছে, সেই দলের লোকে যে সংগীত সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট শিক্ষা পাইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। আবার বাবু শিশিরকুমার ঘোষের ন্যায় রসিক ভক্ত আজ কাল কে আছেন? সুতরাং তিনি কৃষ্ণলীলার যে পালাগুলি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে যে কোন রসাভাস নাই, ইহাও বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ যাঁহারা এই যাত্রা শুনিয়াছেন, তাঁহারা একেবারে বিমোহিত হইয়া গিয়াছেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বৈঠকখানায় এই যাত্রা দুই দিন হইয়াছিল। মহারাজা বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি অতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করেন। মহারাজা ও অন্যান্য শ্রোতৃবর্গ এক স্বরে বলিয়া উঠিলেন যে, এরূপ অপূর্ব্ব যাত্রা তাঁহারা অধুনা শুনেন নাই। অনারেবল জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনেও এক দিন এই যাত্রা হইয়াছিল। আমরা শুনিলাম, গুরুদাস বাবু এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, মাঝে মাঝে তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। যখন এরূপ উচ্চ পদস্থ সমুদায় লোক যাত্রার সুখ্যাতি করিতেছেন, তখন আর ইহার বিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। অমৃতবাজার পত্রিকার অধ্যক্ষগণ মাসে প্রায় চারি শত টাকা ব্যয় করিয়া এই যাত্রার দলটি এতদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এ ভার তাঁহারা চিরকাল বহন করিতে পারেন না, সুতরাং ধনাঢ্য ও সঙ্গীত-প্রিয় হিন্দুমাত্রেরই এই দলটি পরিপোষণ করা কর্ত্তব্য। এই দলের অধ্যক্ষ পণ্ডিত সৃষ্টিধর চট্টোরাজ। ইনি একজন ভাল সংস্কৃতজ্ঞ এবং শ্রীমদ্ভাগবত ও গোস্বামী-শাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে। বিশেষতঃ ইনি পরম ভক্ত। ইনিই এই দলে দূতীর অভিনয় করেন। যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ জানিতে চান, তাঁহারা ২ নং আনন্দ চাটুর্য্যের লেন—বাগবাজার, উক্ত শ্রীযুক্ত সৃষ্টিধর চট্টোরাজের নিকট অনুসন্ধান করিবেন। আমরা বিশেষ অনুরোধ করি, সকলেই যাত্রা একবার শ্রবণ করুন।"

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের বৈঠকখানায় যে দুই রাত্রি গান হইয়াছিল, সে সভায় আমরা উপস্থিত ছিলাম। মহারাজা বাছিয়া বাছিয়া সহরের অনেকগুলি প্রধান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই প্রসিদ্ধ বদন অধিকারীর যাত্রা শুনিয়াছেন। ইহারা সকলে একবাক্য হইয়া বলিলেন যে, বদনের পরে এরূপ যাত্রা তাঁহারা আর শুনেন নাই।

প্রথম হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত সকলেই চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় গান শ্রবণ করিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে এরূপ তরঙ্গ উঠিয়াছিল যে, কেহ কেহ মহারাজাকে বলিতে লাগিলেন, যে, "মহারাজ! আসুন সকলে নৃত্য করা যাউক, কারণ গীত শুনিয়া পা নাচিয়া উঠিতেছে।" মহারাজা বলিলেন যে, প্রকৃতই সকলের নৃত্য করিতে ইচ্ছা হইতেছে। মহারাজার পরিবারস্থ মহিলাগণের মধ্যে অনেকে বিশেষ ভক্তিমতী। তাঁহারাও যাত্রা শুনিয়া বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

যখন গান হইতেছে, তখন মহারাজা একটী অপূর্ব্ব কথা বলেন। মান-ভঞ্জনের পালা হইতেছে। এই পালার মধ্যে প্রসিদ্ধ টপ্পাওয়ালা নিধুবাবুর একটী গান দেওয়া হইয়াছে। গানটী অতি অদ্ভুত। যখন শ্রীমতীকে সারানিশি দুঃখ দিয়া রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ প্রাতে তাঁহার কুঞ্জে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন শ্রীমতী তাঁহাকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিতেছেন :—

বন্ধু, আদরে আদরে ভাল ত আছিলে।
যে তোমারই অনুগত তার কি দশা এই করিলে॥
সজল জলদ তুমি, তৃষিত চাতক আমি,
কোথা তুমি কোথা আমি,
কোথা বিন্দু বরষিলে॥

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন এই গানটী শুনিয়া অত্যন্ত বিগলিত হইয়া বলিলেন, "কি সুন্দর! কি সুন্দর! যিনি এই মানের পালা করিয়াছেন, তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ! কারণ এত দিন পরে নিধু বাবুর এই গানটী তিনি দেবসেবায় লাগাইয়াছেন।"

বলা বাহুল্য যে, নিধু বাবু এই অদ্ভুত গানটী পবিত্রা, সরলা ও বিশুদ্ধ প্রেমাধিকারিণী শ্রীমতী রাধারাণীর জন্য করিয়াছিলেন না, কিন্তু অন্য কাহারও জন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই গানটী এ যাবৎ ইন্দ্রিয়পরায়ণ-ব্যক্তিদের সম্পত্তি ছিল। কিন্তু এতদিন পরে ঐ গানটী পবিত্র হইয়া গোলোকের সম্পত্তি হইল দেখিয়া মহারাজার আনন্দের আর সীমা থাকিল না। এবং তিনি বারম্বার বলিতে লাগিলেন, "আজ এই গানটী দেব সেবায় লাগিল।"

গুরুদাস বাবুর বাটীতে যে রাত্রি যাত্রা হয়, সে দিবসও আমরা উপস্থিত ছিলাম। গুরুদাস বাবু মাঝে মাঝে এরূপ বিগলিত হইতেছিলেন যে, তাঁহার অশ্রু পতন হইতেছিল। অভিসারের সময় শ্রীমতীকে ঘেরিয়া যখন সখীরা নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন গুরুদাস বাবু বলিয়া উঠিলেন, "কি মনোহর দৃশ্য।" একটী গান শুনিয়া তিনি বিশেষ মোহিত হইয়াছিলেন। গানটী বেহাগ রাগিণীতে। বলিলেন যে, এরূপ গান তিনি কখনও শুনিয়াছেন কি না সন্দেহ। যখন শুনিলেন যে, সে গান ও সুরের রচয়িতা শ্রীল শিশির বাবু, তখনই তিনি গানটী মুখস্থ করিলেন। গানটী এই :—

সুখের রাতি, জ্বালহে বাতি,
মন্দির কর আলা।
কুসুম তুলিয়ে, বোঁটা ফেলি দিয়ে,
গাঁথহে চিকণ মালা॥
অগুরু চন্দন, কুসুম আসন,
সপুষ্প লবঙ্গ ডাল।
শুভ আলিপনা, কুসুম বিছানা,
রাখহে কদম্বের মাল॥
যমুনার বারি, পূরি হেম ঝারি,
রাখহে শীতল করি।
পিক শুক সারি, ডাক ত্বরা করি,
নিকুঞ্জ মধুক ঘেরি॥

যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেলে গুরুদাস বাবু এই কয়েকটী কথা বলিলেন ;—"শ্রীগৌরাঙ্গ

অবতীর্ণ না হইলে আমরা যাত্রার ন্যায় এরূপ উপাদেয় সামগ্রী পাইতাম না। 'নাচিয়া গাহিয়া' শ্রীভগবানকে পাওয়া যায়, ইহা কেবল শ্রীগৌরাঙ্গই দেখাইলেন। আর আমাকে আমি আজ পরম ভাগ্যবান্ মনে করিতেছি। এই যাত্রার অভিনয় দর্শন করিতে আমার কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় হইল বটে, কিন্তু সামান্য ব্যয় করিয়া আমি কত অর্জ্জন করিলাম, শুনুন। প্রথম, আমি নিজে যে আনন্দ ভোগ করিলাম, তাহা ৬০।৭০ টাকা অপেক্ষা ঢের বেশী। শুদ্ধ আমি নই, আমার বাড়ীর পরিবারগণ ও আত্মীয় স্বজন ইত্যাদি প্রায় দুই শত লোককে এই আনন্দ বণ্টন করিয়া দিতে পারিলাম। তৃতীয়তঃ, হয়ত এই দুইশত লোকের মধ্যে কাহার কাহার হৃদয়ের এরূপ পরিবর্ত্তনও হইয়া গিয়াছে যে, শত সহস্র ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িলেও তাহাদের তাহা হইত না। যদি এই টাকা দিয়া সন্দেশ কিনিয়া এই লোকগুলিকে খাওয়াইতাম, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত জিহ্বার উপর সন্দেশ টুকু থাকিত, সে পর্য্যন্ত হয়ত তাহারা কিঞ্চিৎ সুখ পাইত, কিন্তু গলাধঃ হইবামাত্র তাহাদের ইহা মনেও থাকিত না।"

উপরের যে কৃষ্ণযাত্রার কথা উল্লেখ করিলাম, ইহাতে কিছু কিছু বিশেষত্ব আছে। ইহার অধিকাংশ গান গুলি মহাজনের পদ হইতে গৃহীত। সুরগুলি প্রায়ই কীর্ত্তন ভাঙ্গা। সুর সম্বন্ধে একটি বিষয় লক্ষিত হইবে। দুধে ও তেলে মিশেনা, কিন্তু দুধে ও আল্‌তায় অপূর্ব্ব রঙ্গের সৃষ্টি হয়। কীর্ত্তন সুরে কালোয়াতি মিশান বড় কঠিন। মিশাইতে গেলেই কিম্ভূতাকার ধারণ করে, কিন্তু মিশাইতে পারিলে অতি মনোহর বস্তুর সৃজন হয়। এই যাত্রায় যতগুলি গান আছে, তাহার অধিকাংশই কীর্ত্তন ও কালোয়াতি সুরে মিশান। আকারটি কীর্ত্তনের মতন, অথচ খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে, ইহাতে কালোয়াতির ভাঁজ আছে। যাঁহারা সংগীতশাস্ত্রে বিশারদ, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, এই দুই জাতীয় সুর নিখুঁত রূপে মিলিত করা কি দুরূহ ব্যাপার। এইরূপ প্রায় একশত নূতন সুর এই যাত্রায় আছে। আধুনিক যাত্রায় প্রায় ভাল সুর নাই, যদিও কোন কোন যাত্রায় শুনা যায়, তাহার সংখ্যা চারি পাঁচটির বেশী হইবে না। পূর্ব্বকার বদন অধিকারী প্রভৃতি যাত্রা গায়কগণও ঊর্দ্ধ সংখ্যা ১০।১৫টি ভাল সুর ব্যবহার করিতেন।

উপরিউক্ত কৃষ্ণযাত্রার আর একটি বিশেষ লক্ষণ এই। আপাততঃ মান, মাথুর, ও উৎকণ্ঠা সংক্রান্ত তিনটি পালার সৃষ্টি হইয়াছে। মান কি? মাথুরের উদ্দেশ্য কি? ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী যাত্রাগায়কগণ পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত করিয়া যান নাই। বরং গোবিন্দ অধিকারী প্রভৃতি কতকগুলি যাত্রা গায়কগণ মান কি মাথুরের মধ্যে এরূপ সমস্ত রস প্রবেশ করাইয়াছিলেন যে, তাহা অতি অশ্রাব্য বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য এখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায়গণ মানভঞ্জনের পালাকে অনেক সময় "খেউড়" বলিয়া গণ্য করেন। তাহাদের ইহা বলিবার কিছু দাবিও আছে, কারণ অশিক্ষিত সাধারণ লোকের রুচি অনুসারে ঐ সমস্ত কৃষ্ণযাত্রার পালা গুলি সৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু যে যাত্রার কথা আমরা লিখিতেছি, ইহা শুনিলে অতি সামান্য ব্যক্তিও বুঝিতে পারিবেন যে, কি উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণ মান লীলা কি মাথুর লীলা করিয়াছিলেন। বস্তুত মান, কি মাথুর, কি উৎকণ্ঠার পালাগুলি যে ভাবে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা শুনিলে হৃদয় ভক্তি ও প্রেমরসে পরিপূর্ণ না হইয়া থাকিতে পারিবে না

এবং শ্রীভগবান্ যে কত মধুর ও প্রিয়জন, তাহাও জাজ্বল্যমান রূপে অনুভূত হইবে। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া না মানেন, তাঁহারাও এই কৃষ্ণযাত্রা শুনিয়া আপনাদের হৃদয় পবিত্র ও শীতল করিতে পারিবেন। এই অতি উপাদেয় যাত্রার দলটি পরিপোষণ করা ধনাঢ্য হিন্দুমাত্রের কর্ত্তব্য, কারণ ইহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। এই উদ্দেশ্য কি না, "নাচিয়া গাইয়া" শ্রীভগবানের প্রতি জীবের মন আকর্ষণ করা।*

শ্রীমৎ রূপসনাতন প্রবন্ধের প্রতিবাদ। (২)

শ্রীরূপ সনাতন যখন (অগ্রপশ্চাৎ) নীলাচলে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকট গমন করেন, তখন তাঁহারা অপরাধ আশঙ্কায় শ্রীজগন্নাথ দর্শনে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতেন না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকটে আর শ্রীহরিদাসের ভজনাগারে থাকিতেন। এবং দূর হইতে শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরের চক্র দর্শন করিতেন।

উৎকল-দীপিকায় আছে;—শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রত্নবেদী গণ্ডকীজাত লক্ষ শালগ্রাম শিলোপরি নির্ম্মিত, এজন্য মন্দিরের ভিতর প্রবেশ নিষিদ্ধ। যথা, উৎকল ভাষ্যে;—

"জগন্নাথ দর্শনে যাবন্তি।
মন্দিরে প্রবেশ না করন্তি॥
লক্ষ শিলাতে স্থাপরন্তি।
যাকে রত্নবেদী কহন্তি॥'
* * * * ইত্যাদি।

এই কারণে মহাপ্রভু গরুড় স্তম্ভের নিকটে থাকিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমুখ দর্শন করিতেন। মহাবিচক্ষণ সর্ব্বশাস্ত্র পরিজ্ঞাতা শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন দৈবাৎ স্খলিত পদে বেদী স্পর্শাপরাধ আশঙ্কায় মন্দিরের ভিতর প্রবেশ ও শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিতেন না। তাঁহাদের আরও এক উদ্দেশ্য ছিল, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব অচল, অর্থাৎ দারুব্রহ্ম ঐশ্বর্য্যশালী, শ্রীচৈতন্যদেব সচল, পূর্ণব্রহ্ম, মাধুর্য্যের আধার। এতন্নিবন্ধন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিকটে থাকিতে ভালবাসিতেন। একদিন, শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীসনাতনের মন পরীক্ষার নিমিত্ত পুরীর সন্নিকট যমেশ্বর টোটায় অবস্থিতি করিয়া মধ্যাহ্ন কালে প্রসাদ ভুঞ্জিবার নিমিত্ত সনাতনকে নিমন্ত্রণ করেন, সিংহদ্বারের পথ হইতে ঐ স্থান অতি নিকট। যদিও সমুদ্রের বেলাভূমি হইয়া যমেশ্বর টোটায় যাইবার একটী দ্বিতীয় পথ আছে, কিন্তু সে পথটী অধিক বক্র। যে মধ্যাহ্ন সময়ে প্রভুর নিমন্ত্রণ, সে সময়টী জ্যৈষ্ঠ-মাস, ঐ সময়ের মধ্যাহ্নকালে মার্ত্তণ্ডদেবের প্রচণ্ড কিরণে সমুদ্রতীরস্থ বালুকারাশি অধিক উত্তপ্ত হয়। পরন্তু, প্রভুর আমন্ত্রণে শ্রীসনাতন

* এই প্রবন্ধটী একজন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ ভক্তের লেখা। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই দেশে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। আমরা সাদরে এই প্রবন্ধটী পত্রিকাস্থ করিলাম।

আমি একদিন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ঠাকুর দাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয়ে গিয়াছিলাম। সেখানে সেদিন এই যাত্রার দলে মানের পালার অভিনয় হইতেছিল। সৌভাগ্য ক্রমে আমরা এই গান শুনিবার অবসর পাওয়ায় কৃতার্থ হইয়াছিলাম। পালাটী স্থানে স্থানে এত মধুর বোধ হইয়াছিল যে, আমরা অত্যন্ত ভক্তি ও প্রেমরসে আপ্লুত হইয়াছিলাম। বাল্যকালে রাধাকৃষ্ণ বৈরাগীর "প্রভাস মিলন" পালা শুনিয়া অনেক দিন অশ্রুবর্ষণ করিয়াছি, এতকাল পরে আবার ঐ কৃষ্ণযাত্রা শুনিয়া মোহিত হইয়াছি। আমার বিশ্বাস, যাঁহারা এই যাত্রাদলের গান শ্রবণ করিবেন, তাঁহারাই মুগ্ধ হইবেন। ন, স।

সৌভাগ্য ও হর্ষাতিশয়ে বালুকাপথে, অর্থাৎ যে পথে গমন করিলে পা দগ্ধ হইবে, তাহা মনেও স্থান দিলেন না, অতি উল্লাসে সেই তপ্ত বালুকার পথে গমন করিয়া যমেশ্বর টোটায় প্রভুর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। প্রভু দেখিলেন, সনাতনের পদদ্বয় অত্যন্ত স্ফীত হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডের চতুর্থে;—

"প্রভু কহে, কোন্ পথে, আইলা সনাতন।
তিঁহ কহে সমুদ্রপথে করিনু গমন॥
প্রভু কহে তপ্ত বালুকায় কেমনে আইলে।
সিংহ দ্বারের শীতল পথ কেন না আইলে॥"

হে সনাতন! সিংহ দ্বারের নিকট পথ থাকিতে তপ্ত বালুকার পথে এত কষ্ট করিয়া আসিবার প্রয়োজন কি?

সনাতন উত্তর করিলেন, প্রভো!

"সিংহ দ্বারের পথ, শীতল কভু নয়।
সে পথে ঐশ্বর্য্য রূপ কণ্টক আছয়॥
মাধুর্য্যের পথ সুগম অতিশয়।
সে পথে আসিতে তাপের নাহি ভয়॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু, এই উত্তর শুনিয়া পরমানন্দে শ্রীসনাতনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন;—অহো! সনাতন তোমার যে অনুরাগ, ইহাই যথার্থ। তুমি যে মহাজন পথ ত্যাগ কর নাই, ইহাতে তুমিই ধন্য! এবং তোমাকে স্পর্শ করিয়া আজি আমি ধন্য! এস্থলে ইহাই বিবেচিত হইবে যে, শ্রীরূপ সনাতন রাগানুগ ভক্ত ছিলেন। তজ্জন্য ঐশ্বর্য্য দর্শনাভিলাষে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিতেন না।

(৩) শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজগণ সহ যখন রামকেলী গ্রামে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীরূপ, সনাতন শ্রীচৈতন্য দেবের কৃপাভিলাষে নীচত্ব স্বীকার করিয়া অতি দীনভাবে প্রভুর শরণাপন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন;

"নীচ জাতি নীচ সঙ্গী করি নীচকর্ম্ম।" ইত্যাদি।

তাৎপর্য্য;—

"দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"

ঈশ্বর দাম্ভিকের কেহই নহেন, কিন্তু ভক্তের ভগবান্। ভক্তি ভিন্ন শক্তিতে কখনই কেহ তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারেন না। হে, প্রভু! আমি নীচ,—নীচ হইতেও নীচ, আমি অধম, নীচ হইতেও অধম, আমি মূর্খ—আকুটী হইতেও মূর্খ, আমি পাপী—জগাই মাধাই হইতেও পাপী, কীট—কীট হইতেও বিষ্ঠা বা নরকের কীট, মনে করুন, এইরূপ দৈন্যোক্তিতে ঈশ্বরের স্তব করিলে কখন কি, নীচ, অধম, মূর্খ, পাপী, অতি পাপী, বা কীট হইতে হয়? যাঁহারা ইহা মনে করিয়া নিন্দা করেন, তাঁহাদিগের দুর্বুদ্ধি বলিতে হয়, এবং যাঁহারা এ কথার অর্থ বুঝেন না, তাঁহাদের বোধশক্তি অতি অল্প।

(৪) শ্রীসনাতন যখন বন্দীশালে, তখন তিনি শ্রীরূপের একখানি পত্র পাইয়া সাতিশয় ব্যাকুল হন্, এবং তখনই বৈরাগ্যভাবের পুনঃ উদ্রেক হয়। সেই কালে কারাধ্যক্ষকে বিনয়বাক্যে বলিয়াছিলেন, হে জিন্দাপির! আপনি ভাগ্যবান্, আপনার কেতাব কোরাণে বিলক্ষণ জ্ঞান আছে, একটী বন্দীকে কিঞ্চিৎ পথ সম্বল দিয়া ছাড়িয়া দিলে কি পুণ্য হয় না? আমি এক সময় আপনার বহু উপকার করিয়াছি, এখন আমার এই দুঃসময়ে আমাকে ছাড়িয়া দিয়া আমার বিশেষ উপকার করুন। ইহাতে রাজভয়ের আশঙ্কা করিবেন না; রাজা উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমন করিলে বলিবেন, সনাতন বাহ্যকৃত্যে গিয়া পতিতপাবনী শ্রীগঙ্গাদেবীর নিকট পতিতপাবন স্বরূপ দ্বিতীয় গঙ্গা দেখিয়া তন্মধ্যে ঝাঁপ দিয়াছে, দাড়ুকা অর্থাৎ বেড়ী

সহ কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, অনুসন্ধান পাওয়া যায় না, ইত্যাদি। কারাধ্যক্ষ যবন, অতি নিষ্ঠুর, সে কি বিলাপ শুনিবার পাত্র? "না ছোড় বান্দা" ব্যাল কথন কি মন্ত্রে বশীভূত হয়? যদি হয়, একটা ভাষা-কথায় আছে;—

"যু সাপ কাঁদনী শুনে, রোজার হয় বশ:।
ঢোড়া ঢেমা, ডেগরা, মন্ত্রে নহে বশ:॥

রাজমন্ত্রী সনাতন তখনই বুঝিলেন,— এ দুরাচার কখনই বিনয়ে বশীভূত হইবার নহে। "লুব্ধমর্থেন গৃহ্নীয়াৎ" স্মরণ হইল্ যুদি ঘরে দশ হাজার টাকা গচ্ছিত আছে, অগত্যা কারাধ্যক্ষকে মুদ্রার লোভ দেখাইয়া বলিলেন, আমি এ দেশে রহিব না, দরবেশ হইয়া মক্কায় যাইব। এ স্থলে "অর্থেন সর্ব্বে বশা" কারাধ্যক্ষ তখন লোভে পড়িয়া এবং সাত হাজার মুদ্রা ঘুষ লইয়া সনাতনকে ছাড়িয়া দেয়। সনাতন মুসলমান হইলে কি এত কাণ্ড হইত! কারাধ্যক্ষ কি জাতিভায়ার নিকট এরূপ ঘুষ লইতে পারিত? বিপৎকালের কাকোক্তি মক্কায় যাইবার কথা যদি যবনের পরিচয় বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, সে এক ভৌতিক বিচার।

(৫) সনাতন যখন কারামুক্ত হইয়া কাশীতে গিয়া প্রভুর নিকট উপস্থিত হন, তখন তাঁহার মুসলমানী বেশ ভূষা ছিল না। কারাগারের যে মলিন অবস্থা, তাহাই ছিল। উদাহরণে দেখা যায়। যথা;—স্বয়ং লক্ষ্মী শ্রীরামপ্রিয়া অশোক কানন হইতে বিমুক্ত হইয়া যখন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গমন করিতে উদ্যত, সেই কালে ধার্ম্মিক বিভীষণ-পত্নী সরমা বাধা দিয়া বলিলেন,— দেবি! এরূপ কুৎসিত বেশে গমন করিবেন না; শ্রীরামচন্দ্র মনে করিবেন কি? এ বেশ দেখিলে বলিবেন, পাপ লঙ্কাপুরে কেউ কি ভক্ত নাই? কেউ কি দাসী বলিতে নাই? অতএব আমি দাসী থাকিতে কখনই এ বেশে যাইতে দিব না। আসুন আপনার পদদ্বয় অলক্তে রঞ্জিত এবং আলুলায়িত অচিক্কণ কেশগুলি সুগন্ধ তৈলযুক্তে সুচিক্কণ করিয়া এবং উত্তম বস্ত্র পরিধান করাইয়া মনের সাধে শ্রীমন্থিনী সজ্জা করিয়া দি!

জানকী বলিলেন, ভগ্নি! এখন কোন বেশ প্রয়োজন করে না।

"যেই বেশে আছি আমি সেই বেশে যাব॥
আমারে দেখিলে প্রভুর করুণা হইব॥"

মনে করিতে হইবে, এখানেও শ্রীসনাতনের আশয়া সেইরূপ। কারণ, তিনি কারামুক্ত হইয়া কাশী গমন করিবার কালে পথিমধ্যে হাজিপুরে তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকান্ত মজুমদারের সহিত তাঁহার সাক্ষাত হইয়াছিল। শ্রীকান্ত সেইকালে শ্রীসনাতনের মলিন অবস্থা দেখিয়া ভদ্রবেশে অগ্যং শ্মশ্রু আদি ত্যাগ করিয়া যাইবার নিমিত্ত বিস্তর যত্ন ও অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সনাতন সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে সেই কালে শ্মশ্রু ত্যাগ ও উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া ও শাল দোশালা গায়ে দিয়া ভদ্র বেশে প্রভুর সকাশে যাইতে পারিতেন। ফলে, তাঁহার সে উদ্দেশ্য ছিল না। কারাগারের প্রকৃত অবস্থা প্রভুর দৃষ্টিগোচর হইলে অবশ্যই প্রভুর কৃপা হইবে, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপদে পড়িয়া মলিন বেশ ধারণ করিলে কি নীচ অথবা ম্লেচ্ছ হইতে হয়? কোথাও কি সে নজীর আছে? উমেশ বাবু অনেক জেল পরিদর্শন করিয়াছেন, বোধ হয় তাঁহার বাহ্য দৃষ্টিতে কোন না কোন নজীর থাকিবার সম্ভব! তা যাহাই হউক, তিনি কোরাণ, পুরাণ, বাইবেল ছাড়া

আকাশ পাতাল ভাবিয়া অতি মহৎ শ্রীরূপ ও সনাতনের আরো কতকগুলি দোষানুসন্ধান করিয়া অসূয়া প্রকাশ করিয়াছেন :—

(১) রূপ সনাতন মতিচ্ছন্ন বশতঃ অর্থ লোভে যবন হইয়াছিল, পরন্তু তাহাদের জাতি গিয়াছিল অথচ পেট ভরে নাই।

(২) রূপ দণ্ড ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছিল, আভাসে জানা যায়, রূপকে হুসেন-সাহা প্রজাপীড়ক, অত্যাচারী, দস্যু বলিয়াই জানিতেন।

(৩) সনাতন পীড়িত ছিল না, পীড়ার মিথ্যা ভান করিয়া রাজকার্য্যে অবহেলা করাতে সে মিথ্যাবাদী 'কপট' অর্থাৎ প্রতারক ছিল বলিয়াই পাতসা হুসেন সাহা সক্রোধে ;—

"তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।"
"পশু পক্ষী মারি সব চাকলা কৈল নাশ॥"

এইরূপ ভর্ৎসনা দ্বারা শেষে সনাতনকে জেলে দিয়াছিলেন। এই কয়েকটী কথার উত্তরে বলিতে হইতেছে,—শ্রীযুক্ত উমেশ বাবুর এ সকল কটাক্ষ বিসম হইতেও বিষম, অর্থাৎ কানকাটা অপেক্ষাও বটে। বস্তুগত্যা সাধু নিন্দায় পুরুষার্থ কি? তাহাতে পৌরুষ নাই।

যাঁহারা বাল্যকালে নৈয়ায়িকাদি বিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং প্রতিভাশালী হইয়া নানা শাস্ত্র দর্শন ও নানা শাস্ত্র মন্থন করিয়া বিদ্যাবুদ্ধির প্রভাবে শ্রীবৃন্দাবনে সম্রাট পদে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন, যে সনাতন স্পর্শমণিকে লোষ্ট্র জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নাই, যে সনাতন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের সমতুল্য পণ্ডিত ও সমসাময়িক, যাঁহার বৈষ্ণবস্মৃতি বঙ্গে দেদীপ্যমান ও সর্ব্বত্রে পরিব্যাপ্ত ও সাধুগণের বহুমান্য; যে সনাতনের প্রতিষ্ঠা শুনিয়া স্বয়ং দিল্লীশ্বর আকবর-সাহা আগরা হইতে পদব্রজে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া তাঁহাকে দর্শন করেন, এবং তাঁহার ভক্তি প্রভাব দর্শনে নতশির হইয়াছিলেন; যে শ্রীরূপ, সনাতন পৃথিবীর উচ্চ গোলোক সদৃশ শ্রীবৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিয়া জগতে কীর্ত্তি স্তম্ভ রাখিয়াছেন; যে শ্রীরূপের কৃত উজ্জ্বল নীলমণি 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' হংসদূত, বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব, দানকেলী কৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থের অর্থ করিতে ও অর্থ বুঝিতে এ কালে পণ্ডিত ও লোক খুজিয়া পাওয়া যায় না; সেই সনাতন, সেই শ্রীরূপ, দস্যু, মিথ্যাবাদী, প্রজাপীড়ক, যবন ছিলেন, এ সকল উদ্ভট কথা মনেও আনিতে নাই, কাণেও শুনিতে নাই, শুনিলেও পাপ, বলিলেও পাপ !!

"নিন্দাং যঃ কুরুতে সাধোস্তথা স্বং দূষয়ত্যসৌ।
খেধূলিং যস্তু ক্ষিপেৎ ক্ষিপ্তা মূর্দ্ধ্নি তস্যৈব সা পতেৎ॥"

আকাশে ধূলা ছড়াইলে, আকাশের সেই ধূলা মস্তকে আসিয়া পড়ে। সেইরূপ সাধু নিন্দায় আপনাকে দূষিত হইতে হয়।

শ্রীরূপ সনাতন, উমেদার হইয়া কিম্বা নিজে নিজে চেষ্টা করিয়া যবন রাজের চাকরি করেন নাই, পেটের দায়ে সোণার জাতি খোয়ান নাই। রাজভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে তাঁহাদের বিলক্ষণ খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং আদিবাস, বাকলা চন্দ্রদ্বীপ এবং নূতন বাস রামকেলী বা সাকরামায় বহু প্রকার দেবকীর্ত্তি ও তদুপলক্ষে বার মাসে তের পার্ব্বণ, ক্রিয়াকলাপ, দান ধর্ম্ম অর্থাৎ সদাব্রত ও অন্নাদির বিলক্ষণ যোগাড় সম্ভ্রম ছিল। রাজার মুখাপেক্ষা বা কোন কার্য্যে তোষামোদ করিতেন না। কার্য্যকালে গৌড়-রাজ তাঁহাদিগের বিহিত সম্মান ও খাতির করিতেন। তাঁহারা

প্রজারঞ্জক ছিলেন, প্রজাদিগকে পুত্রভাবে স্নেহ চক্ষে দেখিতেন। রাজনীতি বিষয়ে এতদূর দক্ষ ছিলেন যে, রাজা লোক পরম্পরায় তাঁহাদের গুণ ও মর্য্যাদা শ্রবণ করিয়া বহু যত্নে তাঁহাদিগকে আনাইয়া এবং নানা সর্ত্তে নিজে বাধ্য হইয়া রাজ্যের সমস্ত কার্য্যভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত করতঃ নিজে নিশ্চিন্ত ভাবে স্বতন্ত্র স্থানে থাকিতেন। একাসনে বসিতেন না ও মিশিতেন না। ভক্তিরত্নাকরে আছে, —

'রূপ, সনাতন মহামন্ত্রী সম্প্রদায়ে।
শুনিলেন রাজা শিষ্ট লোকের মুখে॥
গৌড়রাজ যবনের অনেক অধিকার।
রূপ সনাতনে আনি, দিলা রাজ্য ভার॥'

প্রশ্ন হইতে পারে, সনাতন যদি যবন রাজের এতই প্রিয়পাত্র ছিলেন, তবে রাজা তাঁহাকে কয়েদ করিলেন কেন?

সে কয়েদের অর্থ স্বতন্ত্র। ডাকাইতি, খুন, রাহাজানি বা দাগাবাজী অসৎ কার্য্যের নিমিত্ত নহে। কেবল আবদ্ধ করিবার নিমিত্ত। ফলতঃ তাঁহাদের পূর্ব্ব চরিত্র কোন পাপপঙ্কে লিপ্ত ছিল না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা ভারতভূমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরন্তু যে কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাদিগের আবির্ভাব, তাঁহারা তৎকার্য্য একপ্রকার বিস্মৃত হইয়া মায়ামোহগর্ত্তে অর্থাৎ রাজ বৈষয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া আসল কাজ ভুলিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাদিগের চৈতন্যহেতু চৈতন্যপ্রদায়ক শ্রীচৈতন্যদেব প্রথমতঃ অসতীর তুলনা দিয়া একখানি প্রেমমিশ্র পত্র লেখেন। তাহার পর তাঁহাদিগকে বিষয়রূপ বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবন গমনের ছলে গৌড় রাজধানীর সমীপবর্ত্তী সহচরবর্গ সমভিব্যাহারে রামকেলী গ্রামে উপস্থিত হইয়া হরিনাম জোর ডঙ্কার দ্বারা সকলকে মুগ্ধ করতঃ, কৃপারজ্জু বন্ধন দ্বারা ভ্রাতৃদ্বয় অর্থাৎ শ্রীরূপ ও সনাতনকে উদ্ধার ও শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীনীলাচলে পুনরাগমন করেন। তাহারই কিছুদিন পরে, শ্রীরূপ বৈরাগ্য ইচ্ছায় প্রিয়ানুজ শ্রীবল্লভ সমভিব্যাহারে রাজার অজ্ঞাতে শ্রীবৃন্দাবনের দিকে গমন করিলে রাজা অত্যন্ত ব্যথিত হন। কথায় আছে, বিপদ বিপদের ও সম্পদ সম্পদের অনুগামী। সেই সময় উড়িষ্যায় শত্রু বিগ্রহের সংবাদে রাজা বহু উদ্বিগ্ন হন। রাজা, শ্রীসনাতনকে গৌড় রাজ্যে রাখিয়া অথবা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া উড়িষ্যা যাইবার মনস্থ করেন। পরন্তু, ঐ সময়ে শ্রীসনাতন শ্রীরূপের বিরহে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়া রাজকার্য্য ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে হিন্দু ভদ্র সন্তান অর্থাৎ যাঁহারা তাঁহার অধীনে কাজ করিতেন, সেই সমস্ত পদস্থ ব্যক্তিগণের হস্তে কার্য্য ভার ন্যস্ত করিয়া পীড়িত ছলে দরবারে যাইতেন না। পণ্ডিতদিগকে লইয়া নিজ বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ শ্রবণ করিতেন।

রাজা বৈদ্য প্রমুখাৎ অবগত হইলেন, পীড়া কেবল ওজর মাত্র। বস্তুতঃ সনাতন বৈরাগ্যের পূর্ব্বানুষ্ঠান করিয়াছেন। আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, সকল দিকেই বিপদ, (১) শ্রীরূপের প্রস্থান, (২) শত্রুবিগ্রহ, (৩) সনাতন কার্য্যে অমনোযোগী। উড়িষ্যার শত্রুদমনে যাইতে হইলে, কে রাজ্য রক্ষা করিবে, কেই বা সঙ্গে যাইবে, এই নানা চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া স্বয়ং পদব্রজে শ্রীসনাতনের গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে রাজ্য লইয়া গৌড়ে থাকিবার কিম্বা উড়িষ্যায় সঙ্গে যাইবার নিমিত্ত বিস্তর যত্ন ও অনুরোধ করেন। কিন্তু সেইকালে শ্রীসনাতনের অনুরাগের নদী

এতই তরঙ্গ ধারণ করিয়াছিল যে,সাধ্যসাধনায় সেই বেগ ধরিয়া রাখিবার নহে। সনাতন রাজ্য লইয়া থাকিতে অথবা সঙ্গে যাইতে কোনমতে স্বীকৃত হইলেন না। ইতিহাসে কথিত আছে, সেকালে যবন রাজাদিগের এরূপ শাসন দণ্ডের ক্ষমতা ছিল যে, এক হস্তে কোরাণ,অপর হস্তে শাণিত তরবারি। জাতি নাশ ত সহজ কথা, রাজাজ্ঞা অবজ্ঞা করার অপরাধে তদ্দণ্ডেই রাজা সনাতনের শিরচ্ছেদন করিতে পারিতেন। ফলতঃ তিনি শ্রীসনাতন দ্বারা বহু উপকার পাইয়াছিলেন। বিশেষতঃ অঙ্গীকারপত্রের সর্ত্তমতে সনাতনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা কি, দিল্লীশ্বরের বিনানুমতি শ্রীসনাতনের উপর সা-হুষেণের কোন ক্ষমতা প্রকাশ কি শারীরিক দণ্ড বিধান করিবার অধিকার ছিল না। সনাতন যখনই মন্ত্রীত্ব পদ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিবেন,তখনই ত্যাগ করিতে পারিবেন এবং রাজাকে তাহা গ্রাহ্য করিতে হইবে, নিয়মপত্রে ইহা সর্ত্ত ছিল। সুতরাং রাজা সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। তজ্জন্য সনাতনের প্রতি অন্য কোন শাস্তি বিধান না করিয়া পলাইয়া যাইতে না পারে, এতন্নিবন্ধন পাদবন্ধন দ্বারা (উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনের কাল পর্য্যন্ত) কারাধ্যক্ষের নজর বন্দীতে অর্থাৎ হাজতে রাখিয়া রাজা উড়িষ্যায় গমন করেন। উর্দ্দু ভাষায় নজরবন্দী বা হাজত শব্দের বাঙ্গলা অর্থ অবরুদ্ধ বা নির্জ্জন কারাবাস।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, শ্রীরূপ প্রজাপীড়ক ছিলেন না। অবৈধ উপায় দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করেন নাই। বেতনের পরিবর্ত্তে রাজসংসারে রাজ্যের ¼ অংশ ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ বহু জায়গীর বরাদ্দ ছিল। সেই সমস্ত ভূমির ন্যায্য কর স্বরূপ অর্থ উপার্জ্জন দ্বারা যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তা "পাগলের বুচকি আগলের" বা "বৈরাগ্যের পুঁজি নহে"। তৎসমুদায় অর্থ স্বর্ণ ও রজত উভয় মুদ্রা হইতে পারে, কিন্তু "আদার বেপারী হইয়া জাহাজের খবর রাখিবার দরকার কি?" এই জন্য তাহার বিশেষণ অনাবশ্যক, তাই তাহা প্রকাশ নাই। বস্তুতঃ সেই সমস্ত অর্থ দানসাগর, কুটম্ব-ভরণপোষণ, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে বিতরণ, তড়াগাদি খনন, ও মন্ত্র পুরশ্চরণের নিমিত্ত সংগ্রহ ও বৈরাগ্যের পূর্ব্বে তৎসমুদায় অকাতরে ব্যয় করিয়া শেষে কেবল ডোরকৌপীন মাত্র লইয়া ভিখারী হইয়াছিলেন। ভিখারী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু, "অন্নব্রহ্ম" বলিয়া অন্যান্য হিন্দুপতিতদিগের মত যার তার বাটীতে ভাত বা পিঠা পানা মাগিয়া খাইতেন না। সমাদরে বৈষ্ণবের ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন।

"বেদ না মানিয়া বুদ্ধ হইলা নাস্তিক।"

এই যে একটী কথা আছে, শ্রীরূপ, সনাতন সেরূপ নাস্তিক ছিলেন না। বেদ মানিতেন ও তদনুসারে হিন্দুধর্ম্ম আচরণ করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকার তাঁহাদের ধনবিভাগের কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই সত্য।

শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু যদি গুরুতন্ত্র, কি গৌতমীয় তন্ত্র, অথবা নির্য্যাসতত্ত্ব ঈশান সংহিতা দেখিতেন, কুত্রাপিও ভ্রমে পড়িতেন না। তাই পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সন্তরণ না জানা বড়ই দোষ।

শ্রীশ্রীপ্রভু রূপগোস্বামী যে কিছু অর্থ নৌকা পূর্ণ করিয়া গৃহে আনিয়াছিলেন, সে সমুদায় লুট কি চোরাই মাল ছিলনা। স্বোপার্জ্জিত পারিশ্রমিক অর্থ। যাহা কিছু আনিয়াছিলেন, তাহা সাধারণের দৃষ্টিগোচরে অর্থাৎ

প্রকাশ্যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কুলাচার্য্যগণকে যাহা কিছু দান করিয়াছিলেন, তাহাও প্রকাশ্যে, পণ্ডিত কুলাচার্য্যগণ যাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন,তাহাও প্রকাশ্যে, বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ ও মুদি ঘরে যাহা গচ্ছিত বা সঞ্চয় রাখিয়াছিলেন, তাহাও প্রকাশ্যে। ঐ সকল ধন গ্রহদুর্ব্বিপাকের শান্তি অথবা কোন পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য অব্রাহ্মণে দান করেন নাই। তাঁহাদের নিকট সেরূপ দান লইয়া কোন ব্রাহ্মণ পতিত হয়েন নাই। তাঁহারা পতিত হইলে তাঁহাদের নিকট বেদবিৎ কি শাস্ত্রবিৎ কোন বিপ্র অর্থ লোভে দান লইলে অবশ্যই পতিত হইতেন,এবং সেইকাল হইতেই একটা তুমুল কাণ্ড অর্থাৎ সমাজ দূষিত দল হইয়া ভিন্ন ভিন্ন থাক হইত ও এপর্য্যন্ত তাহার কোন না কোন একটা নিদর্শন থাকিত। শাস্ত্রে আছে, বৈরাগ্যের পূর্ব্বে মন্ত্র পুরশ্চরণ করিতে হয়। বিনা পুরশ্চরণে কোন কার্য্য সুসিদ্ধ হইবার নহে। এই জন্য সেই মন্ত্র পুরশ্চরণ বৃহদ্ব্যাপারে শ্রীরূপসনাতন, নবদ্বীপাদি নানা সমাজের বড় বড় অধ্যাপকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ও আনাইয়া তাঁহাদের দ্বারা সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করাইয়া পণ্ডিতবর্গকে সন্তোষের সহিত বিদায় করিয়াছিলেন।

"শ্রীচৈতন্য দাস" যিনি সেই ঘটনা চাক্ষুষে দেখিয়াছিলেন, তিনি নিজ পুত্র শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে এইরূপ বলেন। যথা ;— ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে পিতাপুত্র সংবাদে ;

"নবদ্বীপ আদিস্থিত অধ্যাপকগণ।
রামকেলী গ্রামে হয় সভার গমন॥
মোর অধ্যাপক অগ্রগণ্য চার্ব্বাদিতে।
রামকেলী হইতে লোক আইল তারে নিতে॥
চলিলেন অধ্যাপক, মোরা সঙ্গে গেনু।
শুভক্ষণে রামকেলী গ্রামে প্রবেশিনু॥
সনাতন রূপের ভবন সন্নিধানে।
হইল সভার বাস,পরম সম্মানে॥
অধ্যাপকগণ মহা উল্লাস হিয়ায়।
চলিলেন সনাতন, রূপের সভায়॥
অধ্যাপক সঙ্গে গিয়া, দেখিনু সাক্ষাতে।
করিলেন সভার সম্মান, নানা মতে॥
ঐশ্বর্য্যের সীমা অহংকার মাত্র নাই।
কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি, মাগে সর্ব্ব ঠাই॥
দুই ভাই সর্ব্বশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত।
জ্যেষ্ঠ সনাতন রূপ কনিষ্ঠ বিদিত॥
নানা দেশী পণ্ডিতের শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনে।
বহু অর্থ দিয়া পরিতোষে সর্ব্ব জনে॥"
ইত্যাদি।

পুরশ্চরণ বিধি—যথা গৌতমীয় তন্ত্রে শ্রীশ্রী দেবী ভগবতী প্রতি শ্রীঈশান বাক্যং।

"গঙ্গা গর্ত্তে সরিত্তীরে তীর্থস্থানে সুপুণ্যকে,
দেবালয়ে পুণ্য ভূমৌ পুরশ্চর্য্যা বিধীয়তে।
পুরশ্চর্য্যা বিনা দেবি ন সিদ্ধতি কদাচন,
তস্মাদৌ দৌ পুরঃ শ্চর্য্যা কর্ত্তব্যা বৈষ্ণবোত্তমৈ।"

ফলমাহ ;

"কৃষ্ণং স্মরণং জনকাস্য শ্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং
তত্ত্বৎ কথা রতশ্চাদৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥"

শ্রীমৎরূপসনাতন পুরশ্চরণ ও মন্ত্রচৈতন্য দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া রাগানুগা ভক্তির সহিত ব্রজধামে বাস করিয়াছিলেন।

"লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে।"

শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু যে এই একটা কথা লিখিয়াছেন, তাহা ভুল। লোভী না হইয়া লেভ হইবে। মূল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদর্শ বহুকালের প্রাচীন হস্তাক্ষরী গ্রন্থ যাঁহা আমার বাড়ীতে আছে,তাহাতে এবং পঞ্চাশৎ বৎসরের পূর্ব্বে ছাপার গ্রন্থে আছে ;

"অস্বাস্থ্যের ছন্দ করি, না যায় রাজ দ্বারে।
লেভ কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে॥"

বৈষ্ণবাভিধানে প্রকাশ, লেভ শব্দে লেখক অর্থাৎ মসীজীবী, পদস্থ কর্ম্মচারীগণ। তখনকার কালে এক এক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন

পদ ছিল, তাঁহারা তন্নামে অভিহিত হইতেন, যথা ;—উর্দ্দু ভাষায়, মুন্সী, বক্‌সী, নাজীর, সেরেস্তাদার, পেস্কার, কানুনগুহি প্রভৃতি।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, শ্রীরূপ সনাতন সৎশূদ্র বিশ্বাসী কার্য্যকারক অর্থাৎ কায়স্থ জাতির দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালনা করাইতেন। সুতরাং লেভ শব্দটী কায়স্থ জাতির বিশেষণ ; ফলতঃ আপনারা কোন লেখাপড়া বা কেরাণীর কার্য্য করিতেন না। সকলের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। এখনকার মুদ্রিত ছাপার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অনেক স্থলে অনেক ভুল আছে। অনেক স্থলে হস্তলিখিত পুস্তকের সহিত ঐক্য নাই।

শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু, শ্রীরূপসনাতনের যে মতিচ্ছন্ন দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, কথাটা বড়ই নোংরা, সে সম্বন্ধে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যখন ছন্নমতি হয়, তখন নিজের দোষেই হয়। আমরা এক বিভাগে বাস করিয়া বেশ জানি, শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু, বাল্যকাল হইতেই চালাক চোস্ত। স্বভাব অতি নম্র, বুদ্ধি অতি প্রখর, সরল চিত্ত, লোকপ্রিয়, এবং গম্ভীর। কপাল এমনই জোর প্রথম অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়সে বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া, মেধা শক্তিবলে, যখন যে বিষয় পরীক্ষা দিয়াছেন, কখনও অনুত্তীর্ণ হন নাই। উচ্চশিক্ষায় রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তি দশ সহস্র টাকা এককালীন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছন্নমতিত্ব কখনও লক্ষিত হয় নাই, দেশেও তা প্রচার নাই। কিন্তু ম্লেচ্ছবিদ্যা বড় ভয়ঙ্করী। অসতীর সহবাসে সতী যেরূপ দুঃশীলা হয়, সেইরূপ অসৎ সহবাসে মন বিগড়াইয়া দেয়। যেরূপ নির্ব্বোধ মৃগগণ তৃষ্ণায় আকুল হইয়া জল পাইলে সুশীতল হইব, এইরূপ ইচ্ছা করিয়া, মরীচিকা ভ্রান্তে জীবনের জন্য জীবন হারায়, ভ্রান্তজীবগণও রমণীয় মরীচিকা স্থানীয় কুতার্কিকের কুহকীয় বাক্‌জালে পতিত হইয়া আপাততঃ সুখবোধে শেষে, "ইতঃভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট" অর্থাৎ দুকূলের বাহির হয়। ফলতঃ যিনি সুবোধ হন, তাঁহাকে ঔদ্ধত্য কখনই আক্রমণ করিতে পারে না। আমরা বেশ জানি, উমেশ বাবু বড়ই সুবোধ। কিন্তু, জগৎ পরিবর্ত্তন শীল ; মতিভ্রম হইতে কতক্ষণ। আমরা সহজ চক্ষে দেখিতে পাই, শৈশবের পরিধেয়, যৌবনে ব্যবহৃত হয় না। সেইরূপ শিক্ষা ও সঙ্গ দোষে অনেক স্থলে পৈতৃক রীতিরও পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে ? সে নজীর "হাতের নখ দর্পণে" প্রতিফলিত হইয়াছে দেখিয়া এখন আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমাদের (শুদ্ধ আমাদের কেন ? সকলের) পিতৃপিতামহাদিক্রমে ঈশ্বরের নাম লিখিবার কালে নামের পূর্ব্বে "শ্রীশ্রী" এবং মনুষ্যের নাম লিখিবার কালে "শ্রী" শব্দ বাঙ্গলায় লিখিবার রীতি নীতি আবহমান কাল হইতে প্রচলিত আছে এবং সকলেই তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। উহা দ্বারা ঈশ্বরের ও মনুষ্যের একটুকু ভেদাভেদ জ্ঞান হয়। কিন্তু অনীশ্বরবাদীরা তা মানে না। পরন্তু, বাঙ্গালীর ছেলে হইয়া (বিশেষতঃ পবিত্রকুলে জন্ম লইয়া) বাঙ্গলা লিখিবার কালে "শ্রীশ্রী" বা "শ্রী" শব্দটা ত্যাগ করা কি দোষের ও নাস্তিকতার পরিচয় নয় ? তবেই বলিতে হইল ;

> "যোধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
> ধ্রুবাণী তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেবহি ॥"

শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু "শ্রীশ্রী" বা "শ্রী" পাঠ ত্যাগ করিয়া লিখিয়াছেন।

(১) "চৈতন্য" রূপসনাতনকে যে এক খান পত্রলেখে, সেটা বড় নোংরা, তাহার উপমাটা 'চৈতন্যের' লেখা উপযুক্ত হয় নাই।

(২) "চৈতন্য" কতকগুলা মুণ্ডিতমস্তক কৌপীনধারী সহচর সঙ্গে যখন রামকেলী গ্রামে গিয়া হরিবোলের ধুয়া তুলে, সেই সময় মুসলমান দল ক্ষেপিয়া উঠে, হাঙ্গামা ও ব্রহ্মহত্যা হইবার যোগাড় হয়। শেষে রূপ সনাতন বেগতিক দেখিয়া চুপে চুপে চৈতন্যের নিকটে গিয়া তাহাকে স্থানান্তরে যাইতে বলে। তদনুসারে "চৈতন্য" নীলাচলে ফিরিয়া যায়।

(৩) চৈতন্যের ভক্তগণ যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছে, তাহা নিতান্ত খাপছাড়া, পরস্পর সামঞ্জস্য নাই এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বাহিরে সে সকলের প্রতিপত্তি নাই। বৃন্দাবন বৈষ্ণবদিগের একটা বিচিত্র জিনিস ইত্যাদি। এসকলের উত্তরে বলিব,

"জড়ে প্রভবতি প্রায়ো দুঃখং বিভ্রতি সাধবঃ।"

অর্থাৎ জড়ের প্রভাবে সাধুর দুঃখ হয়। তৈলকার ঠুলী দ্বারা বৃষচক্ষু রোধ করিলে কখন কি দিনরাত বোধ থাকে? পৃথিবীতে এমন জড় অনেক আছে। যাহার যেরূপ দৃষ্টিশক্তি, সে সেই ভাবেই বাহ্য বিষয় দর্শন করে। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে অসূয়া প্রকাশ করা বিজ্ঞ উমেশ বাবুর ন্যায় সরল বিশ্বাসীর উপযুক্ত হয় নাই, উহা সমাজনিন্দনীয়।

অনেকের ইহা বোধ আছে, যিনি অচেতন পদার্থকে চৈতন্য দেন, তিনিই শ্রীচৈতন্য নামে বিখ্যাত। তিনিই দুষ্কৃতজনের হস্ত হইতে সাধুদিগকে পরিত্রাণের নিমিত্ত যুগে যুগে অবতার রূপ ধারণ করেন। যথা;—

"পরিত্রাণায় সাধুনামিত্যাদি।"

ঈশ্বর অন্যান্য যুগে অসুর বিনাশের নিমিত্ত নানা অবতার হইয়া, অসুর বিনাশের কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু কলিযুগে অসুর বিনাশের কার্য্য নাই। সহিষ্ণুতা গুণই সমধিক; মার খাইয়া অযাচককে প্রেম দিয়াছিলেন, এজন্য দয়াল নামে বিখ্যাত।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে দলবল সমভিব্যাহারে রামকেলী গ্রামে গিয়াছিলেন, তাঁহার ভিতর কেহ ন্যাঙটা সন্ন্যাসী ছিল না। যাঁহারা সৃষ্টিস্থিতি, প্রলয় আর দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকর্ত্তা "সঙ্গোপাঙ্গ রূপে" সেই সমস্ত বীর্য্যবান পুরুষ সঙ্গে ছিলেন। শুদ্ধ এ যুগে নহে, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে ঈশ্বরের যখন যে কোন অবতারের প্রয়োজন, ঐ সকল সঙ্গের সঙ্গী সর্ব্বসময়ে তাঁহার সহচর রূপে অনুগমন করেন। কলিযুগে একমাত্র;

"হরে নামৈব কেবলং॥"

হরিনাম ব্যতীত জীবের অন্য গতি নাই। এজন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম প্রেম প্রচারার্থ রামকেলী গ্রামে গিয়াছিলেন, হাঙ্গামাকে ভয় করেন নাই, যে হরিনামের ধুয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাতে হাঙ্গামার কথা দূরে থাক্, কীট, পশু, পক্ষী, স্বপচ, যবন প্রভৃতি তন্নামে প্রমত্ত হইয়াছিলেন। এমন কি, স্বয়ং হুসেনসাহা তদ্দৃষ্টে আশ্চর্য্য হইয়া ঈশ্বর জ্ঞানে বলিয়াছিলেন;—

"কাজিবা কোটাল কিম্বা হউ যেই জন।
কিছু বলিলেই তার লইব জীবন॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

শ্রীগৌরাঙ্গ কি তদীয় সহচরবর্গের মহত্ত্ব আসুর প্রকৃতি ব্যক্তি মাত্রেই অতি অল্প জানে; এ কথা বিশ্ববিদিত। যথা;—

"দ্বৌ ভূত স গোলকোঽস্মিন, দৈব আসুর এবচ।
বিষ্ণু ভক্তি স্মৃতোদৈব, আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়॥"

(২) শ্রীচৈতন্য দেব, শ্রীরূপ সনাতনকে যে একটী প্রেমপত্রিকা লিখিয়াছিলেন, যাহার উপমাটা নোংরা বলিয়া উমেশ বাবুর নজরে ঠেকিয়াছে, বস্তুতঃ তাহা নোংরা নহে। বড়ই সদুপদেশ পূর্ণ এবং সুনীতি জড়িত। নৈতিক সমুদ্রমন্থনোত্থিত। এক দুর্লভ তত্ত্ব, ভাষা কথায় আছে;—

"সাপের হাঁচি বেদে বুঝে"

ব্রজবাসীগণেই ইহার বিশেষ তত্ত্ব জানেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন ;—

"এই প্রেম নৃলোকে না পায়"

তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু,

"পর ব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবা স্বাদয় ত্যন্তর্ন'ব সঙ্গ রাসায়ণং॥"

(৩) মহামহোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রবেত্তাগণ গ্রন্থে খাপছাড়া কথা লেখেন নাই। যাহা কিছু লিখিয়াছেন,তাহার সামঞ্জস্য ভাব রক্ষা করিয়াছেন, তবে অনেক স্থলে ;—

"সকলের গম্যনহে গদাধর তত্ত্ব।
অজ্ঞান অন্ধজনে না জানে মহত্ত্ব॥"

তাহার কারণ, ভক্তিশাস্ত্র বাহির সম্প্রদায়ে প্রতিপত্তি নাই। তা কেনই বা থাকিবে? গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ;—

"বিনয় করিয়া বলি, বৈষ্ণব গোঁসাই।
অবৈষ্ণবে গ্রন্থ কভু দেখাইবে নাই॥
পবাগুল গ্রন্থ অর্থ বুঝিতে নারিবে।
ভিন্ন অর্থ ঘটাইয়া, লোক হাসাইবে॥"

(৪) শ্রীবৃন্দাবন পৃথিবীর উচ্চ ভূমি, শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসস্থান। শাস্ত্রে আছে ;

"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।"

তাই, শ্রীবৈষ্ণবে ঐ তীর্থ বড় ভালবাসেন, ও ঐ স্থানে থাকিতেই অভিলাষ করেন। যদি তাহার কিছু মহত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা হয়, ঘরের কথা নয়, শাস্ত্রের কথা—বৈষ্ণবগ্রন্থ ভক্তিরত্নাকরে মথুরামাহাত্ম্য পাঠ করিলেই উমেশ বাবু তা বুঝিতে পারিবেন।

স্বদেশের কথা ;—

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

দ্বারকেশ্বর নদের উপকূলবর্ত্তী শ্রীপাঠ খানাকুল কৃষ্ণনগর। যেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সহচর শ্রীরামদাস শর্ম্মা নামান্তর শ্রীশ্রীপ্রভু অভিরাম গোস্বামী, যিনি ষোলসাঙ্গেরকাষ্ঠ একখানা বাঁশী করিয়াছিলেন, যাঁহার তেজপুঞ্জ প্রভাবে এক এক দণ্ডতে শত শত শ্রীবিগ্রহ মূর্ত্তি বিদীর্ণ হইয়াছিলেন ; যাঁহার জয়মঙ্গল চাবুক আঘাতে বড় বড় লোক সোজা হইয়াছিল, যিনি,শ্রীব্রজধামে শ্রীদাম নামে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সখা ছিলেন ; যাঁহার কীর্ত্তি সমূহ শ্রীচৈতন্য ভাগবতের পরিশিষ্টে এবং প্রেমবিলাস, নরোত্তমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর ও অভিরামচরিতে বিস্তারিত ব্যক্ত আছে ; যাঁহার স্থাপিত শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ এপর্য্যন্ত খানাকুল শ্রীপাঠে বিরাজ করিতেছেন, যে শ্রীপাঠ বৈষ্ণবের দ্বাদশ পাটের প্রধান ; শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু সেই মাতৃভূমির ক্রোড়ে বসিয়া একবার পুরাবৃত্ত অনুধাবন করিয়া দেখুন, তাহা হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কোন্ দেবতা এবং শ্রীরূপ শ্রীসনাতন কোন্ পদার্থ,তাহার প্রকৃততত্ত্ব জানিতে পারিবেন ; বেশীদূর যাইতে হইবে না।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগদ্‌গুরু,শ্রীমৎ সনাতন ও রূপ ছয়গুরুর প্রধান। আমরা বৈষ্ণবের দাসানুদাস এবং স্তাবক। ভারতবর্ষের বিখ্যাত নৈয়ায়িক শ্রীশ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম, বলিয়াছিলেন ;—

"শিরেবজ্র পড়ে যদি, পুত্র মরি যায়।
তথাপি প্রভুর নিন্দা, সহা নাহি যায়॥"

তাই ব্যথিত হৃদয়ে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে পাগলের ন্যায় যাহাকিছু বলিলাম, তাহাতে বিরক্ত বা ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ নাই। যদি শ্রুতিকটু হয়, আশাকরি, শ্রীযুক্ত উমেশ বাবু সাধুগুণে ক্ষমা করিবেন। অলমতি বিস্তরেণ। ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩০১।

বৈষ্ণবদাসদাসানুদাস
শ্রীহারাধন দত্ত, বদনগঞ্জ।

ইউরোপে দর্শন ও ধর্ম্মপ্রচার। (ভ্রম প্রদর্শন)

বহুদিন যাবৎ জয় নারায়ণ বাবু 'ইউরোপে দর্শন ও ধর্ম্মপ্রচার' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছেন। আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি যে, এপর্য্যন্তও কেহ তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হন নাই। রীতিমত প্রতিবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নয়; কয়েকটী মাত্র ভ্রম প্রদর্শন করিলেই বিজ্ঞ পাঠক বুঝিতে পারিবেন, জয়নারায়ণ বাবুর প্রবন্ধের মূল্য কি?

১। জয়নারায়ণ বাবু তাঁহার প্রবন্ধে খ্রীষ্টধর্ম্ম ও খ্রীষ্টকে যথেষ্ট আক্রমণ করিয়াছেন। আক্রমণের প্রধান ভিত্তি 'প্রতিভাঞ্জিলিয়ম' প্রভৃতি উপগস্পেল। এই সকল গ্রন্থের অন্য নাম (Pseudepigrapha) অথবা মিথ্যা গস্পেল (Spurious gospels) খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী এই সকল গ্রন্থকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন না। কে কি কারণে এই সকল গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, ইহার প্রকৃত তত্ত্ব কেহ অবগত নন। এই পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই কয়খানা মিথ্যাগস্পেল্ বাইবেলের চারি খানা গস্পেলের অনেক পরে লিখিত। কারণ ২৫০ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে একখানারও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ অসত্য এবং অজ্ঞাত লোকদের দ্বারা লিখিত গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া খ্রীষ্ট কিম্বা খ্রীষ্টধর্ম্মকে আক্রমণ করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত, বিজ্ঞ পাঠক তাহা বিচার করিবেন। এই সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, আমি সেই সম্বন্ধে কিছুই বলিবনা, কারণ, যাহার ভিত্তিই মিথ্যা, তাহার প্রতিবাদ করিয়া কি হইবে?

২। জয়নারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন "খ্রীষ্টোপাসকেরা ত্রিমূর্ত্তির উপাসক; যেহেতু ইহুদির একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন অপর ঈশ্বরের পূজা বা মান্য করা নিষেধ।

I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage, thou shalt have no other gods before me.

Exodus XX. 2, 3.

* * *। ইহুদিদিগের এক ঈশ্বর ভিন্ন অপর ঈশ্বর নাই। হোলিঘোষ্ট, ইহুদি শাস্ত্রের কি বিপরীত মত নহে?" (নব্যভারত ১০ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা) এখন দেখা যাউক, এই কয়টী মাত্র কথাতে তিনি কি কি ভুল করিয়াছেন?

(ক) খ্রীষ্টিয়ানগণ তিন মূর্ত্তির উপাসনা করেন, এরূপ অসত্য কথা তাঁহার প্রবন্ধে দেখিতে আশা করি নাই। লোকে নিজের মত দাঁড়া করাইবার জন্য কিনা করিতে পারে? খ্রীষ্টিয়ানগণ এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। কিন্তু একই ঈশ্বরে তিন ব্যক্তিত্ব অথবা ত্রিত্ব (Trinity) বিশ্বাস করেন। ত্রিত্বের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যদি সুযোগ হয়, বারান্তরে কিছু বলিতে পারি। সম্প্রতি জয়নারায়ণবাবু যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য কিনা, তাহাই দেখাইব!

(খ) জয়নারায়ণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাব এই যে, ঈশ্বরে একাধিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে ইহুদির বিশ্বাস খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের অনুরূপ নহে বরং বিপরীত। দেখা যাউক, একথা সত্য কিনা? বাইবেলের ১ম অধ্যায়ে আছে;—

And God said Let *us* make man in *our* image, after *our* likeness. (Genesis 1.26.)

ঈশ্বর 'us' এবং 'our' প্রভৃতি বহুবচন শব্দ ব্যবহার করিতেছেন; এবং Genesis কি ইহুদি শাস্ত্র নয়? বাইবেলের ১ম পৃষ্ঠা ভাল করিয়া না পড়িয়াই এরূপ মত প্রকাশ

করা কি ঠিক হইয়াছে? এ অধ্যায়ে ১ম পদে আছে;—

In the beginning God created the heaven and the earth. (Gen. I. 1.)

'God' শব্দটী হিব্রু Elohim শব্দের অনুবাদ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। হিব্রুভাষাতে Elohim বহুত্বব্যঞ্জক, অথচ ইহার ক্রিয়া একবচনান্ত হয়। ইহাতে কি ইহুদির বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া গেল না? খ্রীষ্টিয়ান ও ইহুদি উভয়ই বিশ্বাস করেন,ঈশ্বর এক; কিন্তু তাঁহাতে তিন ব্যক্তিত্ব, তাই Elohim শব্দ তাই বহুবচনান্ত 'us'এবং 'our' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

(গ) তিনি বলিয়াছেন, পবিত্র-আত্মা ইহুদি শাস্ত্রের বিপরীত মত। পবিত্র-আত্মা বলিতে ঈশ্বরের আত্মাকে বুঝায়, সকলেই বোধ হয় ইহা জানেন। দেখা যাউক,পবিত্র-আত্মা ইহুদিশাস্ত্রের বিপরীত মত কিনা? বাইবেলের ১ম পৃষ্ঠার ৫ম পংক্তিতে আছে;—

And the Spirit of God moved upon the face of the waters. (Genesis I. 2.)

আবার জিজ্ঞাসা করি Genesis কি ইহুদির শাস্ত্র নয়? শুধু একবার নয়,ঈশ্বরের আত্মা পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে Old Testament এ অনেক স্থানেই আছে। আমার বিশ্বাস জয়নারায়ণ বাবু বাইবেল না পড়িয়া,অন্যের কথা শুনিয়াই প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ কথার সত্যতা ক্রমশঃ আরও দেখিতে পাইবেন।

৩। জয়নারায়ণ বাবু বলিয়াছেন "মথি এবং লুক স্বর্গীয় দূতের বিষয় বর্ণনা করিয়া ছেন। তাহাদের মধ্যে অসংলগ্ন দোষ আছে। মথি দূতের নাম নির্দ্দেশ করেন নাই। লুক বলিয়াছেন, ঐ দূতের নাম গেব্রিয়েল। মথি লিখিয়াছেন, দূত যোষেফের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, লুক বলেন,দূত মেরীকে দর্শন দিয়াছিলেন। মথি বলেন, যোষেফের স্বপ্নাবস্থায় দূত তাহাকে দর্শন দেন। লুক বলেন, জাগ্রত অবস্থায় দূতের সহিত মেরীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মথির প্রমাণে প্রতীয়মান হয়, মেরীর গর্ব্ভে যিশুর অবতীর্ণ হইবার পর দূত যোষেফের সহিত সাক্ষাৎ করেন। লুক বলেন, মেরীর গর্ব্ভ হইবার পূর্ব্বে দূত তাহার নিকট আগমন করেন। মথির গ্রন্থানুসারে সপ্রমাণ হইয়াছে,মেরীর গর্ব্ভ হেতু ব্যথিত যোষেফকে প্রবোধ দিবার জন্য দূতের আগমন হইয়াছিল; লুকের লিপির মর্ম্ম লোকসমাজে মেরীর কলঙ্কঘোষণা নিবারণ জন্য দূত আবির্ভূত হন। সত্যের জন্য উভয়েই দায়ী,কাহার কথা বিশ্বাস্য?" (ন, ভা ১০ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা)

এ ঘটনাটিও কি জয়নারায়ণ বাবু বুঝিতে পারেন নাই? দুটী ঘটনাকে একটী ঘটনা মনে করিয়া তিনি ভ্রমে পড়িয়াছেন। মথি যে ঘটনাটির কথা লিখিয়াছেন, লুক তাহা লিখেন নাই। তিনি অন্য ঘটনার বিষয় লিখিয়াছেন। জয়নারায়ণ বাবু বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া কি মথি এবং লুক অসংলগ্ন দোষে দোষী হইবেন?

৪। জয়নারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন "খ্রীষ্টের বহুকাল পূর্ব্বে দায়ূদবংশ অবমুষ্টদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল।" ইহার প্রমাণ চাই। প্রমাণ ভিন্ন কথা মানিব কেন? তিনি রেনানের দোহাই দিয়াছেন। রেনান বলিয়াছেন "The family of David, *as it seems*, had been long extinct." (Italics আমাদের) এখন জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা যিশুর সঙ্গে ছিলেন, যিশুর নিজের মুখের কথা শুনিয়াছেন,তাঁহাদেরই কথা বিশ্বাস করিব,না, দুই সহস্র বৎসর পরে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া যিনি

তাঁহাদের প্রতিবাদ করিলেন, তাঁহার কথা বিশ্বাস করিব? ইহুদি বংশাবলী সম্বন্ধে ইহুদির কথা বিশ্বাস করিব, না, দূরদেশস্থ ফরাসী পণ্ডিতের কথা বিশ্বাস করিব? জয়নারায়ণ বাবু বলিয়াছেন, ফরাসী পণ্ডিত রেনানের মতে খ্রীষ্ট রাজবংশীয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহা প্রাচীনগণের চাতুরী এবং রেনান হইতে এই কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন;—

"Never does he designate himself as son of David. The title son of David was the first which he accepted probably without being concerned in the innocent frauds by which it was sought to secure it to him."

'Probably without being concerned in the innocent fraud.'

এস্থলে Probably শব্দের অর্থ কি? সাধারণ জ্ঞানে যতদূর বুঝি Probably শব্দে দুই দিকেই সম্ভাবনা বুঝায়, অর্থাৎ ইহাতে যেমন '*not* concerned in the innocent fraud' বুঝায়, তেমনই *Concerned* in the innocent fraud ও বুঝায়, অর্থাৎ দুইদিকেরই সমান সম্ভাবনা। কি ভয়ানক কথা! বিজ্ঞ পাঠক যিশু সম্বন্ধে কি কখনো এ কথা বিশ্বাস করিতে পারেন? প্রাচীনগণের চাতুরীই বা কোথায়? রেনান উদ্ধৃত অংশে স্বীকার করিয়াছেন, খ্রীষ্ট 'দায়ূদের সন্তান' এই আখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে আবার রেনান কি করিয়া বলিতেছেন, জয়বাবুই বা কি প্রকারে বলিতেছেন, খ্রীষ্ট দায়ূদের সন্তান বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন নাই—যদি অন্যথা আখ্যা হইত, তবে কি তিনি ইহার প্রতিবাদ করিতেন না? Innocent fraud কাহাকে বলে, জানি না। যিনি বলিলেন "আমিই সত্য" তাঁহার নিকট Fraud আবার innocent হইল? Innocent fraud এ যে লজিক বিরুদ্ধ কথা, নির্দ্দোষ বলিলে আর প্রবঞ্চনা বলিবেন না, প্রবঞ্চনা বলিলে আর নির্দ্দোষ বলিবেন না। নির্দ্দোষ প্রবঞ্চনা অসম্ভব। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি ফরাসী পণ্ডিত রেনান ও জয়বাবুর এসম্বন্ধে নিশ্চয় জ্ঞান থাকে, তবে নিশ্চয়ার্থক শব্দ ব্যবহার না করিয়া Probably এবং as it seems প্রভৃতি পদের ব্যবহার কেন? যিশু দায়ূদের বংশোদ্ভব, এই সম্বন্ধে যদি সংশয় থাকে, তবে এই গ্রন্থগুলি দেখিবেন। Eusebius bk. I c 7 & bk. III c 20 এবং La Histoire de la Palestine by Derenbourg P. 349 এবং Kitto's Biblical Encyclopædia.— মেরী বেৎলিহেমে গিয়াছিলেন, জয়নারায়ণ বাবু ইহা বিশ্বাস করেন না। এবারও জিজ্ঞাসা করি, অবিশ্বাসের কারণ কি? তিনি নিজেই বলিয়াছেন, রোমক রাজনীতি অতীব প্রশংসনীয়। তাহারা যে দেশ জয় করিত, সেই বিজিত দেশের কোন প্রকার জাতীয় বিষয়ে তাহারা কখনই হস্তক্ষেপ করিত না। মেরী এবং যোষেফ এক বংশোদ্ভব। কাজেই উভয়েরই পৈত্র্যাবাস দায়ূদের নগর (City of David) বেৎলীহেম। Grotius বলিয়াছেন—

"The custom of the Jews was that a census should be made by tribes, houses, and families. But this, after the many revolutions and changes the Jews had suffered, could not be done, except by each person going to the place to which his ancestors had belonged."

রোমক রাজনীতি কি এই জাতীয় প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছিল? জয়নারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন "অল্‌সেন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বেৎলিহেমে মেরীর পৈতৃক সম্পত্তি ছিল।" ইহা অবিশ্বাস করিবার কি কোন কারণ আছে? যদি থাকে, সেই কারণ জানিতে চাই। মেরী গর্ভবতী এটীও বেৎলিহেমে যাইবার দ্বিতীয় কারণ। কেন না যোষেফকে যাইতে হইবেই। মেরীর প্রসবকাল সন্নিকট।

তাঁহাকে এ অবস্থায় তিনি কাহার নিকট রাখিয়া যাইবেন? তাই দরিদ্র যোষেফ নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। এ সকল যুক্তি বিশ্বাস না করিতে হয় না করুন, কিন্তু নরিয়ম বেৎলিহেমে গিয়াছিলেন, ইহা অবিশ্বাস করিবার স্পষ্ট কারণ জানিতে চাই।

৫। নক্ষত্র সম্বন্ধে জয়বাবুর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি বলেন "মনুষ্যের নক্ষত্র সহ তুল্য গতি, একথা আমি বিশ্বাস করি না।" এ কথা আমিও বিশ্বাস করি না। কিন্তু জিজ্ঞাস্য যে, কে বলিল জ্ঞানী লোকেরা "নক্ষত্র সহ তুল্য গতিতে" বেৎলিহেমে গিয়াছিলেন? বাইবেলে আছে—

"And, lo, the star which they saw in the east went before them till it came and stood over where the young child was."

নক্ষত্র তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে গিয়াছিল, অথবা জ্ঞানী লোকেরা নক্ষত্রের অনুগমন করিয়াছিল। 'অনুগমন' এবং 'তুল্য গতি' এক কথা নহে। নক্ষত্র যত দ্রুত গতিতেই যাউক না কেন, যতক্ষণ দৃষ্টির বহির্ভূত না হয়, ততক্ষণ আমি অনুগমন করিতে পারি। বেৎলিহেম যিরুশালেমের এত নিকটবর্ত্তী যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে নক্ষত্র কোন প্রকারেই জ্ঞানীলোকদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে পারে না। একটী বিশেষ নক্ষত্র এই সময় উঠিয়াছিল কি না, সে সম্বন্ধেও জয়নারায়ণ বাবু সন্দেহ করিয়াছেন। সন্দেহের কারণ কিছুই বলেন নাই। কিন্তু Wieseler মুস্তরের বিজ্ঞাপন হইতে দেখাইয়াছেন :—

"The astronomical tables of the Chinese actually record the appearance, for seventy days, of a *new star* in 750 (রোমীয় শকাব্দ) and this is corroborated by Humboldt (Kismos Vol 1 p. 389 and III P. 561) and by the astronomer Pingre (Cometsgraphietom I P. 287) who calls this *new star* a comet and records the appearance of two comets—one in February and March, 749, and the other in April 750 (Wieseler pp. 61,62)."

এরূপ ক্ষণস্থায়ী নক্ষত্রের কথা হর্শেলও উল্লেখ করিয়াছেন। তায়কোব্রাহি ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নবেম্বর এরূপ একটী নক্ষত্র দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন (Herschel's astronomy P. 383) কেপ্লারও এই নক্ষত্রোদয় বিশ্বাস করিতেন। এই সকল লোকদের সাক্ষ্যই বিশ্বাস করিব, না জয়নারায়ণ বাবুর অনুমানই বিশ্বাস করিব?

নক্ষত্র সম্বন্ধে জয়বাবু বলেন যে, 'নক্ষত্রটীর ব্যাস কি বাস্তবিক এত ক্ষুদ্র যে, শিশুটী যে স্থানে ছিলেন, তারাটী ঠিক তাহার উপরে স্থগিত হইয়া রহিল? ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?' জয়নারায়ণ বাবু ইহা বুঝিতে পারেন নাই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। দুই রকম ভাষা আমরা ব্যবহার করি। বৈজ্ঞানিক ভাষা এবং দৃষ্টির অনুরূপ ভাষা (Language of appearance)। "সূর্য্য উদয় হয় বা অস্ত যায়" ইহা দৃষ্টির অনুরূপ ভাষা, অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিতে যেরূপ বোধ হয়, ভাষাতে তাহাই প্রকাশ। কিন্তু বিজ্ঞান মতে 'সূর্য্য পূর্ব্ব দিকে উদয় হয় বা পশ্চিমে অস্ত যায়' প্রভৃতি ভাষা কি সত্য? কখনই না। অথচ জয়নারায়ণ বাবু কি এরূপ ভাষা ব্যবহার করেন না? পক্ষান্তরে "সূর্য্য উদয় হইলে" না বলিয়া সেই স্থলে বিজ্ঞানমতে যদি বলি "পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে আমাদের দেশ সূর্য্যের সম্মুখীন হইলে" তবে কি আমরা উপহাসাস্পদ হইব না? এখন বিজ্ঞ পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, জয় বাবু কেবল দৃষ্টির অনুরূপ ভাষা না বুঝিয়াই নক্ষত্রের ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন।

৬। জয়নারায়ণ বাবু বিশ্বাস করেন যে, মেরী যিশুর জন্মের পরও কুমারী ছিলেন। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর রাখিয়া তিনি

বুদ্ধমাতা মায়ার সহিত মেরীর উপমা দিয়াছেন। তাঁহার মত সমর্থন করিবার জন্য তিনি যিহিস্কেল (Ezekiel) ৪৪ অধ্যায়ের ২য় পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন; এবং এই পদ হইতে তিনি মনে করেন, খ্রীষ্টির শাস্ত্র বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। দেখা যাউক, কথাগুলি কত দূর সত্য। যিহিস্কেলের পদটী যে মেরী সম্বন্ধে নয়, মনোযোগের সহিত ঐ অধ্যায়টী পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যায়। এই পদটী যদি প্রকৃত পক্ষে মেরী সম্বন্ধেই লিখিত হইয়া থাকে, তবে যে বৌদ্ধ শাস্ত্রই খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের অনুকরণ হইয়া পড়ে। যিহিস্কেল খ্রীষ্ট জন্মের ৫৭৪ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইযাছিল। বৌদ্ধের জন্ম এবং বৌদ্ধশাস্ত্র ইহার পরে লিখিত হয়। এখন দেখা যাউক, যিশুর জন্মের পরেও মেরী কুমারী ছিলেন কি না। যে যাহাই বলুক না কেন, আমরা শুধু বাইবেলই বিশ্বাস করি; বাইবেলে আছে—

"Joseph knew her not till she had brought forth her firstborn son (Matt I. 25)

পাঠক, এখন till এবং firstborn son এই দুটী কথার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবেন। Till শব্দে এই বুঝায় যে, যদিও মেরী স্বামীস্ত্রীরূপে থাকেন নাই, তবু প্রথমজাত পুত্র হইলে পর তাঁহারা স্বামীস্ত্রীরূপে একত্র থাকিতেন। "প্রথম জাত" (first born) শব্দে কি দ্বিতীয়ের অস্তিত্ব বুঝায় না? দ্বিতীয় না থাকিলে আবার প্রথম কি?

৩। আর একটীমাত্র ভ্রম দেখাইয়াই আমি নিরস্ত থাকিব। জয়নারায়ণবাবু বলিয়াছেন, "ইহুদির হোলিঘোষ্ট বিশ্বাস ইহুদীয় শাস্ত্রের বিপরীত কিনা? * * * পালিষ্টিনে কোন্ সময় হইতে হোলিঘোষ্ট বিশ্বাস প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল? বাইবেলের প্রমাণ এস্থলে উল্লেখ করি;—

"Paul having passed through the upper coasts came to Ephe sus, and finding certain disciples he said unto them, have ye received the Holy Ghost since ye believed? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost" (Acts XIX 1,2.)

জয়নারায়ণ বাবুর প্রবন্ধের এই স্থানটী পড়িতে পড়িতে বহুদিন হইল সুবিজ্ঞ ব্যারিষ্টার এ, চৌধুরী মহাশয় Concord পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই মনে পড়িল। তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার ভাব এই—"আমার সমপাঠীদের মধ্যে যাঁহারা দুইয়ে দুইয়ে যোগ করিলে কত হয় জানিতেন না, যিরুশালেম বা জেমিকা কোথায় তাহা যাঁহারা অবগত ছিলেন না, আজ কাল তাঁহারাই সংবাদ বা সমালোচন পত্রের লেখক।" কেন এ কথাটী মনে পড়িল, পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। বাইবেলের যে অধ্যায় হইতে জয়নারায়ণ বাবু উল্লিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে অধ্যায়ের ৭ম পদ পড়িলেই জানা যায় যে "সেই লোকেরা সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় *দ্বাদশজন পুরুষ ছিল" (Acts XIX. 7)* এই বার জন লোকে পবিত্র-আত্মা সম্বন্ধে শোনে নাই বলিয়াই কি মানিব পালিষ্টিনে "হোলি ঘোষ্টবিশ্বাস প্রবর্ত্তিত" হয় নাই? পৌল তবে পবিত্র-আত্মা সম্বন্ধে কোথা হইতে জানিলেন? যিশুর অন্যান্য শিষ্যেরাও ত জানিতেন। যোহন অবগাহন ও প্রচার করিবার সময় সহস্র সহস্র ইহুদিকে বলিয়াছিলেন, "তিনি (যিশু) তোমাদিগকে পবিত্র আত্মাতে অবগাহিত করিবেন"। তবুও কি বলিব "হোলিঘোষ্ট বিশ্বাস পালিষ্টিনে প্রবর্ত্তিত ছিল না? পূর্ব্বে একবার দেখাইয়াছি, ইহুদিশাস্ত্রের প্রথম পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের ৫ম পংক্তিতে "ঈশ্বরের আত্মা" সম্বন্ধে কথা আছে (Gen. I. 2) তবুও কি বলিব ইহুদিরা পবিত্র

আত্মার কথা জানিতেন না? তবে ইফিষের (Ephesus) বার জন লোক এ কথা বলিল কেন?

জয়নারায়ণ বাবু যে মহাভ্রমে পড়িয়াছেন। কোথায় বা ইফিষ কোথায় বা পালিষ্টিন! ম্যাপ খানা খুলিয়া দেখিয়া এই প্রবন্ধটী লিখিলে কি ভাল হইত না? কোথায় বা স্মার্ণার নিকটস্থ ইফিষ নগর, কোথায় বা পালিষ্টিন। কোথায় বা জেনটাইল, কোথায় বা ইহুদি। কাবুলের দোষের জন্ত কলিকাতার লোক দায়ী! তাই বলিয়াছিলাম, বারিষ্টার এ, চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধের কথা মনে পড়িল। এরকম না জানিয়া না বুঝিয়া প্রবন্ধ লিখার ফল কি? বিজ্ঞ পাঠকগণ এখন বিচার করিয়া, দেখিবেন, জয়নারায়ণ বাবুর প্রবন্ধের মূল্য কত? শ্রীবিমলানন্দ নাগ।

ফুলের বিবাহ।

একদিন নিদাঘ কালে যখন প্রখর সৌরতাপে বঙ্গদেশ দগ্ধ হইতেছিল, মধ্যাহ্নাহারের পর মস্তক ন্যস্ত করিয়া সমুদ্র-সৈকতে কোন গৃহে বিশ্রাম করিতেছিলাম। তপনদেবের তীব্র রশ্মি বারিনিধির সংসর্গে শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল। নাতিশীতোষ্ণ দক্ষিণমারুতকে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া সরিৎপতিও লহরী তুলিয়া ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। কল্লোলমালার শুভ্র দীপ্তিতে দৃষ্টি সন্তপ্ত হইতেছিল। এজন্য সম্মুখে একখানি বহি ধরিলাম। দেখিলাম, একখানি কবিতাপুস্তক, বঙ্গ-কুলীনকুমারীর দুঃখে কবি বলিতেছেন ;—

"অই শুকালো মুকুল
ও নয় হৃদয়ানন্দা, গোলাপ রজনীগন্ধা
ও নয় চামেলী, বেলী, মালতী, বকুল।"

পড়িতে পড়িতে মনে হইল, বঙ্গ-কুলীনকুমারী অপেক্ষা চামেলী বেলী বাস্তবিক সুখী না দুঃখী? এইরূপ অদ্ভুত ভাব মনোমধ্যে উদিত হইতেছিল, ইহার কত পরে মনে নাই, —দেখিলাম, কোন যেন অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন দেশে আসিয়াছি। সে দেশে কেবলগাছ। দেখিলাম, কোথাও বট অশ্বত্থ পর্কটি প্রভৃতি বিশাল শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, কোথাও তাল নারিকেল গুবাক প্রভৃতি শিরঃ উন্নত করিয়া রাখিয়াছে; কোথাও মন্দার কিংশুক শাল্মলী প্রভৃতি নবপল্লবে দেহ সুশোভিত করিতেছে; কোথাও কহ্লার কুবলয় কোকনদ প্রভৃতি দীর্ঘিকার জলে ক্রীড়া করিতেছে; কোথাও নাগকেশর বকুল, কোথাও মল্লিকা যূথী জাতি কুন্দ গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করিয়াছে; কোথাও মাধবী মালতী অপরাজিতা লতাইয়া লতাইয়া উপরে উঠিতেছে। যে দিকে চক্ষু ফিরাই, সেই দিকেই দেখি, অসংখ্য বৃক্ষলতা তৃণগুল্মে দেশ পরিপূর্ণ। চারিদিকে কত ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, কত ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে, কত ফুল 'ফোট ফোট' হইয়া আছে। কত ফুল পবনের ধীর পদক্ষেপ ও মধুকরের ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতেছে। সেখানে ফুলের রাজ্য, গ্রাম; ফুলের জনপদ, পরিবার। সেখানে ফুলে ফুলে কলহ হইতেছে, ফুলে ফুলে জীবন-সংগ্রাম ঘটিতেছে, ফুলে ফুলে সম্ভাষণ চলিতেছে।

বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে চারিদিক্ অবলোকন করিতেছি, এমন সময় অকস্মাৎ দেখিলাম, প্রৌঢ়া দীনভাবাপন্না বঙ্গ-কুলীন-কুমারীর ন্যায় চামেলী সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার মনের ভাব যেন বুঝিতে পারিয়াছে, তাই বলিতে লাগিল "তোমরা ও আমরা পৃথিবীতে এত দিন

একত্র বাস করিতেছি, আমাদিগকে চিনিলে না? একত্রে বাস করিলে যে সহানুভূতি জন্মে, তাহাও কি তোমাদের নাই? তোমরা নিজেদের কুলীন-কুমারীর দুঃখে ব্যথিত হইতেছ এবং আমাদিগকে না জানি কতই সুখে সুখী ভাবিয়া বলিতেছ—"ও নয় কুমুদ পদ্ম প্রাণময় ফুল।"

এই কথা শুনিয়া আমার কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। ভাবিলাম, বাস্তবিক কি ফুলের আবার একটা বিবাহ আছে, তাহাদের আবার কুলীন-কুমারী আছে? চামেলি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—"আমাদের রাজ্য বেড়াইয়া আইস। তাহা হইলে বলিবে যে, 'তুইও একজন জগতের তরে, এ বিশ্বজগত তোরও লাগি।' তাহা হইলে দেখিবে যে, ফুলরাজ্যের মধ্যে আমরা কত দুঃখী।"

সেই দিকে চলিয়া গেলাম। সেখানে দেখিলাম, যাহাকে পরাগকেশর বলিয়া জানিতাম, সে গুলি পুরুষপুঙ্গ, গর্ভকেশর গুলি রমণী, ফুলের পাপড়িগুলি পুরুষ রমণীর বসন ভূষণ, শাখা প্রশাখাগুলি জনপদ, পুষ্পবৃন্তগুলি এক একটি ঘর মাত্র। আমার চক্ষে ফুল আর ফুল রহিল না। দেখিলাম, ফুলগুলি এক একটি প্রেম অবতার, প্রণয়ী প্রণয়িনীর মূর্ত্তিমাত্র। সে প্রেমে পবিত্রতা সরলতা আছে, সে প্রেমে স্বার্থত্যাগ আত্মনাশ আছে। আবার, সে প্রেমে কটাক্ষ আছে, যৌবন তরঙ্গের লীলা আছে, সে প্রেমে কুহক আছে। দেখিলাম, যেমন মানব হৃদয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্বেগ প্রভৃতির লক্ষণ দেখিয়া তৎসমুদায় অপর প্রাণীর অনুমিত হয়, যেমন চিত্রাঙ্কিত নরনারীর হাব ভাব বসন ভূষণ আকার ইঙ্গিত দেখিয়া তাহাদের নিভৃত মনোগহ্বরের উদ্দাম ভাবনিচয় প্রতীয়মান হয়, ফুলেও তেমনই লক্ষণ বর্ত্তমান। অবগুণ্ঠনবতী তিল ফুলের ব্রীড়া, বা যৌবনোন্মুখী মাধবীর হাস্যচ্ছটা, বা গর্ভ-ভার-পীড়িত জবাকুসুমের ম্লান ও পাণ্ডুর বর্ণ দেখিলে তাহাদের মনোভাব বুঝিতে বাকী থাকে কি?

দেখিলাম ফুলরাজ্যে জন্মবর্দ্ধন পুষ্টি মরণ, যত কিছু কার্য্য আছে, সমুদায়েরই উদ্দেশ্য বিবাহ-সম্পাদন। বিবাহের জন্যই জনপদ, বিবাহের জন্যই ঘর বাড়ী রচনা, বিবাহের জন্যই হরিদ্-বর্ণ পত্র রূপ অন্নবন্ধন শালা, বিবাহের জন্যই প্রকাণ্ড-মহীরুহগণ ক্ষুদ্র তরু সকলকে নিপীড়িত করিতেছে, বিবাহের জন্যই লতা সকল বলিষ্ঠ বৃক্ষ সকলকে আলিঙ্গন করিয়া উঠিতেছে।

অধিকাংশ ফুলের এক গৃহে পুরুষ রমণীর বাস দেখিয়া ফুলরাজ্যে সম্বন্ধিত্ব বিষয়ে কিছু সন্দিহান হইলাম। ভাবিলাম, একই বাড়ীর ছেলে মেয়েরা পরস্পর পরস্পরকে বিবাহ করে কি? অলক্ষিত ভাবে চামেলি যে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল, তাহা আমার জানা ছিলনা। ঘৃণা ব্যঞ্জক স্বরে চামেলি বলিতে লাগিল"—আমাদিগকে কি এতই নিকৃষ্ট মনে করিতেছ? তোমরা যে রাজার শাসনে থাকিয়া সম্বন্ধিত্ব জ্ঞানের পরিচয় দিতেছ, সে রাজার শাসনে আমরাও কি শাসিত নই? এক রাজার কি দুই রকম নিয়ম হইতে পারে?"

এই কথাগুলি শুনিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইলাম। উত্তমরূপ না জানিয়া কোন কথা মনে করিলেও যে পাপ হয়, তদ্বিষয়ে আমার বেশ্ শিক্ষা হইল। অধোবদনে বিবাহের পদ্ধতি অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। গুড়ুচি (গুলঞ্চ লতা), গঞ্জা, পেঁপে প্রভৃতি অনেক জাতির পুরুষ ও রমণীগণের ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষ-রূপ পল্লীতে জন্ম হয়,

লাউ কুমড়া তাল খেজুর এরণ্ড প্রভৃতি জাতির পুরুষ রমণীর এক পাড়ায় জন্ম হইলেও তাহারা এক মায়ের গর্ভে জন্মে না। হরীতকী বাদাম প্রভৃতি জাতির এক মায়ের পুত্র কন্যা জন্মিলেও শৈশবাবস্থায় কন্যার কিম্বা পুত্রগণের মৃত্যু হয়, কাহারও কাহারও কন্যা কিম্বা পুত্রগণকে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বিকৃত অবস্থায় জীবন যাপন করিতে হয়। সুতরাং এই সকল স্থলে আমার পূর্ব্বোক্ত সন্দেহের কোনও লক্ষণ বর্ত্তমান দেখিলাম না।

ইহাদের যেন নাই থাকিল, জবা অপরাজিতা ধুস্তুরা প্রভৃতিও অসংখ্য জাতি আছে। এক বৃন্তে তাহাদের ত অনেক পুত্র ও কন্যা জন্মিয়া থাকে। চামেলির ভর্ৎসনার ভয়ে প্রথমে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, তাহাদের ভাই ভগ্নীর পরস্পর বিবাহ প্রথা নাই। কোন কোন উচ্ছৃঙ্খল পুরুষ অন্যের চক্রান্তে পড়িয়া ভ্রমক্রমে সেই ফুলের রমণীর প্রেমে আসক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে রমণীর অকালে বার্দ্ধক্য ও জরা উপস্থিত হইয়াছিল, কাহারও বা বিবাহের উদ্দেশ্য পুত্রোৎপাদন ঘটে নাই। কোন কোন স্থলে এইরূপে পুত্র জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা এত হীনবীর্য্য ও ক্ষীণদেহ হইয়াছিল যে, তাহাদের বংশ রক্ষা হয় নাই। অন্যের চক্রান্তে পড়িয়া অনেক ফুলকুমারীর প্রাণান্ত হইয়াছে এবং যাহাতে এ বিপদে কখনও না পড়িতে পারে, এজন্য অনেক ফুলবধূ নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। দুই একটি কৌশল যাহা দেখিলাম, পরে বলিতেছি।

ফুলের বিবাহের ঘটক কে, ইহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, এক দিকে কোন কোন ফুলকুমারী পবনে গা ভাসাইয়া নৃত্য করিতেছে, কেন না স্বামী সমাগমের আশা হইয়াছে। কুসুম, কুমারীর বর সঙ্গে লইয়া পবনদেব আসিতেছেন, সে আনন্দে অধীর হইবে না ত কি? এই সকল ফুলকুমারীর বসন ভূষণের প্রতি মনোযোগ নাই। কেবল পবন দেবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মুখ বাড়াইয়া থাকে। ইনি অসংখ্য বর লইয়া নগরে আসিয়াছেন, যে বর যাহার মনোমত হয়, সে তাহাকে লইতেছে। দুই একটা ভিন্ন জাতীয় বর, পবনের ত্বরিত গমনে কোন কোন ফুলকুমারীর গায়ে গিয়া পড়িতেছে, কিন্তু তাহাতে ফুলকুমারীর দৃক্‌পাত নাই। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। বঙ্গকুলকামিনীর ন্যায় কুসুমকুমারীগণ ঘরের বাহির হন না। বঙ্গকুলীনকামিনীর ন্যায় কোনও কুসুমকামিনী স্বামীর ঘর করিতে যান না। সকল জামাতাই শ্বশুর গৃহে বাস করেন।

আর এক দিকে দেখিলাম, কোন কোন কুসুমকুমারী পতঙ্গকে ঘটক নিযুক্ত করিয়াছে। ভ্রমর বড় লোলুপ। মধু না পাইলে সে ঘটকালি করিতে চায় না। কাজেই কুসুমকুমারীকে ভাণ্ডারে মধু সঞ্চয় করিতে হইয়াছে। ওদিকে কোন কোন পতঙ্গ কেবল মধুতেই তৃপ্ত নহে। আতর গোলাব দিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিতে হয়। পাছে পতঙ্গের দিগ্‌ভ্রম ঘটে, পাছে সে বর লইয়া অন্য গৃহে প্রবেশ করে, এজন্য অনেক ফুলকুমারী বিচিত্র বর্ণ চারু বসনে স্বীয় দেহ আবৃত করিয়াছে। লোকে বলে, ফুল ফুটছে বলিয়া গরবে আটখানা হয়, ফুটছে বলিয়া চারিদিকে সুষমা ছড়াইয়া সকলকে সুখী করে। কিন্তু দেখিলাম যে, স্বার্থ ব্যতীত তাহার কোন দিকে দৃষ্টি নাই, বিবাহ ব্যতীত কোন উদ্দেশ্য নাই, নচেৎ জন্ম যে বৃথা হয়। বাস্তবিক, কোন

কুসুমের ভাণ্ডারে মধু এবং বসনের পারিপাট্য, উজ্জ্বল বর্ণ ও সুগন্ধ দেখিলে তাহার পরহিত-ব্রত অলীক বকব্রত বলিয়া ধ্রুব বিশ্বাস হইতে লাগিল।

যে সকল বর জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য কন্যার পাড়ার দূরে বাস করে, পতঙ্গের ঘটকালি তাহাদের নিতান্ত আবশ্যক। মধু না থাকিলে বরের ঘরে পতঙ্গ আসিবে কেন? আর পতঙ্গ না আসিলেই বা পথ দেখাইয়া কন্যার ঘরে বরকে লইয়া যায় কে? এজন্য কোন কোন বরও ঘরে যৎকিঞ্চিৎ মধু রাখে। কোন কোন বরের দুই একটি ভগ্নী থাকে। ইহারা মধু সঞ্চয় করিয়া দিয়া নিজেরা রুগ্ন বা বিকৃত হইয়া পড়ে। এজন্য ইহাদের কখনও বিবাহোপযুক্ত যৌবন হয় না। এই মধুর সদ্ব্যবহার দ্বারা বর পতঙ্গের পিঠে চড়িয়া কন্যার অন্বেষণে বহির্গত হয়। পবনদেব পতঙ্গের মত লোভী নহেন। পবনের অভাব কি, একটু মধুর জন্য স্বীয় ঔদার্য্য খর্ব্ব করিতে চায় কে? ফুলকুমারী এ কথা পূর্ব্বেই জানিয়াছিল। এজন্য সে উৎকোচের ব্যবস্থা না করিয়া পবনের আগমনের ব্যাঘাত না ঘটে, এই অভিপ্রায়ে পথ ঘাট পরিষ্কার এবং অত্যধিক বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিয়া কাল-প্রতীক্ষা করে।

কোন কোন ফুলকুমারীর ঘর জলের মধ্যে, সুতরাং বরকেও জলে বাস করিতে হইতেছে। যৌবনোন্মেষের পূর্ব্বেই বর কন্যা জলের উপরে উঠে। অলি-চুম্বিত না হইলে কুমুদ ও কমলের ন্যায় বৃহৎ জলজ পুষ্পের বিবাহ হয় না। জলে পড়িলে ইহাদের বরেরা হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। সুতরাং ষট্‌পদের পৃষ্ঠে আরোহণ ব্যতীত ইহাদের উপায়ান্তর নাই। বাস্তবিক, পূর্ব্ব বঙ্গের কোন কোন স্থানের ন্যায় যে সকল ফুলের গ্রাম জলে নিমগ্ন থাকে, তাহাদিগকে দীর্ঘ-বৃন্ত-রূপ উচ্চ ভূমিতে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়। এক জাতীয় জলজ শৈবালের* কন্যার ঘর দীর্ঘ বৃন্তে রচিত, এজন্য কন্যা জলের উপরে থাকে। কিন্তু বরের ঘর ক্ষুদ্র বৃন্তে রচিত হওয়াতে উহা জল মধ্যে নিমগ্ন থাকে। ইহাদের পুরুষ রমণী পৃথক্ পৃথক্ পল্লীতে বাস করে। এস্থলে বিবাহের ঘটক স্বয়ং বরুণ দেব। যৌবনোন্মেষ হইবার প্রাক্কালেই বর স্বীয় গৃহ উৎপাটন করিয়া জলের উপরে গিয়া ভাসিতে থাকে। ওদিকে কন্যারা মুখ বাহির করিয়া বরুণ দেবের অনুকম্পার ভিখারী হইয়া বসিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে স্বয়ংবর প্রথা প্রচলিত। স্রোতঃরূপে বরুণ-দেব কুমারীর দ্বারে দ্বারে বর লইয়া ঘুরিয়া বেড়ান। বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন, ইহাকে বরণ করিবে কি? অনেক সাংসারিক গৃহস্থ রমণী পসন্দ অপসন্দ বুঝে না। জাতি গোত্রের গোলযোগ না থাকিলে এবং স্বঘর পাইলেই তাহারা সন্তুষ্ট। বংশরক্ষা বিবাহের উদ্দেশ্য ত? তাহারা কুমুদ কমলের ন্যায় শোভা সৌন্দর্য্য বুঝে না, তাহাদের চালচলন মোটা, ঘর দ্বারও তত সৌখিন নহে। কিন্তু তা বলিয়া যে তাহারা স্বঘর না পাইলেও কুল বিক্রয় করিবে, এত হীন এখনও হয় নাই। তাহাদের বংশপরম্পরায় এই মর্য্যাদাটুকু অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এজন্য অনেক কন্যা বালিকা ভাবেই থাকে, স্বঘরের সম্বন্ধ আসিলে তাহারা যৌবনে বিকসিত হইয়া উঠে। যেমনই বিবাহ চুকিয়া যায়, অমনি কন্যা স্বীয় বৃন্ত আকুঞ্চিত করিয়া জল মধ্যে প্রবেশ করে। শুধু এই শৈবালের কেন, যাবতীয় ফুলকুমারীগণ গর্ভ সঞ্চার হইবা মাত্র

* Vallisneria.

বিবর্ণ হইয়া পড়ে। সৌন্দর্য্যের দিকে আর দৃষ্টি থাকে না, বসন দিয়া মুখ আবৃত করিয়া ফেলে। যে সুগন্ধ সৌন্দর্য্য ও মধুর লোভ দেখাইয়া—মধুকর কোন্ ছার—দেবতাদিগেরও মন হরণ করিতেছিল, তাহার সমস্তই বিনষ্ট করে।

ফুলরাজ্যে এক ঘরের ছেলে মেয়েদের বিবাহ নিবারণ জন্য বহুবিধ কৌশল অবলম্বিত হইতে দেখিলাম। কৌতুকাবহ দুই একটির কথা বলিতেছি। অর্ক (আকন্দ) ফুলের এক বৃন্তে পুত্র ও কন্যা জন্মে। সুতরাং ভাই ভগিনী একত্রে এক ঘরে বাস করে। ভগিনীটি মধ্যস্থলে ভাই গুলি তাহাকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া থাকে। দেখিলাম পবন দেবকেই ভয়। পাছে তিনি ভাই গুলিকে উড়াইয়া ভগিনীর গায়ে ফেলেন, এই আশঙ্কায় ভাই গুলি পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। তাহাদিগকে উড়াইয়া লইয়া যাইবার পবনের সাধ্য নাই। সুতবাং অজ্ঞাতসারে ভ্রমক্রমে বিধি-বহির্ভূত কার্য্যে তাহাদিগকে লিপ্ত হইতে হয় না।

অর্কিড্ * (এক প্রকার পরজীবী) জাতীয় ফুলের বিবাহের অতি সুন্দর ব্যবস্থা দেখিলাম। ইহাদের বিবাহক্রম ফুলরাজ্যের একজন পাকা পথিক † সবিশেষ বলিয়া গিয়াছেন। অপরাজিতা পলাশ তিল প্রভৃতির গঠন দেখিয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য বিষয়ে কতকটা অনুমান করিয়াছিলাম। নিকটে গিয়া দেখিলাম, বস্তুতঃ তাই। পতঙ্গ উড়িতে উড়িতে আসে, অবতরণে তাহার কোন অসুবিধা না ঘটে, এজন্য কেমন পথ, কেমন অবতরণ স্থান! ঘাটে নামিয়া ঘরের ভিতরে যাইতে পাছে দিগ্‌ভ্রম ঘটে, এজন্য কেমন সুন্দর পথের ব্যবস্থা! আবার পথ দেখাইবার জন্য উহার দুই পার্শ্বে চিহ্ন দেওয়া থাকে।

* Orchids. † Darwin.

দেখিলাম, অনেক ঘরের ঘটক বংশ-পরম্পরা নিযুক্ত আছে। এই সকল ঘটকের চালচলন, আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি স্মরণ করিয়া ফুলকন্যারা স্ব স্ব গৃহ, অবতরণ ঘাট প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহারা এমন, যে-সে ঘটককে ঘরে আসিতে দেয় না। বংশের ঘটকের আগমনের লক্ষ্য করিয়া তদনুরূপ আয়োজন করিয়া রাখে। নররাজ্যেও অনেক বর বিবাহের সময় হস্ত্যশ্ব সমভিব্যাহারে লইয়া যান, তজ্জন্য পল্লীগ্রামের কন্যাকর্ত্তাকে বিলক্ষণ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়।

বিদেশী রমণী দেশী পুরুষকে আকাঙ্ক্ষা করে না, কিম্বা বিদেশী পুরুষ দেশী রমণীর রূপ লাবণ্যে সহসা মুগ্ধ হয় না। অনেক বিদেশী এদেশে আসিবার সময় নিজের নিজের বংশের ঘটক সঙ্গে আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল কি আশ্চর্য্য, বিদেশী বরও আছে, কন্যাও আছে, কেবল কুলের ঘটক নাই বলিয়া ইহাদের অনেককে চিরকৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। প্রজাপতির নির্বন্ধ না থাকিলে বিবাহ হয় কি? স্বভাবগুণে ইহাদের যৌবনোন্মেষ হইয়াছিল, পতি সমাগম যদি ঘটে, এই আশায় ইহারা বেশ বিন্যাস করিতেও ত্রুটি করে নাই। কিন্তু বংশের ঘটক নইলে কুলরক্ষা হয় কৈ? এ সকল স্থলে যৌবনবিকাশ নিষ্ফল। অবিবাহিত ও অপুত্রক হইয়া কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া কন্যা ক্রমে মলিন ও শীর্ণ হইয়া পড়ে।

ঈশ্বরমূল * কচু † প্রভৃতি অনেক ফুলকুমারী আবার নিতান্ত কৃতঘ্ন। স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া স্ব স্ব অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য

* ইহাকে পাখীলতাও বলে। aristalochia.
† Arum ইহার কথা পরে দ্রষ্টব্য।

তাহারা ঘটককে বিলক্ষণ ক্লেশ দেয়। তাহারা ঘরে এমন কৌশল করিয়া কাঁটার বেড়া দেয় যে,ঘরে প্রবেশ করিতে পতঙ্গের কোন ক্লেশ হয় না। কিন্তু পাছে মধু খাইয়া বরকে না রাখিয়া পুনর্ব্বার সঙ্গে লইয়া পলায়, এই ভয়ে পতঙ্গ ঘরে ঢুকিলেই কাঁটার বেড়া বন্ধ করিয়া দেয়। তাহাতেও ভয় যায় না। সদর দরজা বন্ধ করিয়া পতঙ্গকে ঘরে আটক করিয়া রাখে। এই প্রকার ফুলকুমারী ভাইদের সঙ্গে এক ঘরে বাস করে। নিজের বর পাইলেই ত চলিবে না, ছোট ভাইদের বিবাহ দেওয়া বড় ভগ্নীর কর্ত্তব্য। বহির্গমনের পথ বন্ধ হওয়াতে ভগ্নীর বিবাহ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়; লোলুপ পতঙ্গও মধু নিঃশেষ না করিয়া যায় না, ওদিকে ভাইগুলি সুযোগ বুঝিয়া পতঙ্গের পিঠে চড়িয়া বসে। গর্ভসঞ্চার হইবামাত্র ফুল-কুমারীরা ম্লান ও শীর্ণ হইয়া পড়ে। পতঙ্গও হাঁফ ছাড়িয়া ফাঁকর হইতে ভোঁ করিয়া চম্পট দেয়। প্রাণ ভয়ে পলায়ন সময়ে নিজের দেহের প্রতি দৃষ্টি করিবার অবসর কোথায়? ভাই গুলি বর সাজিয়া যে পিঠে চড়িয়াছে, তাহা ভাবিবার সময় কোথায়? কিন্তু লোভীর পক্ষে লোভ সম্বরণ সহজ নহে। অন্য ফুলকুমারীর চক্রান্তে পড়িয়া পতঙ্গের প্রাণ আবার 'যায় যায়' হয়।

পতঙ্গ যাহাদের ঘটক, তাহাদের অনেকে-রই "পরিবর্ত্ত ঘর"। তোমার কন্যার বর সে জুটাইয়া দিবে,তার সঙ্গে তোমার পুত্রদিগকে লইয়া বরের ভগ্নীর সহিত বিবাহ দেওয়াইবে। পতঙ্গের দুই ঘরেই লাভ। এমন নইলে কি বিবাহের ঘটকালি পোষায়?

পবনদেব যাহাদের ঘটক,তাহাদের মধ্যে কতকগুলি একটু নিকট সম্পর্কের ঘরেই বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করে। ইহাদিগকে জাতি বলিলে চলে,তবে নিকট কি দূর জাতি,তাহা বলা কঠিন। বিবাহের ঘটকালির পুরস্কার পবনকে দেওয়া হয় না। তিনিও সেইরূপ "না করিলে নয়" এমন মনে ঘটকালি করেন। তিনি অনেক বর সঙ্গে লইয়া উড়িতে উড়িতে বর ছড়াইয়া যান। এজন্য অনেক হতভাগা বরের অদৃষ্টে কখন স্ত্রীরত্ন লাভ ঘটে না। ফুলকুমারীর অনূঢ়াবস্থা ঘুচাইবার জন্যই বরের সংখ্যা এত অধিক। বঙ্গ নবলোকে কন্যার অপেক্ষা মনোমত বরের সংখ্যা কম হওয়াতেই দাম দিয়া বরকে কিনিতে হয়, তাই কন্যার বিবাহ দিতে অনেককে নিঃস্ব হইতে হয়।

পুষ্পরাজ্যে দেখিলাম,বরেরই ছড়াছড়ি, এ রাজ্যে বিধাতা, পুরুষ অপেক্ষা রমণীর সংখ্যা অল্প করিয়াছেন। বিধাতার আশঙ্কারও কারণ আছে। বিবাহের যেরূপ ব্যবস্থা,যেরূপ ঘটক, তাহাতে একজন আনিতে দশজন না আসিলে কার্য্যসিদ্ধ হওয়া কতকটা অসম্ভব। কত বরের বিবাহ দিবে বলিয়া তাহাদিগকে দেশ দেশান্তরে লইয়া পবনদেব ছাড়িয়া দেয়। পথে ঘাটে মাটে তাহাদের অনেকেরই প্রাণ যায়। তবে যাহারা পবনকে ঘটক নিযুক্ত করিয়াছে, তাহাদের অনেকেই বুদ্ধিমান্। দারজিলিং,সিমলা প্রভৃতি দেশে যেমন পাহা-ড়ের গায়ে ঘরগুলি নির্ম্মিত,এজন্য কোন ঘর নীচে, কোন ঘর ঠিক তাহার উপরে থাকে, অথচ ঘরগুলি পরস্পর পৃথক্; ফুলরাজ্যেও (ধান্যাদি) অনেক ঘর তেমনই ভাবে রচিত। শৈলবিহারকালে দেবতারা নিম্নস্থিত গৃহের অপ্সরীর নিকট লম্ফ দিয়া পড়েন কিনা, পুরাণে লেখে না। কিন্তু ফুলরাজ্যে এরূপ ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। কি জানি, পবন যদি নাই আসেন, যথাসময়ে নিম্নে অবরোহণ করা

সহজ। স্বচ্ছন্দে বরগুলি (লালবিছুটি) কন্যার ঘরে লম্ফ দিয়া পড়ে।

ফুলরাজ্যে আর একটি আশ্চর্য্য জনক ব্যাপার দৃষ্ট হইল। কোন কোন ঘরে ভাই-বোনগুলির বয়ঃক্রমের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক। ভাইবোন গুলি প্রায় সমকালেই যৌবনে পদার্পণ করে, ইহাই পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম। এখানে তা নহে। দেখিলাম হয় ভাই বড়, বোন ছোট; কিম্বা বোন বড়, ভাই ছোট।* ইহাদের বিবাহের পদ্ধতিও বিচিত্র। মনে কর, ক ঘরে ভাইগুলি বয়সে বড়, বোনটি ছোট, এবং খ ঘরে ভগ্নীটি বড়, ভাইগুলি ছোট। ক ঘর অনেক আছে, তেমনই খ ঘরও অনেক আছে। কিন্তু কখন ক ঘরে ক ঘরে কিম্বা খ ঘরে খ ঘরে বিবাহ সম্পন্ন হয় না। ক ঘরের বর খ ঘরের কন্যা, আবার খ ঘরের বর ক ঘরের কন্যাকে বিবাহ করে। নর-রাজ্যেও পাত্র পাত্রীর বয়সের বিচার বিলক্ষণ আছে। তবে অল্প বয়সের মেয়ের সহিত বুড়া বয়সের বরের বিবাহ ঘটিতে দেখিয়াছি, কিন্তু কচি বরকে বুড়ী মেয়ে বিবাহ করিতে দেখি নাই। শুনিয়াছি নাকি কোন কোন সভ্য নর-সমাজের এরূপ রীতি আছে।

ফুলরাজ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে তথায় নর-রাজ্যের আচার ব্যবহার বিবাহপদ্ধতি দেখিয়া একান্ত বিস্মিত হইলাম। এ রাজ্যে বিবাহে শোণিতবিচার বিলক্ষণ প্রচলিত। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ভাইবোনের বিবাহ দূরে থাক্, দূর দেশের বর না পাইলে অনেক কুমারীর মন উঠে না। অবশ্য স্বজাতি হওয়া আবশ্যক। নররাজ্যে এদেশের পুরুষ, ওদেশের রমণীকে কিম্বা এদেশের রমণী, ওদেশের পুরুষকে বিবাহ করে না। নরনারী মাত্রই এক জাতি, দেশ বিদেশের প্রভেদে জাতির প্রভেদ নাই। একথা নরসমাজে তত সমাদৃত হয় না।

যাহা হউক, ফুলরাজ্যে দুই এক স্থলে শোণিতবিচার নাই, একথাও বলিতে হইতেছে। একই ঘরে লালিত পালিত পুরুষগুলি সেই ঘরের রমণীকে বিবাহ করে। কোন কোন কন্যা (উলট চাঁড়াল *) স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় বৃন্তস্থ পুরুষগুলির সহিত প্রেম আলাপনের জন্য মুখ বাড়াইয়া দেয়। যাহা হউক, ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। বোধ হয় এইরূপ কদাচার বশতঃ অনেকে নির্বংশ হইয়াছে। আর দিকে দেখিলাম যে, কতকগুলি ফুলের (আমরুল ও ভাওলেট † জাতীয়) ঘর সর্ব্বদা বন্ধ থাকে। ইহাদের কোন কোন ঘর কখনও খুলিতে দেখিলাম না। ইহাদের ঘরগুলি ক্ষুদ্র, সহজে চক্ষে পড়ে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, ইহাদের শোণিতবিচার ততটা নাই, তবে লোকলজ্জা আছে। এ জন্য দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে। ভাবিলাম, লজ্জায় মুখ লুকাইবার কথাটা ঠিক হউক না হউক, ঘটকের আবশ্যকতা নাই এবং ঘটক ভুলানো মধু কিম্বা রূপলাবণ্যের হাট বসাইবারও প্রয়োজন হয় না। একথাও বলা আবশ্যক যে, ইহাদের কোন কোন ফুলের শোণিতবিচারও আছে। বোধ হয়, ইহাতেই ইহারা এত দিন নির্বংশ হয় নাই।

যাহা হউক, মোটের উপর দেখিলাম, ফুলরাজ্যে পতঙ্গ অপরিহার্য্য। কিন্তু তা বলিয়া যে যাবতীয় পতঙ্গ ঘটকালি কার্য্যে ব্রতী থাকে, তাহা নহে। অনেক ফুল কেবল এক গণের‡ পতঙ্গের মুখাপেক্ষী, অনেকে কোন কোন

* Primula.

* Gloriosa. † Viola.

‡ Order.

পতঙ্গ বংশের* কৃপার ভিখারী, কোন কোন ফুল কেবল একটি জাতির+ পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে। মধু, পরিমল ও দ্যোতমান বর্ণের প্রলোভনে অনেক পতঙ্গ আকৃষ্ট হইলেও, ফুলকুমারীর ঘরে সকলের প্রবেশ-অধিকার নাই। স্থূলদৃষ্টিতে মনে হয় যে, যতই পতঙ্গ ঘরে প্রবেশ করিবে, ফুলকন্যার বিবাহের পথ বুঝি ততই সুগম হইবে। কিন্তু যে সে পতঙ্গকেঘরে ঢুকিতে দিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয়না। ফুলকন্যার গৃহ রচনার প্রভেদে সকল পতঙ্গ তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না বটে, কিন্তু তাহা ছাড়া দেখিলাম যে, কোন ফুলকন্যার ঘটক অল্প হইলেই তদ্দ্বারা অভিপ্রায় সিদ্ধ সহজে হয়। লোকে কথায় বলে, "অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট;" সন্ন্যাসীরা সকলে কার্য্যক্ষম ও শ্রমশীল হইলে তাহাদের এরূপ অপবাদ থাকিত না। যে মধুকর যত ফুল পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তদ্দ্বারাই বেশী কাজ হয়। এক ফুলে দশটা পতঙ্গ দশবার ঘুরিয়া বেড়াইলে যত কাজ হয়, সেই ফুলে একটা পতঙ্গ দশবার আসিলে অধিকতর ফল হয়। হাজার বাজে ঘটক দ্বারা কখনও কোন কন্যার বর মিলিয়াছে কি? অন্ততঃ দুইটি ফুল না বেড়াইলে পতঙ্গের ঘটকালি দ্বারা কোন লাভ নাই। সুতরাং যে পতঙ্গজাতি বিকসিত কুসুমের যৌবন কালের মধ্যে অন্ততঃ দুইটি কুসুমের ঘরে পদার্পণ না করে, তাহাদের গতায়াত নিষেধ করাই শ্রেয়ঃ। মন্দক্রিয়, নিশ্চেষ্ট বঙ্গনরের ন্যায় অসংখ্য কীট পতঙ্গ থাকিলেও ফুলরাজ্যের মধ্যে তাহাদের থাকা না থাকা, সমান কথা। যে মধুমক্ষিকার একটু বুদ্ধি আছে, সে সহজে এক ফুলে দুইবার যায় না। এক ফুলে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামীকে বিরক্তকরা ভিক্ষার্থী মধুকরের কর্ত্তব্য নহে। আমি ভাবিতাম, আমাদের ন্যায় 'স্বকার্য্য মুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ' চাতুর্য্যকুশল বিশ্বমধ্যে আর কেহ নাই। পতঙ্গের উপযোগিতার সদ্ব্যবহার করিতে ফুল যেমন বুঝিয়াছে, তেমন বুদ্ধি নরলোকে প্রকাশিত হইতে সর্ব্বদা দেখা যায় না।

যদি পতঙ্গের কথা পাড়িলাম, তবে একটু বিস্তারিত ভাবেই বলা যাক্। মধুই অনেক ষট্পদের আহার। ইহাদের দ্বারাই ফুলের সংসারে সমধিক কাজ হয়। কিন্তু যদি ফুলের তুলনায় পতঙ্গের সংখ্যা অধিক হয়, পতঙ্গগণের সকলই অনলস হইলেও ফুলের কোন ক্ষতি হয় না। বাস্তবিক যে সকল ফুলের পতঙ্গই একমাত্র ভরসা, তাহাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ফুল পতঙ্গের কার্য্যে কোন ব্যাঘাত দেয় না, অন্যগুলি সময় বুঝিয়া পতঙ্গকে কিছু কাল ঘরে ঢুকিতে দেয় না। যেখানে অনেক ফুলের অল্প ঘটক, সে স্থলে ঘটকের আগমনে ব্যাঘাত দিয়া ফুলকন্যা কি নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিবে? এই সকল ফুলকন্যাদের রূপের ছটা, সুন্দর বাস, মধুকোষ দেখাইয়া দিবার পথ অবতরণ ঘাট প্রভৃতির আয়োজনের একটি কারণ এই। জবা, স্থলপদ্ম প্রভৃতি অনেক ফুলের বর্ণ পরিবর্ত্তনের কারণও এই। বিবাহ হইলেই ইহারা বিবর্ণ হইয়া পড়ে, কেন না তাহাদের অন্যবরের প্রয়োজন কি? আবার পতঙ্গকেও ইঙ্গিত করে যে, তথায় তাহার আগমন অনাবশ্যক। পতঙ্গও বুঝিতে পারিয়া সেই জাতীয় অন্য বিকসিত ফুলে গমন করে। নিজের নিজের জাতির টান সকলেই টানে, জবা এমন ব্যবস্থা না করিলে স্বজাতীয় অন্য ফুলকন্যাদের বিবাহে যে বড় বিলম্ব হইত।

উপরে ঈশ্বরমূল জাতীয় ফুলের কৃতঘ্নতার

* Family. + Species.

বিষয় বলিয়াছি। কচু মান প্রভৃতিও এইরূপ শঠতা করে। ইহাদের ফুলের তুলনায় পতঙ্গ-রূপ ঘটকের সংখ্যা সমধিক। যেখানে একটা কচু বিকসিত হয়, ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষুদ্রদেহ পতঙ্গ ফুলের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাহা কচুর একটি ফুল বলিয়া সচরাচর লোকে বিদিত, বস্তুতঃ তাহার মধ্যে দণ্ডাকার দীর্ঘ পল্লীতে অনেক নবনারীর পৃথক্ পৃথক্ গৃহে বাস। কচ্বীরমণীগণ পল্লীর নিম্নদেশে,পুরুষগণ উপরি-ভাগে বাস করে। পুরুষগণের বাসগৃহের উপরিভাগে কণ্টক-বেষ্টন-স্বরূপ কেশজাল অপ-রিচিত পতঙ্গের আগমন প্রতিষেধ করে, এবং পল্লীর প্রাকার-স্বরূপ নাবঙ্গবর্ণ একটা আব-রণ থাকে। ইহাদের রমণীগণ যখন যৌবনে ফুটিয়া উঠে, পুরুষগণের তখন শৈশবাবস্থা। সুতরাং পতঙ্গের আগমন ব্যতীত রমণীগণের বিবাহ অসম্ভব। এজন্য বাহিরের কেশজাল প্রথমতঃ নিম্নাভিমুখে থাকে, তাহাতে পত-ঙ্গের সাহায্যে বর অনায়াসে রমণীদের পাড়ায় উপস্থিত হইতে পাবে। বিবাহ সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত পতঙ্গকে কাঁটার বেড়ার মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়। ইত্যবসরে পুরুষগণ যৌবন প্রাপ্ত হয়, কাঁটার বেড়াও ছিন্ন ভিন্ন হইতে থাকে, পতঙ্গও সুযোগ বুঝিয়া পলায়ন করে। পুরুষগণ এইরূপে পতঙ্গের পিঠে চড়িয়া অন্য কচ্বীরমণীর সন্ধানে বহির্গত হয়।

বেশী কথায় কাজ নাই। যে দুই চারিটি ব্যাপার দেখিলাম,তাহাতেই আমার চিত্ত চমৎ-কৃত হইয়া গেল। এইরূপে বেড়াইতে বেড়াইতে ফুলরাজ্যের দূরবর্ত্তী অন্য এক প্রদেশে আসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, এদেশের পথ ঘাট বড় দুর্গম; বনে জঙ্গলে, জল কাদায়, খাল বিলে এদেশের জনপদ রহিয়াছে।* বাড়ীগুলির অবস্থা নিতান্ত হীন বোধ হইল। কোথাও ফুল দেখিলাম না। ভাবিলাম,ভোগ করিবার লোক না থাকিলে কাহাদের জন্যই বা ঘর বাড়ী! এইরূপ বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে দণ্ডায়মান আছি, এমন সময় অদূরে চামেলিকে দেখিতে পাইলাম। আমি কিছু না বলিতে বলিতে চামেলি বলিতে লাগিল--"এই সকল গৃহস্বামী-দের এখন হীনদশা হইয়াছে সত্য, কিন্তু বহু-কাল পূর্ব্বে ইহাদেরই আধিপত্য ছিল। তখন ইহারাই রাজা ছিল, ইহাদের বড় বড় অট্টালিকায় দেশ শোভিত ছিল। ইহা-দের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নগর ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। তোমাদের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ইহাদের অট্টালিকার অনুসন্ধান করিতেছেন। তোমরা ভূমি খনন করিয়া অনেক অট্টালিকা বাহির করিয়া লইতেছ। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আমাদের জন্ম হওয়া দূরে থাক্, ধরাধামে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগেরও আবির্ভাব হয় নাই। কালের কুটিল গতিতে ইহারা এখন হীনজীব বলিয়া পরিগণিত এবং আমরা রাজা। যে কারণেই হউক, একবার রাজ্য হারাইলে আর কি মস্তক উত্তোলন করিতে পারা যায়? রাজ্যের সঙ্গে কত আধিপত্য আসে, রাজ্য গেলে সমস্তই হারা-ইতে হয়। এখন বল বীর্য্য হীন হইয়া ইহারা হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। তবে, ইহাদের বংশ বৃদ্ধি এত অধিক হয় যে, আমাদের জ্ঞাতি-গোত্র বন্ধু বান্ধব সমুদায়ের তুলনায় ইহাদের সংখ্যা বেশী বই কম হইবে না। এজন্যই ইহারা এখনও টিকিয়া আছে, নতুবা আমা-দের ন্যায় সভ্য সমাজের সংঘর্ষে কোন্ দিন সমূলে বিনষ্ট হইত।" চামেলীর এই কথা শুনিয়া নররাজ্যের কথা স্মরণ হইল। ভাবি-লাম,সকল দেশেই কি একই নিয়ম? যেখানে

* Ferns, mosses &c.

কোন জাতীয় জীব ক্ষুদ্রাকৃতি বা সহায় সম্পদ হীন, সংগ্রামে তাহারাই পরাজিত হয়। তবে, প্রবল বংশবৃদ্ধি করিয়া সংসারে কয়েকদিন মাত্র আপনাপন বংশ লুপ্ত হইতে দেয় না।

যাহা হউক, এই সকল অদ্ভুত বৃক্ষের বিবাহ প্রণালী জানিতে ব্যগ্র হইলাম। আমার সঙ্গিনী বলিতে লাগিল যে "অধুনা উহাদের অসভ্য নাম হইয়াছে, আহার বিহার সভ্য সমাজের ন্যায় উন্নত নহে, কিন্তু ক্ষীণ ও হীন জীবী হইয়াছে বলিয়া উহারা পূর্ব্ব গৌরব বা আচার ব্যবহার হারাইয়াছে, এমন নয়। উহাদের উদ্বাহ প্রণালী দুই একটা সামান্য বিষয়ে স্বতন্ত্র বোধ হইলেও প্রকৃততঃ বিবাহক্রমসম্বন্ধে আমাদের সহিত উহাদের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। কেবল বাহ্যাড়ম্বর নাই মাত্র। পুরুষ ও রমণী গুপ্ত ভাবে বাস করে, তাহাতেই দেখিতে পাইতেছ না, উহাদের মধ্যে স্বয়ংবর প্রথা বিশেষ প্রচলিত। অনেক বর পায়ে হাঁটিয়া কন্যার নিকট উপস্থিত হন।"

কিয়ৎক্ষণ অনন্যমনে ইহাদের আচার ব্যবহার দেখিতে লাগিলাম। পুষ্পবাজার প্রান্ত সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছিলাম। প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা হইল। এমন সময় চামেলি বলিতে লাগিল, —"আমাদের রাজ্য বেড়াইয়া আসিলে। আচার ব্যবহার বিবাহ ক্রম কতকটা দেখিয়াছ। এখন বল দেখি, তোমাদের জন্য বিধাতা পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, না আমাদের জন্য? তোমরা কোথা হইতে অল্পদিন আসিয়া কতদিকে আমাদের কতবিঘ্ন ঘটাইতেছ। আমরা ইচ্ছামত গ্রাম নগর স্থাপন করিতে পারি না, ইচ্ছামত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি না। তোমরা যখন প্রথমে পৃথিবীতে আসিয়াছিলে, তখন আমাদের কৃপার ভিখারী হইয়া তোমাদিগকে থাকিতে হইত। এখন আমাদের উপর আধিপত্য করিতে ত্রুটি করিতেছ না। আমাদিগকে খেলার সামগ্রী করিয়াছ, কৌশলজাল বিস্তার করিয়া আমাদের অনেকের বিকৃত [illegible] ঘটাইয়াছ। এখন তাহাদিগকে বিবাহ দেহবিস্তার পূর্ব্বক বংশরক্ষা করিতে হইতেছে। বিশেষতঃ আমাকে ও আমার জ্ঞাতি বেলি যুই মল্লিকা কুন্দ প্রভৃতিকে সমাদর করিতে গিয়া আমাদের বিবাহের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছ। দেখ দেখি তোমাদের জন্যই আমাদের আশা মিটিল না, তোমাদের জন্যই আমাদিগকে অবিবাহিতা অবস্থায় জীবন কাটাইতে হইল। আমাদের চেয়ে তোমাদের কুলীনকুমারী বেশী দুঃখী? তোমাদের দৌরাত্ম্য কিছুকাল এইরূপ চলিলে আমরা অচিরে নির্ব্বংশ হইব"।

এই বলিয়া চামেলি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। আমার মনে কথাগুলি অঙ্কিত হইয়া গেল। ভাবিলাম, কথাগুলি সমস্তই ঠিক, ইহাদিগকে লইয়া কবিগণ টানাটানি না করিলে কি তাহাদের কবিতা লেখা হয় না? আমি কবি হইলে চামেলির অশ্রুকণা, বেলির বিরহ যুইএর দীর্ঘশ্বাস বিষয়ে কবিতা লিখিতাম। যাহাহউক, প্রকাশ্যে বলিলাম "যেমন তোমাদের কাহার কাহার বিবাহ অসম্ভব হইয়াছে, তেমনই আমাদের যত্নে তোমাদের রূপ গুণ বৃদ্ধি বাড়িয়াছে। তোমাদের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ কর, তাহার এত সৌন্দর্য্য, এত সৌরভ্য ছিল কি? বেলির পরিচ্ছদ ও সৌরভের তুলনায় তোমাকেও সময়ে সময়ে লজ্জিত হইতে হয় না কি? মানুষ তোমাদিগকে কত আদর করে। ধর্ম্মানুষ্ঠানে তোমাদিগকে ডাকে, নতুবা দেবতারা পূজা গ্রহণ করেন না। এক

পারিজাত কুসুমের জন্য তুমুল সংগ্রাম হইয়া গেল। প্রণয়িগণ তোমাদিগকে শিরোভূষণ করিয়াছেন। কবিগণ উপমার জন্য তোমাদের দ্বারে দ্বারে ভিখারীর বেশে বেড়াইয়া বেড়ান। কোথায় তিলফুল, কোথায় কদম্ব-চম্পক, কোথায় মাধবী শিরিষ বান্ধুলী, এই অনুসন্ধানেই তাঁহারা ব্যাকুল,—এই কথা শেষ হইতে না হইতেই বোধ হইল সাগরের শৈত্য সংস্পর্শে দেহ অতিশয় শীতল হইয়াছে। চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম, পশ্চিমদিকে রবি ঢলিয়া পড়িয়াছেন। ভাবিলাম দিনের বেলা এমন স্বপ্ন! *

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

পত্রাবলী।

প্রথম পত্র।

শ্রীচৈতন্যের প্রতি বিষ্ণুপ্রিয়া

চৈতন্যদেব, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া, জননী শচী-দেবী ও পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নীলাচল ধামে শেষজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নীলাচল গমনের কয়েক বৎসর পরে, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করেন।

ফাল্গুন পূর্ণিমা নিশা আজি নবদ্বীপে,
কোথা নবদ্বীপ-চন্দ্র! উৎসব-হিল্লোলে
নাচে নবদ্বীপ পুরী; মল্লিকা-সুবাস
হরি সমীরণ এই বহে ধীরে ধীরে;
ছড়ায়ে কিরণ-ধারা নীল নভো মাঝে
শোভিছেন নিশানাথ; জল, স্থল, নভ,
বিমল কিরণে দীপ্ত; পাপিয়ার গান
দূর গ্রামান্তর হ'তে পশিছে শ্রবণে;
মঞ্জরিত চূতশাখে বসিয়া পুলকে
গায় পিকবর ওই; পুরবাসী যত ১০
উচ্চে হরিধ্বনি করি, চলে রাজপথে;
কি উল্লাস আজি হেথা! আপনি জাহ্নবী,
সে আনন্দ-স্রোত যেন ধরি নিজ বুকে,
তুলিয়া তরঙ্গ-বাহু, মধুর কল্লোলে,

---

* সকল সময় স্বপ্ন বুঝিতে পারা যায় না। এজন্য স্বপ্নদর্শীর অনুমতি লইয়া কয়েকটি কথা যোজিত হইল। কিপ্রাণী কিউদ্ভিদ,সকল জীবকেই জননেন্দ্রিয় অনুসারে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কোন কোন জাতীয় শম্বুক, জলোকা,কেঁচোর প্রত্যেকে এবং ধুতুরা বেগুন অপরাজিতা প্রভৃতিরপ্রত্যেকফুলে পুংওস্ত্রী উভয় বিধ জননেন্দ্রিয়ই থাকে। বিজ্ঞানে ইহাদের নামদ্বিলিঙ্গ (bisexual),জীবরাজ্যে ইহারা হরগৌরী(hermaphrodite)মনুষ্য পশু পক্ষী এবং লাউ তাল পেঁপে প্রভৃতির পুষ্পে হয় পুং কিম্বা স্ত্রীজননেন্দ্রিয় থাকে। ইহারা একলিঙ্গ (unisexual)যেমন পশুদিগের মধ্যে কোনটি নর কোনটি বা নারী, তেমন লাউ পেঁপে প্রভৃতির কোন পুষ্প পুরুষ কোনটি বা রমণী। প্রভেদের মধ্যে লাউর একই গাছের কোন ফুল পুরুষ, কোন ফুল বা রমণী; এবং পেঁপের কোন গাছে কেবল পুরুষ, কোন গাছে বা কেবল স্ত্রী থাকে। দ্বিলিঙ্গ পুষ্প সকলের মধ্যে যেমন নিজে নিজে নিষেক ক্রিয়া প্রায় হয় না, তেমনই দ্বিলিঙ্গ প্রাণিদিগের স্বনিষেক ঘটে না। শম্বুক ও শুক্তি দ্বিলিঙ্গ হইলেও তাহাদের পুং ও স্ত্রী জননেন্দ্রিয় এককালে পক্ক হয় না। তবে অন্ত্রকৃমির (tape-worm) ন্যায় কোন কোন দ্বিলিঙ্গ প্রাণীর কখন কখন স্বনিষেক (self impregnation) ঘটে; বস্তুতঃ প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়ই নিষেকক্রিয়া সম্বন্ধে এক।

ধাইছেন সিন্ধুপানে। শুভদিনে আজ
মত্ত নবদ্বীপবাসী; বিষ্ণুপ্রিয়া তব
আঁধার কুটীরে শুধু কাঁদিছে নীরবে।
তব জন্মদিন আজি! ওই চারিদিকে
বাজে শঙ্খ, বাজে ঘণ্টা, জ্বলে দীপাবলী,
হরিসঙ্কীর্ত্তনগানে ভক্ত বৃন্দ যত ২০
পূরিছেন নবদ্বীপ, কিন্তু দেখ নাথ,
কি দশায় আছে আজ পরিজন তব।
লুটায়ে ধরণীতলে উন্মাদিনী সম
কাঁদেন জননী ওই; শূন্য গৃহ মাঝে
কাঁদি অভাগিনী আমি। শুনি লোকমুখে,
জননীর অশ্রু তুমি হেরিলে শৈশবে
পড়িতে মূর্চ্ছিত হয়ে; স্রোতো রূপে আজ
বহে সেই অশ্রুধারা, না জানি কেমনে
ভুলিয়া রয়েছ তবে! শুন প্রাণেশ্বর,
"কোথা গেলি বাপ," বলি নাম ধরি তব ৩০
ডাকেন জননী ওই, এস একবার,
জুড়াও মায়ের প্রাণ; তোমা পুত্রে ছাড়ি
কি দশা মায়ের আজি দেখ ভাবি মনে।
কি লিখিব প্রাণেশ্বর। শত মর্ম্মদাহে
প্রাণ যার জর্জ্জরিত, পাবে কি সে কভু
জানাতে মরম ব্যথা? কি দশায় আজ,
আছে বিষ্ণুপ্রিয়া তব জানেন বিধাতা,
ভগ্ন বক্ষস্থল তার। চাহি চারি দিকে
হেরি শূন্যময় সব; সেই, গৃহ, দ্বার,
সেই শয্যা, যে শয্যায় শেষ দিনে নাথ, ৪০
বসায়ে দাসীরে নিজে, ও কর কমলে
সাজাইলে প্রেমাদরে; সকলই তেমন
এখনও রয়েছে প্রভু, কিন্তু তোমা বিনা
শ্মশান এ পুরী আজি। নিত্য দিবাশেষে
যাই জননীর সনে, জাহ্নবীর কূলে
বারি আনিবার তরে; হেরি অনিমেষে
উড়ায়ে কেতন কত আসিতেছে তরী,
মধুর সঙ্গীত ধ্বনি উঠে কার (ও) মাঝে,
বারিকুম্ভ লয়ে কক্ষে, এক দৃষ্টে আমি
থাকি আশা পথ চেয়ে, জ্ঞান হয় মম ৫০
স্মরি অভাগীর দুখ, সে তরণী পরে
ফিরিছ স্বদেশে তুমি; যতক্ষণ তরী
রহে দূরে, আশা লয়ে থাকি চাহি আমি,
চলি গেলে, ভাবি মনে, ভেঙে গেল বুক,
দর দর ঝরে অশ্রু; সন্ধ্যার তিমির
আসে ঘনাইয়া ক্রমে; ডাকেন জননী
"বউ মা, গেল যে বেলা, কেন মা দাঁড়ায়ে
চল ফিরে যাই ঘরে।" ইচ্ছা হয় মম
থাকি দাঁড়াইয়া সেথা, কিন্তু নাহি পারি,
ফিরি শূন্য গৃহে, অশ্রু মুছিতে মুছিতে॥ ৬০
যাই যবে স্নান আশে জাহ্নবীর কূলে
কত কথা উঠে প্রাণে; মনে পড়ে নাথ,
বালিকা বয়স যবে মিলি সখী দলে
খেলিতাম কত সেথা। শিবলিঙ্গ গড়ি,
যতনে তুলিয়া ফুল, আনি বিল্বদলে
পূজিতাম ভক্তি ভরে; নিরখি নয়নে
প্রবীণা রমণী সবে মগ্ন মহা ধ্যানে
আমিও তাঁদের মত বসিতাম কভু
আঁখি মুদি, কি যে ধ্যান, কে জানিত তবে!
কাঁপিত পরাণ কভু শুনিয়া শ্রবণে। ৭০
পদশব্দ, চমকিয়া হেরিতাম পাশে
ভুবন মোহন রূপে দাঁড়ায়ে নিকটে
হাসিছ মধুরে তুমি; কহিতে আমারে
"কারে পূজ বিষ্ণুপ্রিয়ে, বর চাহ যদি
এই ত সম্মুখে আমি, দেহ মাল্য মোরে
চন্দ্রাননে," লাজে, ভয়ে, পলাতাম ছুটি
হাসিত সঙ্গিনী যত, কহিতাম মনে
"হে শঙ্কর ইনি যেন পতি হন মম।"
কিন্তু সে অতীত কথা, কি কাজ স্মরণে
কি কাজ জাহ্নবী বারি নিক্ষেপিয়া আর ৮০
শুষ্ক তুলসীর মূলে? ভুলেছ যখন
অভাগীরে, ভূত কথা কি কাজ স্মরণে?
কোথা নীলাচল নাথ, কোথা নবদ্বীপে

কাঁদে বিষ্ণুপ্রিয়া তব; এ পাপ নয়নে
জনমে সে পুরী প্রভু, হেরি নাই কভু,
চির গৃহরুদ্ধ দাসী; তবু প্রাণেশ্বর,
মানস নয়নে যেন হেরি দিবানিশি
সে পবিত্র ধামে তোমা; দেখি জগন্নাথে
বিরাজিত শ্রীমন্দিরে; মুগ্ধ আঁখি হেরি
ভুবন মোহন রূপ; মন্দির সম্মুখে ৯০
হেরি যেন ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লয়ে তুমি
নাচিছ আনন্দ ভরে; ঊর্দ্ধে বাহু দুটী,
প্রেমে রোমাঞ্চিত তনু, শত চন্দ্র জিনি
শোভে বদনের কান্তি, ঝরে দুনয়নে
ধারা রূপে প্রেম অশ্রু; রুণু রুণু বোলে
চরণে নূপুর বাজে; অনিমেষ হয়ে
চাহি মুখ পানে আমি, ইচ্ছা হয় মম
তেয়াগিয়া লাজ ভয়, যেথা রাখ তুমি
ওই শ্রীচরণ দুটী, পাতি দেই সেথা
এ মম হৃদয়, নাথ, কঠিন পাষাণে ১০০
ব্যথা পাছে পাও পদে; কিন্তু কি বলিব
সরমে না পারি যেন। কভু হেরি তোমা
দাঁড়াইয়া সিন্ধু কূলে, পূর্ব্বাকাশ ভালে
উজলিয়া নীরনিধি উঠিছেন যেথা
পূর্ণবিম্ব সুধাকর, এক দৃষ্টে চাহি
সেই দিকপানে তুমি। বিহ্বলের মত
কভু বা সুধাংশুবিম্ব হেরি সিন্ধু জলে
নাচিতে তরঙ্গ সঙ্গে, বাহু প্রসারিয়া
"হা কৃষ্ণ এলে কি তুমি?" বলি উচ্চৈঃস্বরে
ধাইছ ধরিতে তায়; আবার কখন ১১০
হেরি যেন সিন্ধু নীরে লম্ফ দিয়া তুমি
পড়িছ উন্মাদ প্রায়, চীৎকারি অমনি
কাঁদি অভাগিনী আমি, না পারি রাখিতে
সরমের বাধ আর; জিজ্ঞাসেন মাতা
"বউমা, বউমা, কেন সহসা এমন
উঠিলে চীৎকার করি?" পারি না বলিতে
কি যে মরমের ব্যথা, কাঁদি শুধু খেদে॥
জানি আমি প্রাণেশ্বর, নহ তুমি শুধু
অভাগীর একমাত্র, নরনারী যত
আছে, সকলেরই তুমি। শুনি সাধু মুখে ১২০
প্রেম-মন্দাকিনী রূপে অবতীর্ণ তুমি
এ শুষ্ক মরত-ভূমে; ক্ষুদ্র নারী আমি
কি সাধ্য আমার, তুচ্ছ সংসার বন্ধনে
বাঁধিব তোমারে আমি? যে প্রেম-জলধি
অতিক্রমি জ্ঞান-বেলা চাহে প্লাবিবারে
বিশাল অবনী-তল, কে সে নারী আমি
ক্ষুদ্র এ হৃদয়-ঘটে রোধিব যে তারে?
কিন্তু জেনে শুনে তবু না মানে প্রবোধ
দুর্ব্বল নারীর প্রাণ; কঠিন পুরুষ,
নারী প্রাণে কি যাতনা পারে না বুঝিতে, ১৩০
কঠোর হৃদয় তার; কিন্তু নরদেহে
নারীর হৃদয় তব, ভেবে দেখ তুমি,
তব প্রাণারাম যদি লুকাতেন কভু
অন্তর হইতে তব, উন্মাদের মত
"কৃষ্ণরে, বাপ্‌রে, মোর পরাণের ধন,"
বলিয়া উঠিতে কাঁদি। চির দাসী তব,
দ্বাদশ বৎসর আজ হেরেনি নয়নে
ওই পাদপদ্ম তব; শোনেনি শ্রবণে
(ইষ্ট দেব তুমি তার) তব মধু-বাণী—
কি দশা তাহার তবে; তুমি না বুঝিলে ১৪০
কে বুঝিবে, কিবা জ্বালা চির অভাগীর!
না চাহে অধিনী তব বাঁধিতে তোমারে
আবার সংসার বাঁধে; কে হেন নিষ্ঠুর,
পতি দরশনে সতী ছুটি যান যবে,
চাহে ফিরাইতে তাঁয়? যে মহা পরাণ
ছুটেছে অনন্ত পানে, কি কাষ ফিরায়ে
আবার সংসারে তারে? চাহে না সে সব
চাহে না অধিনী তব; কি ভাগ্য তাহার,
আবার তোমারে লয়ে পশিবে সংসারে,
অলীক সে স্বপ্ন নাথ! একবার শুধু ১৫০
এস ফিরি বঙ্গদেশে; কাঁদেন জননী
দেখা তাঁরে দিও নাথ; একবার শুধু

ভুবন মোহন রূপে দাঁড়া'য়ো অঙ্গনে
দাঁড়াতে যেমন তুমি; অন্তরাল হ'তে
দেখিব নয়ন ভরি; অন্তরে বাহিরে
ও সুন্দর মূর্ত্তি হেরি জুড়াইব আঁখি।
জানি কৃপাময় তুমি, যে ডাকে তোমারে
পুরাও বাসনা তার, ডাকে বিষ্ণুপ্রিয়া!
ভুলোনা তাহারে তবে; নিবেদন ইতি॥ ১৫৯

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু—বৈদ্যনাথ দেওঘর।

ভগবদ্গীতা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জন্মিলে নিশ্চয় মৃত্যু, মরিলে জনম;
অতএব কভু নাহি পরিহার যার—
তার তরে শোক তব নহে ত উচিত? ২৭
আদিতে অব্যক্ত ভূত, ব্যক্ত মধ্যকালে,
নিধনে অব্যক্ত পুনঃ হয় ভূতগণ;
তবে কেন, হে ভারত, এ শোক-বিলাপ? ২৮
কেহ ইহা করে দরশন,
যেন কত অদ্ভুত ব্যাপার?—

(২৭) জন্মিলে নিশ্চয় মৃত্যু—রামানুজ বলেন, উৎপত্তি বিনাশ উভয়ই সদ্বস্তুর অবস্থা বিশেষ মাত্র। নষ্ট হইয়া উৎপত্তি, সতের উৎপত্তির ন্যায় বোধ হয়—অসতের উৎপত্তি সেরূপে উপলব্ধি হয় না। দ্রব্যের পূর্ব্বাবস্থা হইতে উত্তরাবস্থা প্রাপ্তিই বিনাশ, যথা—সাংখ্যে আছে—নাশঃ কারণ লয়ঃ। স্বামী বলেন, আত্মা যদি মরে তবে কেহ পাপ পুণ্যের ভাগী নহে। বলদেব বলেন, অপূর্ব্ব শরীরে ইন্দ্রিয় যোগই জন্ম, ও পূর্ব্ব শরীরে ইন্দ্রিয় বিয়োগই মৃত্যু। এইজন্য, জন্মিলে—অর্থে স্বকর্ম্ম বশে শরীর পাইলে। মধুসূদন বলেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম বশে লব্ধ শরীরে কর্ম্মক্ষয় হইলে শরীর ধ্বংস হয়, এবং পূর্ব্বজন্মকৃত পাপ পুণ্যাদির ভোগের পর (স্বর্গে বা নরকে থাকিয়া এই ভোগ হয়) কর্ম্মফল জন্য সেই পাপ পুণ্যাদি ক্ষয়ের পরে পুনর্ব্বার জন্ম হয়। (কিন্তু এ ব্যাখ্যা এস্থলে তত সঙ্গত বোধ হয় না। জন্ম, মৃত্যু এখানে ব্যবহারিক অর্থে লওয়া যাইতে পারে।)

শোক করা নহেক উচিত—রামানুজ বলেন, পরিণাম স্বভাব দেহের উৎপত্তি বিনাশ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া শোক করা অনুচিত।

(২৮) ভূত—জীব। পুত্র মিত্রাদি কার্য্যকারণ সংঘাতাত্মক প্রাণী (শঙ্কর)। দেহ বা পৃথিব্যাদি ভূতময় শরীর (স্বামী ও মধু) গীতায় প্রায় সর্ব্বত্র 'ভূত' জীব বা প্রাণী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এস্থলেও সেই অর্থ বোধ হয়। শঙ্করাচার্য্যও সেই অর্থ করেন।

অব্যক্ত অর্থাৎ অদর্শন বা অনুপলব্ধি (শঙ্কর)। জন্মের পূর্ব্বে ও পরে স্থূল শরীর থাকে না এবং সূক্ষ্ম শরীরের উপলব্ধি হয় না; অথবা অবিদ্যা উপহিত চৈতন্য, সৃষ্টির প্রথমে (আদিতে) অব্যক্ত থাকে, লয়ের পরেও অব্যক্ত হয় (মধু)। স্বামী প্রভৃতি ব্যাখ্যাকারগণ বলেন—অব্যক্ত, এখানে সাংখ্য কথিত সূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর মূল প্রকৃতি বা প্রধান। এবং এ শ্লোকের অর্থ এই যে, আদিতে বা সৃষ্টিকালে প্রধান 'অব্যক্ত', মধ্য বা সৃষ্টিকালে 'ব্যক্ত' বা ভূতময় শরীরাদিরূপে প্রকাশিত, ও শেষে বা লয়ে পুনর্ব্বার "অব্যক্ত" হইয়া প্রধানে মিশিয়া যায়। (বলদেব)

গীতার সর্ব্বত্র অব্যক্ত অর্থে অব্যক্ত বা কূটস্থ ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কচিৎ অব্যক্ত অর্থে ব্রহ্মভাব জীব ও জড় প্রকৃতি উক্ত হইয়াছে। (৭।৫ ও ৮।১৮ ইত্যাদি শ্লোক দেখ) এস্থলে শঙ্করাচার্য্যের অর্থ অধিকতর সঙ্গত।

মধ্যকাল—জন্ম মরণান্তরাল কাল (স্বামী)

(২৯) গীতার ৭।৩ শ্লোক দেখ।

কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর ৭ শ্লোকও এইরূপ—

"শ্রবণায়া বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।

অপূর্ব্ব ইহার কথা কভু
কহে কেহ—শুনে অন্যজন
হয়ে বড় বিস্ময়ে মগন ;—
কিম্বা কভু শুনি হেন রূপে,
কেহ নারে জানিতে ইহায়। ২৯
দেহী ইহা, সর্ব্বদেহে করে অবস্থান ;
নিত্য ইহা, নহে বধ্য ; তবে হে ভারত !
সর্ব্বভূত তরে তব শোক অনুচিত। ৩০
তার পরে ভাবি দেখি' স্বধর্ম্ম আপন,
নাহি হ'য়ো বিচলিত ; ধর্ম্ম-যুদ্ধ বিনা,
ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়তর নাহি কিছু আর। ৩১

আশ্চর্য্যোস্য বক্তা কুশলোহস্য লব্ধ
আশ্চর্য্য জ্ঞাতাং কুশলানুশিষ্ট॥"

অদ্ভুত ব্যাপার—অদৃষ্টপূর্ব্ব আত্মার কথা জানিতে গিয়া লোকে আশ্চর্য্য হয় (শঙ্কর) অথবা শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ পাইয়া আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইলেও লোকে বিস্মিত হইয়া ইহার বিষয় আলোচনা করে—ইহার স্বরূপ সহজে ধারণা করিতে বা ইহার নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। অর্থাৎ "শরীরাতিরিক্ত আশ্চর্য্য স্বরূপ আত্মার দ্রষ্টা, বক্তা, শ্রোতা কাহারও আত্ম-নিশ্চয় করা সহজ হয় না।" অবিদ্যা হেতু আত্মাকে বিরুদ্ধধর্ম্মী অর্থাৎ মুক্ত বদ্ধ, জড় চৈতন্য ইত্যাদি দেখিয়া। (মধু)

কেহ নারে জানিতে—অর্থাৎ উপযুক্ত লোকের মধ্যে কত সহস্রের ভিতর কদাচিৎ দুই এক জন মাত্র আত্মাকে উল্লিখিত স্বরূপে জানিতে পারে (শঙ্কর)। আত্মা বাক্য মনের অগোচর বলিয়া ইহাকে সহজে কেহ দেখিতে, বলিতে বা শুনিতে পারে না। শ্রবণ মননাদি দ্বারা সাধনা বলে ইহার সাক্ষাৎ হইলে আশ্চর্য্য হইতে হয় (মধু)।

(৩০) সর্ব্ব ভূত তরে—ভীষ্মাদি সকলের জন্য (স্বামী) স্থূল সূক্ষ্ম যাহারা ভীষ্মাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাদের জন্য (মধুসূদন)। শেষ অর্থ দুরাণ।

(৩১) ধর্ম্মযুদ্ধ—ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক, বা বর্ণোচিত বা আত্মস্বভাবানুযায়ী যে যুদ্ধ, যাহাতে পৃথিবী জয়ের দ্বারা ধর্ম্ম অর্থ ও প্রজা রক্ষণ রূপ সৎকর্ম্ম সম্পাদিত হয় (স্বামী)। রাজ্য রক্ষার্থ. আপনা হইতে উপস্থিত এবং ধর্ম্মের জন্য যে যুদ্ধ কর্ত্তব্য—কেবল তাহাই ধর্ম্মযুদ্ধ। ও এই তত্ত্বই গীতায় পরে বুঝান হইবে। এখনও সে কথা আসে নাই। শাস্ত্রে আছে—

আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুদ্ধ মানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গংযান্ত্যপরাঙ্মুখং॥

পরাশর স্মৃতিতে আছে—

"ক্ষত্রিয়োহহি প্রজা রক্ষণ্ শস্ত্রপাণিঃ প্রদণ্ডয়ন্।
নির্জ্জিতং পরসৈন্যাদি ক্ষিতিং ধর্ম্মেন পালয়েৎ॥

মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রে আছে,—

"সমোত্তমাধমৈ রাজা চাহূতঃ পালয়ন্ প্রজা।
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্র ধর্ম্ম মনুস্মরন্॥"

গীতার ১৮।৪১ শ্লোক দেখ।

স্বধর্ম্ম—জীব মাত্রই প্রকৃতির সহিত নিত্য সম্বন্ধ যুক্ত। প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণাত্মক হওয়ায়, এবং জীবভেদে এই গুণের ইতর বিশেষ হওয়ায় পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বর্ণবিভাগ স্বাভাবিক বা ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট। (গীতার ৪।১৩ শ্লোক দেখ) অর্থাৎ সত্ত্ব প্রকৃতির লোক ব্রাহ্মণধর্ম্মী ; সত্ত্ব রজঃ, প্রকৃতির লোক ক্ষত্রিয়ধর্ম্মী, রজ-তমঃ প্রকৃতির লোক বৈশ্যধর্ম্মী এবং তমঃ প্রকৃতির লোক শূদ্রধর্ম্মী। প্রকৃতি প্রভাবেই কর্ম্মের উৎপত্তি। সুতরাং বর্ণবিভাগ অনুসারে কর্ম্ম বিভাগ হইয়াছে। তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়ের এই স্বাভাবিক কর্ম্ম বা স্বধর্ম্ম শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও ঈশ্বর ভাব। এ সব কথা গীতার ১৮ অধ্যায়ে ৪১ হইতে ৪৪ শ্লোকে বুঝান আছে।

অতএব যাহার যাহা ধর্ম্ম তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম। বঙ্কিম বাবু বুঝাইয়াছেন, আমাদের সকল বৃত্তির অনুশীলনই ধর্ম্ম। অর্থাৎ জ্ঞানবৃত্তি, কর্ম্মবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তির সম্যক অনুশীলনই আমাদের ধর্ম্ম। জ্ঞানবৃত্তি অনুশীলন জন্য বাহ্যিক কর্ম্মের প্রয়োজন নাই তাঁহারা কর্ম্ম-সন্ন্যাস করিতে পারেন। কিন্তু গীতায় দেখান হইয়াছে, জ্ঞান ও কর্ম্মবৃত্তির সামঞ্জস্য করিয়া অনুশীলনই ধর্ম্ম। প্রথম, কর্ম্ম—আত্মোন্নতির জন্য, জ্ঞান-মার্গে যাইবার জন্য। দ্বিতীয়—জ্ঞানপথ পাইলে নিজের জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন না হইলেও, সমাজের জন্য, লোককে দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে। জ্ঞান পথে না যাইলেও নিজের (শরীরাদি রক্ষার) জন্য ও সমাজের জন্য কর্ম্ম করিতে হয়। প্রথম সমাজরক্ষার

যে যুদ্ধ আপনা হতে হয় উপস্থিত
মুক্ত-স্বর্গ-দ্বার-প্রায়,— লভে যে ক্ষত্রিয়
এ হেন সমর পার্থ, সুখী সেই জন। ৩২

হেন ধর্ম্মযুদ্ধে যদি হও পরাঙ্মুখ,—
তা হলে স্বধর্ম্ম আর সুকীর্ত্তি তোমার
হবে লোপ, পাপরাশি স্পর্শিবে তোমায়। ৩৩
অক্ষয় অকীর্ত্তি তব ঘুষিবে সংসার—
মানীর অকীর্ত্তি হয় মরণ অধিক। ৩৪
মহারথীগণ ইহা ভাবিবে নিশ্চয়—
ভয় হেতু রণ হ'তে হইলে বিরত;
সম্মান করিত যারা ঘৃণিবে তোমায়। ৩৫
নিন্দিবে যোগ্যতা তব যত শত্রুগণ,
অবক্তব্য কটু কথা কহিবে কতই—
ইহা হতে দুঃখ-কর কিবা আছে আর ? ৩৬
পাবে স্বর্গ রণে হত হলে; রণ জয়ে

জন্য যুদ্ধাদি করিতে হয় (ইহা ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম)। পরে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও তদানুষঙ্গিক গোরক্ষণাদি করিতে হয় (ইহা বৈশ্যের কর্ম্ম) আর এই সব কর্ম্মে নিযুক্ত লোক যাহাতে আপনার পরিচর্য্যা আপনি না করিয়া তাহাদের উচ্চতর শক্তি অপ্রতিহত রূপে নিজ কার্য্য সাধনে নিযুক্ত হইতে পারে তাহার জন্য নিম্ন শক্তি সম্পন্ন লোকের কর্ত্তব্য সেই সব লোকের পরিচর্য্যা করিতে হয়। ইহা শূদ্রের কর্ম্ম। যাহার যেরূপ প্রকৃতি ও শক্তি সে সেইরূপ কর্ম্ম কর্ত্তব্য বোধে অনুসরণ করিবে। কারণ সেই কর্ম্মই তাহার সহজ ও অনায়াস সাধ্য। ইহার মধ্যে যে যে কার্য্য করিতে নিযুক্ত, সেই তাহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বা Duty। আমাদের শাস্ত্রে এইরূপ প্রকৃতি অনুসারে বর্ণ বিভাগ ও প্রত্যেক বর্ণের স্বধর্ম্ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এবং জীব মাতাপিতৃজ শরীর হইতে তাহাদের অনুরূপ প্রকৃতি পায় বলিয়া সাধারণতঃ এই বর্ণ বিভাগ পুত্র পরম্পরাগত বা hereditary হইয়াছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকে আছে, পরধর্ম্ম অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। টীকাকার বলদেব কতকগুলি স্বধর্ম্ম ত্যাগের দৃষ্টান্ত দিয়া এই কথা বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, পরশুরাম বিশ্বামিত্র প্রভৃতি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে এরূপ আরও দৃষ্টান্ত কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে এই সাধারণ বিধির কোন ব্যভিচার হয় না। তাঁহারা যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কুলোচিৎ কর্ম্ম প্রবৃত্তি নিজ মহিমাবলে দমন করিয়াছিলেন, এবং এই প্রবৃত্তি দমন করিয়া কর্ত্তব্য বোধে অন্য রূপ কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শাস্ত্রে বুঝান আছে যে এরূপ করিতে তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। দ্রোণাদির ক্ষাত্র ধর্ম্ম গ্রহণের কারণও সেইরূপ। তাহা উঁহাদের কষ্ট সাধ্য ও ছিল। ক্ষত্রিয় দেবারাতি প্রভৃতি আশ্রম ধর্ম্মাচরণ দ্বারা বাসনা ক্ষীণ হইলে তবে পরিব্রাজকের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।

(৩২) আপনা হতে—স্ব প্রযত্ন ব্যতিরেকে (মধু)

মুক্ত স্বর্গ-দ্বার প্রায় কীর্ত্তি, রাজ্য বা স্বর্গ লাভ রূপ ফলসাধক যে যুদ্ধ। (মধু)

(৩৩) স্ব ধর্ম্ম...হবে লোপ—মানবধর্ম্মশাস্ত্রে আছে—

"যস্তু ভীত পরাবৃত্ত সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ
ভর্ত্তু র্যদ্দুষ্কৃতং কিঞ্চিত্তৎ সর্ব্বং প্রতিপদ্যতে।
যচ্চাস্য সুকৃতং কিঞ্চিদমুত্রার্থ মুপার্জ্জিতং
ভর্ত্তা তৎসর্ব্বমাদত্তে পরাবৃত্ত হতস্য তু॥"

(৩৪) ঘৃণিবে—(মূলে আছে 'লাঘব') অনাদর করিবে। (মধু)

(৩২-৩৭)—বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন, গীতার এ শ্লোকগুলি যেরূপ অসংলগ্ন, ও হেয় ধর্ম্মনীতিজ্ঞাপক তাহাতে এগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সেরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। ১১ শ্লোকের টীকায় ইহার প্রয়োজন দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাহা ব্যতীত আরও কথা আছে। গীতার প্রথম অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে, অর্জ্জুন তখন ভ্রান্ত ও মোহযুক্ত। তিনি যে লোক-সাধারণ দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তি বশে মুগ্ধ হইয়া, প্রকৃত ধর্ম্মপথ বুঝিতে না পারিয়া বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমান করিতেছিলেন, তাহা ক্ষণস্থায়ী। কিছুক্ষণ পরে ক্ষত্রিয় স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে তিনি তাহা ভুলিয়া গিয়া যুদ্ধে নিশ্চয়ই প্রবৃত্ত হইবেন। এই কথা গীতায় ১৮ অধ্যায়ের ৫৯ ও ৬০ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

ভুঞ্জিবে ধরার রাজ্য ; তবে হে কৌন্তেয়,
সমরসঙ্কল্প করি করহ উত্থান। ৩৭
সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয়,
সমজ্ঞান করি তবে রণে যুক্ত হও ;
তা হলে কখন পাপ হবে না তোমার। ৩৮

"যদহঙ্কার মাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে
মিথ্যৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি।
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপিতৎ॥"

এই ক্ষত্রিয় প্রকৃতি কিরূপে অর্জ্জুনকে কর্ম্মে নিয়োজিত করিবে? লোকে তাহাকে ছোট করিবে তাহার কীর্ত্তি লোপ হইবে এবং যুদ্ধে তাহার যশঃ লোপ হইবে এই সকল রাজসিক ভাবনা পরে তাহাকে যুদ্ধ করিবার কর্ম্মে নিয়োজিত করিবে। তাহাই এই কয় শ্লোকে বুঝান আছে। অথবা অর্জ্জুন প্রথমে যতটুকু বুঝিবার অধিকারী এখানে ততটুকু মাত্র বুঝান হইয়াছে, ইহাও বলা যায়।

শঙ্করাচার্য্য বলেন, লৌকিক ন্যায় বা নীতি অনুসরণ করিয়া এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

স্বর্গলাভ—স্মৃতিতে আছে—
"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডল ভেদিনৌ।
পরিব্রাড় যোগযুক্তশ্চ রণেচাভিমুখোহতঃ॥"

(৩৮) পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে অর্জ্জুনের প্রকৃতি এরূপে গঠিত যে তাহাকে যুদ্ধ করিতেই হইবে। মহাভারতে তাহা দৃষ্টান্ত দিয়া দেখান আছে। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশেও অর্জ্জুনের মোহ যায় নাই। তিনি প্রথম কয় দিন অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পরে যখন অভিমন্যুর বধ সংবাদ পাইলেন, তখন তাঁহার ক্রোধ হইল। তিনি সব ভুলিয়া গিয়া রীতিমত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং শত্রুবিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

অতএব যখন অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতেই হইবে—না করিয়া থাকিতে পারিবেন না—তখন উক্তরূপ লোকনিন্দাভয় বা স্বর্গাদি কামনা রূপ নিকৃষ্ট বুদ্ধিযুক্ত হইয়া যুদ্ধে রত হইবার পরিবর্ত্তে এইরূপ বুদ্ধিতে তাহার কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য যে, তাহাতে তাহার ধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি হইবে। অধর্ম্ম হইবে না। শুধু স্বধর্ম্ম ভাবিয়া যুদ্ধ করিলেও বিশেষ লাভ নাই। তাহাতে স্বর্গাদি ফললাভ হয় মাত্র। তাহা এই অধ্যায়ের ৩১ ও ৩২ শ্লোকে দেখান আছে।

সাংখ্যজ্ঞানে যেই বুদ্ধি—কহিনু তোমায় ;
পুনঃ যোগবুদ্ধি যাহা করহ শ্রবণ—
যে বুদ্ধিতে যুক্ত হলে যাবে কর্ম্ম পাশ। ৩৯

এই স্বধর্ম্ম নিষ্কামভাবে ফলাকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি ত্যাগ করিয়া চিত্তকে অবিকৃত রাখিয়া বা সমতাযুক্ত হইয়া আচরণ করিতে হইবে। ইহাই কর্ম্মযোগ। এই অধ্যায়ের ৩৮ হইতে ৫৩ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ও পরের কয় অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত বুঝান আছে।

মধুসূদন বলেন, স্বধর্ম্ম বুদ্ধিতে কর্ত্তব্য ভাবিয়া উক্ত রূপে যুদ্ধ করিয়া জীবহিংসা করিলেও তাহাতে পাপ হয় না। ফল কামনা করিয়া নিজের স্বার্থের জন্য যুদ্ধ করিলেই পাপ হয়। পূর্ব্ব শ্লোকে যে যুদ্ধের আনুষঙ্গিক ফল স্বর্গাদির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে দোষ নাই। আপস্তম্ব স্মৃতিতে আছে, 'ফলের জন্য আম্রবৃক্ষ রোপণ করিলেও যেমন তাহা হইতে ছায়া গন্ধ ইত্যাদি আনুসঙ্গিক রূপে পাওয়া যায়, সেইরূপ উক্তপ্রকারে ধর্ম্ম আচরণ করিলে তাহার আনুসঙ্গিক কোন গৌণ ফলে কোন দোষ হয় না।" এই অধ্যায়ের ৭০ শ্লোক দেখ।

(৩৯) সাংখ্য জ্ঞানে যেই বুদ্ধি অর্থাৎ সাংখ্য বা পরমার্থ বিবেক বিষয়ে বুদ্ধি বা জ্ঞান যাহা হইতে সংসার শোক মোহাদি সাক্ষাৎ নিবৃত্ত হয়। (শঙ্কর)। সম্যক্ প্রকারে বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করে যাহা তাহাই সাংখ্য বা সম্যক্ জ্ঞান, তাহার দ্বারা যে আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাহাই নিরুক্তকার মতে সাংখ্যজ্ঞান (বলদেব, স্বামী)। অথবা সাংখ্য অর্থে আত্মতত্ত্ব বা ঔপনিষৎ পুরুষতত্ত্ব, (রামানুজ)। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—এই গ্রন্থে যে পরমার্থতত্ত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহাই সাংখ্য—তদ্বিষয়ে যে বুদ্ধি অর্থাৎ আত্মা, জন্মাদি ছয় প্রকার (পূর্ব্বোল্লিখিত) বিকারের অতীত এবং অকর্ত্তা প্রভৃতি আত্মার যে স্বরূপ উপদিষ্ট আছে, তাহার সম্যক্ জ্ঞানই সাংখ্য জ্ঞান। সাংখ্য দর্শনে পুরুষ বা জীবাত্মার স্বরূপ ও তাহার প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ রূপ-মোক্ষের যে তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে—তাহা হইতে এই আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, এস্থলে বোধ হয় তাহাই সাংখ্য জ্ঞান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ১২ হইতে ৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত এই সাংখ্যজ্ঞান তত্ত্ব বুঝান হইয়াছে।

যোগবুদ্ধি যাহা—যোগে অর্থাৎ কর্ম্মযোগে যে বুদ্ধি। সাংখ্যেরা বা জ্ঞানীরা আত্মজ্ঞান লাভের উপায়-ভূত আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ পূর্ব্বক সুখদুঃখ লাভালাভ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব জ্ঞান দূর করিয়া (তাহা সমান জ্ঞান করিয়া) কেবল ঈশ্বরারাধনার্থে যে কর্ম্মানুষ্ঠানে সমাধি বা মনোনিবেশ করে, তাহাই কর্ম্মযোগ। ইহার বৃত্তান্ত পরে (৪০ হইতে ৫৩) শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (শঙ্কর)। অথবা সাংখ্যজ্ঞান জন্মাইবার পূর্ব্বে দেহাদি হইতে ভিন্ন, আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি হইতে জাত, ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ সংস্কার সকলের স্বরূপ নিরূপণ পূর্ব্বক মোক্ষসাধনের যে অনুষ্ঠান তাহাই যোগ (শঙ্কর) সাংখ্য মতে, পণ্ডিতগণ যোগের অনুষ্ঠান দ্বারাই আত্মজ্ঞান লাভ করে। "বৃত্তিনিরোধাৎ তৎসিদ্ধিঃ।"(সাংখ্য সূত্র, ৩।৩১) গীতায় এই যোগ প্রথম অর্থে—অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। নিষ্কাম হইয়া ও সমতা প্রাপ্ত হইয়া আসক্তি ত্যজিয়া, কেবল কর্ত্তব্যবোধে কর্ম্ম করিবার যে কৌশল—তাহাই এই যোগ।

কর্ম্মপাশ—(কর্ম্ম বন্ধন) পাপ পুণ্যাত্মক নানা রূপ কর্ম্ম হইতে, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম নামক যে আত্মার বন্ধন উৎপন্ন হয়, তাহাই কর্ম্মবন্ধন। আমরা যখন যে কর্ম্ম করি না কেন, সকলই আমাদের সূক্ষ্ম শরীরে একরূপ পরিবর্ত্তন অঙ্কিত করিয়া দেয়, তাহা কখন লোপ হয় না। এই জন্য আমরা আমাদের পূর্ব্ব কর্ম্ম বা মনোভাব পরে স্মরণ করিতে পারি; আর না করিতে পারিলেও, এ গুলি আমাদের মনে সংস্কারাবস্থায় থাকিয়া যায়। ইহাই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন বদ্ধিত করে। মৃত্যুর পরেও এই সকল সংস্কার সূক্ষ্মশরীরে থাকিয়া যায়। এই সংস্কার সমষ্টি পরজন্মে আমাদের 'স্বভাব' হয়—আমাদের প্রকৃতিকে সংগঠিত করে। ইহাতে যে বাসনা বীজ উপ্ত থাকে, পরজন্মে আমরা তদনুসারে কার্য্য করি। ইহাই কর্ম্মবন্ধন।

যোগ—এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সগুণ ঈশ্বরের সহিত, অথবা পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইবার কিম্বা ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করিবার বিভিন্নপ্রকার সাধনাকেই গীতায় "যোগ" এই সাধারণ নাম দেওয়া হইয়াছে। যথা,—ঈশ্বরে সমাহিত চিত্ত হইয়া, চিত্তের বিক্ষেপ সংযত করিয়া কর্ম্ম সাধনা, অথবা ঈশ্বরে সমাহিতচিত্ত হইবার জন্য, নির্ম্মম নিষ্কামভাবে এবং মন ও ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া, সমতাযুক্ত হইয়া, কর্ম্ম করিবার কৌশলই—কর্ম্মযোগ। সেইরূপ আত্মধর্ম্ম-বিরোধী কর্ম্ম প্রবৃত্তিকে এবং মন ও ইন্দ্রিয়কে দমন করিয়া নিয়ত আত্মজ্ঞানে স্থির হইবার যে সাধনা—তাহা সাংখ্যযোগ। (সগুণ) ঈশ্বরে চিত্তকে সমাহিত ও অনুরক্ত করিবার উপায়—ভক্তিযোগ। ব্রহ্মে (নির্গুণ) সমাহিতচিত্ত হইলে—জ্ঞানযোগ। ইহার উপায় স্বরূপ চিত্তসংযম জন্যও কর্ম্মযোগ করিতে হয়। অতএব চিত্তবৃত্তির বিক্ষেপ নিরোধ করিবার উপায় স্বরূপ যে সকল পন্থা আছে—সকলই যোগ। এ কথা এখানে অধিক বিশদ করিয়া বলিবার স্থান নাই।

অনুষ্ঠানে নিষ্ফলতা কিম্বা অন্তরায়
নাহিক ইহার; এ ধর্ম্মের আচরণ
অল্প হলে—তবু তারে, মহাভয় হতে। ৪০
অধ্যবসায়ীর বুদ্ধি হয় একরূপ
হে পার্থ হেথায়; কিন্তু অস্থির বুদ্ধি,
বুদ্ধি তার অন্তহীন—বহু শাখাময়। ৪১

(৪০) অনুষ্ঠানে নিষ্ফলতা—আরম্ভে নিষ্ফলতা এবং মন্ত্রাদি অঙ্গবৈকল্য জন্য সমাপ্তিতে বিফলতা (বলদেব)।

অল্প আচরণ—জ্ঞান বা অন্যযোগ অল্প আচরণে কোন লাভ হয় না।

মহাভয়—সংসারভয়, বা জন্মমরণাদি রূপ দুঃখভয়।

(৪১) অধ্যবসায়ীর বুদ্ধি—মূলে আছে 'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি'। অর্থাৎ নিশ্চয়স্বভাবা বুদ্ধি, প্রমাণ জনিত বিবেক বুদ্ধি (শঙ্কর)। অথবা ঈশ্বরারাধনা লক্ষণ-যুক্ত কর্ম্মযোগে ঈশ্বরভক্তিবলে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইব (স্বামী) বা আত্মতত্ত্ব অনুভব করিব, (বলদেব) এরূপ এক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই অধ্যবসায় বুদ্ধি। শঙ্করাচার্য্য আরও বলিয়াছেন, যাহাকে সাংখ্যবুদ্ধি বলা হইয়াছে, এবং বক্ষ্যমাণ লক্ষণযুক্ত যে (কর্ম্ম) যোগ বুদ্ধির কথা বলা হইবে—উভয়ই ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি। মধুসূদন বলেন এ সংসারে শ্রেয়মার্গে "সেই ইহা" এইরূপ নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি। সাংখ্য ও কর্ম্মযোগ এক (মোক্ষ) ফলসাধক বলিয়া এ উভয় বুদ্ধিই ব্যব-সায়াত্মিকা। সর্ব্বাপেক্ষা রামানুজের অর্থই নিম্নোক্ত ৪৪ শ্লোকের সহিত অধিক সঙ্গত। তিনি বলেন, মুমুক্ষুর অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে বুদ্ধি, এবং আত্মনিশ্চয় পূর্ব্বক কাম্যকর্ম্মে (কামনাধিকারে) এক ফলসাধন বিষয়ে যে বুদ্ধি (৪৪ শ্লোক দেখ) তাহাই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। কেন না, সকলপ্রকার কর্ম্মেই বুদ্ধি এক নিষ্ঠ ও স্থির হইতে পারে—যদি তাহা একরূপ ফলসাধনার্থ প্রয়োজন মনে করিয়া এক মনে করা হয়। এ কারণ, যে এ জীবনে ধনোপার্জ্জনই এক মাত্র উদ্দেশ্য করিয়া তাহার জন্য কর্ম্ম করে—তাহার বুদ্ধিও এই অর্থে ব্যব-সায়াত্মিকা বলা যায়।

বুদ্ধি অস্থির যাহার—মূলে আছে 'অব্যবসা-য়ীর বুদ্ধি'। ইহার বশে স্বর্গ পুত্র ধন প্রভৃতি নানারূপ ফল কামনা করা হয় বলিয়া এ বুদ্ধি নানারূপে বিক্ষিপ্ত

অবিবেকী যেই জন, বেদ-বাদ রত,
হে অর্জ্জুন! কহে যারা নাহি কিছু আর,
কামী—যার চেষ্টা সুধু স্বর্গ লাভ তরে,
কহে তারা যেইরূপ পুষ্পিত বচন—

জন্মকর্ম্মফলপ্রদ, ভোগৈশ্বর্য্যকর—
বহুল বিশেষ ক্রিয়া হয় যার সার; ৪২।৪৩
তাহে বিমোহিতচিত্ত হয় যেই জন—
ভোগৈশ্বর্য্যকামী যেই—নাহি করে তার
এ অধ্যবসায় বুদ্ধি একাগ্রতা লাভ। ৪৪
ত্রিগুণ বিষয় বেদ—হও দ্বন্দ্বহীন

হয়—কোন একটীতে একাগ্রতা লাভ করিতে পারে না। এই অর্থ রামানুজের। বলদেব প্রভৃতি বলেন, কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠানকারীর বুদ্ধিই অব্যবসায়াত্মিকা। ইহাদের অর্থ পূর্ব্বোক্ত কারণে তত সঙ্গত নহে।

অন্তহীন (অনন্ত)—উক্ত কামীদের কামনা অনন্ত বলিয়া এবং কর্ম্মফল গুণ ফলহেতু বহু প্রকার ভেদে বহু শাখা বিশিষ্ট বলিয়া (স্বামী)।

(৪২ ৪৩) বেদবাদ রত—বহু অর্থবাদ বা ফল সাধন প্রকাশক বেদবাক্য। (শঙ্কর ও মধু) অর্থাৎ ইহারা বেদ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিজ্ঞাত নহে (গিরি)। অথবা চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি ব্রত বা যজ্ঞাদি কর্ম্মে অক্ষয় পুণ্য লাভ হয় এইরূপ বেদার্থবাদ (স্বামী)। বেদের স্বর্গাদিফলবাদ (রামানুজ)। কর্ম্ম মীমাংসা প্রভৃতি বাদ।

কামী—বিষয়সুখবাসনাগ্রস্ত (বলদেব)।

নাহি কিছু আর—স্বর্গ পশ্বাদি ফলসাধক বেদোক্ত কর্ম্ম ব্যতীত আর কিছু নাই (শঙ্কর, রামানুজ ও বলদেব।) কর্ম্মকাণ্ড নিষ্ঠার ফল ব্যতীত আর কিছুই নাই (গিরি)। কর্ম্মকাণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নাই (মধু)। শ্রুতিতে আছে,—

"তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে,
এবমেব অমুত্র পুণ্যার্জ্জিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।"

পুষ্পিত বচন—শ্রবণ রমনীয়(শঙ্কর),বিষলতাবৎ আপাতরমণীয় (স্বামী)।

জন্মকর্ম্মফল—যাহার কর্ম্মফলে পুনর্জ্জন্ম হয় (শঙ্কর)। জন্ম এবং কর্ম্মফল (স্বামী)। জন্ম (দেহ সম্বন্ধ), কর্ম্ম (আশ্রমবিহিত ইত্যাদি কর্ম্ম), এবং ফল (স্বর্গলাভাদি)এই তিন ইহাই বলদেব অর্থ করেন। জন্ম, তদধীন কর্ম্ম ও তদধীন ফল (মধু)।

ক্রিয়া—যাহাতে স্বর্গ পশু, পুত্রাদি লাভ নিমিত্ত অনেক ক্রিয়া বাহুল্য প্রকাশিত হইয়াছে (শঙ্কর)। অর্থাৎ দেশ কাল ও অধিকারী বিবেচনায় প্রকাশিত হইয়াছে (গিরি)। বোধ হয় অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞাদি ক্রিয়া—এই রূপ অর্থ করিলেই সহজ হয়। মধুসূদন এই অর্থ করেন।

ভোগৈশ্বর্য্য—স্বর্গের সুখভোগ ও ইন্দ্রত্বাদি ঐশ্বর্য্য (মধু)।

(৪৪) একাগ্রতা—মূলে আছে 'সমাধি'। অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত উভয় প্রকার চিত্তের একাগ্রতা (গিরি)। পরমেশ্বরে একাগ্রতা (স্বামী)। ব্রহ্ম অবস্থান রূপ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি (মধুসূদন)। আত্মজ্ঞান হইতে আত্মনিশ্চয় পূর্ব্বক মোক্ষসাধনভূত কর্ম্ম বিষয়ে বুদ্ধি (রামানুজ)। যাহাতে সম্যক আত্মস্বরূপ জানা যায়,তাহাই সমাধি—নিরুক্তকার এই অর্থ করেন, (বলদেব) এই শ্লোকের শেষ অংশ টীকাকারগণ এই অর্থ করেন—এইরূপ লোকে সমাধিতে বা আত্মজ্ঞানে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিলাভ করিতে পারে না। রামানুজকে অনুসরণ করিয়া এস্থলে অন্য অর্থ করা হইয়াছে। তাহা ৪১ শ্লোকের টীকায় দেখাইয়াছি।

(৪৫) ত্রিগুণ—(মূলে আছে ত্রৈগুণ্য)—সংসার (শঙ্কর)। গিরি ও মধু বলেন, এস্থলে বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে বুঝাইতেছে, বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিশ্চয়ই সংসারে লিপ্ত হইতে হয়—তাই বেদ ত্রিগুণ বা সংসার ব্যাপার প্রকাশক। স্বামী বলেন, সকাম অধিকারীর কর্ম্মফল সম্বন্ধ বেদ হইতে প্রতিপন্ন হয়। সত্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির বিকারেই সংসারের উৎপত্তি। সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক অধিকারীভেদে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ক্রিয়াকাণ্ড ও তদুপযুক্ত কর্ম্মফলের ব্যাপার বেদে বর্ণিত আছে,তাহার ফলে এই ত্রিগুণাত্মক সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। রামানুজ বেদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া কিছু ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন,ত্রৈগুণ্য অর্থে সত্ব রজ তম প্রচুর পুরুষ। রাজসিক তামসিক লোক স্বর্গাদি সাধনরূপ হিত বুঝে না। সাত্বিক লোক

ত্রিগুণ-অতীত, পার্থ! নিত্য সত্বস্থিত;
যোগ ক্ষেম পরিহরি হও আত্মরত। ৪৫
সর্ব্বত্র প্লাবিলে জলে, ক্ষুদ্র সরসীর
যেই প্রয়োজন—তত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণের,
হয় সেই অর্থসিদ্ধি—বেদে সমুদায়। ৪৬
কর্ম্মে শুধু অধিকার তব—নহে কভু
কর্ম্মফলে; কর্ম্মফলপ্রার্থী নাহি হও;
অকর্ম্মে আসক্তি যেন নাহি থাকে তব।৪৭

মোক্ষ বিমুখ হইলে কামনা বশে উদ্‌ভ্রান্ত হয়। এইজন্য বেদ ত্রৈগুণ্য বিষয়। এ অর্থ সঙ্গত নহে।

ত্রিগুণ অতীত—অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির অতীত হইয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থান কর। শঙ্করাচার্য্য ও স্বামী অর্থ করেন—নিষ্কাম হও। রামানুজ বলেন, ইদানিং অর্জ্জুনের সত্ব প্রচুর জন্য রজ ও তম গুণ সঙ্কীর্ণ হওয়ায়, তাহার এ দুই গুণ যাহাতে আর বৃদ্ধি না হয়, কেবল সে এক সত্বগুণেই যুক্ত থাকে, ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। বলদেব বলেন, সমুদয় বেদের শিরোভূত বেদান্তনিষ্ঠাই নিস্ত্রৈগুণ্য বা নিষ্কামভাব।

দ্বন্দহীন—সুখ দুঃখ,লাভালাভ,শীতগ্রীষ্ম প্রভৃতি বিপরীত অর্থবাচক বা প্রতিপক্ষীয় পদার্থকে দ্বন্দ্ব বলে। রামানুজ অর্থ করেন—সকল সাংসারিক স্বভাব নির্গত।

সত্ত্বযুত—সত্ত্বগুণাশ্রিত (শঙ্কর)। সৎগুণাশ্রিত (গিরি)। ধৈর্য্যযুত (স্বামী)। রজঃ তম গুণদ্বয় রহিত করিয়া নিত্য প্রবৃদ্ধ সত্বস্থ(রামানুজ)। বোধ হয় এস্থলের এই'সত্বযুক্ত'ও পূর্ব্বের 'নিস্ত্রৈগুণ্য'এই দুইটীর সামঞ্জস্য করিতে গিয়া রামানুজ 'ত্রিগুণ বিষয় বেদ, ইহার পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ করিয়াছেন। এস্থলে গিরি ও স্বামীর অর্থ ধরিলেও কোন গোল থাকে না।

যোগক্ষেম—অপ্রাপ্ত বিষয় উপার্জ্জনই যোগ, আর প্রাপ্ত বিষয় রক্ষাই ক্ষেম। (মিতাক্ষরা ১।১০০ ও মনু ৭।২২৭ দেখ)। 'যোগক্ষেম' ও 'সত্বযুত' এই দুই বিশেষণের সামঞ্জস্য করিয়া রামানুজের মত গিরিও অর্থ করেন—এই সকলে ও দ্বন্দে অভিভূত হওয়া রজ ও তম গুণের কার্য্য, তাই এ সমস্ত ত্যাগ করিয়া সত্ব গুণস্থ হইবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

(৪৬) সর্ব্বত্র প্লাবিলে জলে—মূলে আছে, "সর্ব্বতঃ (ত্র) সংপ্লুতোদকে"। রামানুজ, স্বামী ও বলদেব ইহার অর্থ করেন—বৃহৎ হ্রদ। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে স্নানপানাদি যে যে প্রয়োজন স্বতন্ত্ররূপে সিদ্ধ হয়, এক বৃহৎ জলাশয়ে তাহা সমস্তই একত্র সুসম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহাই অধিক সঙ্গত। এ শ্লোকের অপরার্দ্ধ লইয়াও টীকাকারগণ এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। শঙ্কর অর্থ করেন, সমস্ত বেদোক্ত কর্ম্মে যে ফল, তাহা পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসীর জ্ঞানফলের অন্তর্বর্ত্তী হয়। গিরি বলেন, সমস্ত বেদোক্ত কর্ম্ম হইতে বিষয়বিশেষ উপরতি জন্ম যে সুখ জন্মায়, তাহাও আত্মজ্ঞের আনন্দের অন্তর্গত হয়। স্বামী বলেন—ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের ব্রহ্মানন্দে কর্ম্মজনিত সমস্ত ক্ষুদ্রানন্দ ডুবিয়া যায়। কেহ অর্থ করেন—সকল প্রকার কর্ম্মের তথ্যই বেদে পাওয়া যায়। এস্থলে সঙ্গত অর্থ এই বোধ হয় যে, কর্ম্ম করিবার একটা মূলসূত্র এই গীতোক্ত কর্ম্ম যোগ হইতে পাইলে বেদোক্তাদি সমুদায় কর্ম্মই তাহার অন্তর্গত করিয়া লওয়া যায়। কর্ত্তব্য বলিয়া—অব্যবসায় বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিলে আর গোলযোগ থাকে না।

মধুসূদন যে অর্থ করেন, তাহাও এস্থলে উল্লেখের প্রয়োজন। তিনি বলেন, (উদপানে) ক্ষুদ্র জলাশয়ে (যাবান্)স্নান পানাদিরূপ যে যে(অর্থ)প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, (সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে) পর্ব্বত নিঝরিণী গুলি সকল দিক্ হইতে প্রাবিত হইয়া কোন উপত্যকায় একত্রিত হইলে যে বৃহৎ হ্রদ উৎপন্ন হয়, সেই মহতী জলাশয়ে (তাবান্ অর্থ) সেইরূপ হয়। সর্ব্ববেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড সাধনে যে হিরণ্যগর্ভানন্দ ভোগ পর্য্যন্ত ফল পাওয়া যায়, সেই সমস্ত ক্ষুদ্রানন্দ ব্রহ্মজ্ঞানীর ভূমা ব্রহ্মানন্দের সামান্য অংশমাত্র। অতএব এই ভূমানন্দ লাভ করিলে আর উক্ত ক্ষুদ্রানন্দের প্রয়োজন হয় না।

(৪৭) কর্ম্মেতেই অধিকার তব—তত্বজ্ঞানার্থী অর্জ্জুনের (নিষ্কাম) কর্ম্মব্যতীত জ্ঞান নিষ্ঠায় অধিকার নাই (শঙ্কর)। তবে নিগমস্থ মুমুক্ষু অর্জ্জুনের শ্রুত্যুক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কাম্যাদি সর্ব্বকর্ম্ম ফল বিশেষের সম্বন্ধ রহিত পূর্ব্বক করিবার অধিকার আছে। (রামানুজ)। মধুসূদন অর্থ করেন, পূর্ব্বশ্লোকোক্ত পরমানন্দ যখন কেবল নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা লাভ করা যায় না,যখন তাহা কেবল আত্মজ্ঞাননিষ্ঠতাতেই লাভ করা যায়, তখন আয়াস সাধ্য বহিরঙ্গ সাধনযুক্ত কর্ম্মে প্রয়োজন নাই। কিন্তু কর্ম্মত্যাগ করিয়া জ্ঞানই সম্পাদ্য – এ কথা অর্জ্জুনের ন্যায় স্বভাবযুক্ত কেহ বলিতে পারে না। কেন না, নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা প্রথমতঃ চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় মন জয় না হইলে জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না। অর্জ্জুনের চিত্তশুদ্ধি জন্য বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কেবল কর্ম্ম করিবারই অধিকার আছে। কর্ম্ম ফলে তাঁহার অধিকার নাই। কেন না ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিলে কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইবে না। কর্ম্ম বন্ধন কারণ হইবে।

স্বামী বলেন,যখন সর্ব্বকর্ম্মফল ঈশ্বরারাধনায় পাওয়া যায়, তখন বন্ধন হেতু কর্ম্মফলের প্রবৃত্তি বা কামনা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে। বলদেবও এইরূপ সহজ অর্থ করেন।

তিনি বলেন, শুদ্ধ চিত্ত হইয়া স্বধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য বোধে অর্জ্জুনের যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য—এস্থলে ইহাই উদ্দিষ্ট হই-

আসক্তি করিয়া ত্যাগ, যোগযুক্ত হয়ে,
কর্ম্ম কর—সিদ্ধ্যসিদ্ধি সমজ্ঞান করি ;
কহে যোগ,—ধনঞ্জয় ! এই সমতাকে। ৪৮
বুদ্ধিযোগ হতে কর্ম্ম অপকৃষ্ট অতি ;
ফল হেতু কর্ম্ম করে কৃপণ যে জন—
এই বুদ্ধি, ধনঞ্জয় ! করহ আশ্রয়। ৪৯
সুকৃত দুষ্কৃত দুই—বুদ্ধি-যুক্ত হয়ে,
ত্যজে হেথা ; তাই যুক্ত হও এই যোগে—
যোগ হয় সুধু এই কর্ম্মের কৌশল। ৫০
এই বুদ্ধিযুক্ত হয়ে মনীষী সকল,
কর্ম্মজাত ফল ত্যজি—জন্ম-বন্ধ হতে
মুক্ত হয়ে—পায় তারা পদ শান্তিময়। ৫১
যেইকালে বুদ্ধি তব, হইবেক পার
মোহের গহন হতে—হইবে নির্ব্বেদ
সেইকালে, শ্রুত আর শ্রোতব্য বিষয়ে। ৫২
শ্রুতিতে বিক্ষিপ্ত তব বুদ্ধি যেইকালে

আছে। এ অর্থ সঙ্কীর্ণ, কিন্তু বেশ সঙ্গত। বঙ্কিম বাবু বলেন, সাধারণতঃ যাহাকে কাজ বা action বলে, তাহাই কর্ম্ম শব্দে এখানে বুঝাইতেছে, কেবল বৈদিক কর্ম্ম বুঝাইতেছে না।

(৪৮) যোগযুক্ত—পরমেশ্বরে একপরতা, (স্বামী)। কেবল ঈশ্বরার্থ বা তাঁহাকে তুষ্টকরিবার জন্য কর্ম্ম করা, এবং কর্ম্ম করিতেছি বলিয়া ঈশ্বর আমার শুভকরন, এরূপ কামনা ত্যাগ করাই যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করা (শঙ্কর)। সিদ্ধ্যাসিদ্ধিতে সমত্বরূপ চিত্ত সমাধানই যোগ (রামানুজ)।

সিদ্ধ্যাসিদ্ধি—শঙ্কর ও গিরি বলেন, সত্ত্বশুদ্ধি ও তাহার পরিণামে জ্ঞান প্রাপ্তিই কর্ম্মের সিদ্ধি তাহার বিপর্য্যয় কর্ম্মের অসিদ্ধি। ইহাতে এই অর্থ হয় যে, কর্ম্ম করিয়া আমার চিত্তশুদ্ধি হইবে, বা আমি জ্ঞান লাভ করিব এরূপ কামনাও ত্যাগ করিবে। যে অভিপ্রায়ে(ইংরাজী কথা end) কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলে, তাহা তুমি সিদ্ধি করিতে পারিবে কি না, তাহাও দেখিবার আবশ্যক নাই ; কর্ত্তব্য বুঝিলেই কর্ম্ম করিবে। এই সহজ অর্থও এখানে অসঙ্গত হয় না। মধুসূদন বলেন, ফলসিদ্ধিতে হর্ষ ও ফলের অসিদ্ধিতে বিষাদ ত্যাগ করাই সমত্ব জ্ঞান।

(৪৯) বুদ্ধিযোগ হতে—উক্তরূপ সমত্বাদি-জ্ঞানে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি যুক্ত কর্ম্ম অপেক্ষা। বুদ্ধি সমত্ব বুদ্ধি (শঙ্কর)। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মযোগ (স্বামী)। ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়া সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মযোগ, আত্মবুদ্ধিসাধনভূত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ (মধু)।

কর্ম্ম—কাম্য কর্ম্ম (শঙ্কর ও মধু)।

কৃপণ—কর্ম্মফলপ্রার্থী (রামানুজ)। এই অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকের টীকা দেখ।

এই বুদ্ধি—উক্তরূপ বুদ্ধি। যোগ বুদ্ধি (স্বামী)। কিম্বা তাহার পরিপাক জাত সাংখ্য বুদ্ধি।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক বুঝিবার জন্য এই শ্লোক এবং ইহার পরবর্ত্তী শ্লোক বিশেষ করিয়া বুঝা আবশ্যক। সেই স্থানে এই দুই শ্লোকের বিস্তারিত উল্লেখ প্রয়োজন হইবে।

(৫০) কৌশল—(মূলে আছে 'কর্ম্মসু কৌশলং') স্বধর্ম্ম নিরত, সমত্বজ্ঞানযুক্ত, ঈশ্বরার্পিত চিত্ত হইয়া কর্ম্ম করিবার যে কৌশল, তাহাই যোগ (শঙ্কর)। কর্ম্মের ফল বন্ধন হইলেও ঈশ্বরার্থে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মোক্ষলাভ করিবার কৌশল, তাহাই যোগ (স্বামী)। সংসার বন্ধনকারক দুষ্ট কর্ম্ম নিবারণ চতুরতা (মধু)। বঙ্কিম বাবু অর্থ করেন, যিনি আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম যথাবিধি নির্ব্বাহ করেন তিনিই যোগী। কেহ পাঠ করেন—'কর্ম্ম সুকৌশলং, অর্থাৎ সুকৌশল যুক্ত কর্ম্ম। ইহাতে বিশেষ অর্থভেদ হয় না।

(৫১) পদশান্তিময়—(মূলে আছে 'পদ অনাময়') বিষ্ণুর ভোগাক্ষ্য পরমপদ বিষ্ণুলোক (শঙ্কর ও স্বামী)। নিষ্কাম ভাবে সমত্ব বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় "তত্ত্বমসি" জ্ঞান, অজ্ঞান মেঘ বিনষ্ট করিয়া আপনিই প্রকাশিত হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি রূপ মোক্ষ হইবে (মধু)।

(৫২) মায়ার গহন—'মূলে আছে মোহ কলিল' তুচ্ছ ফলাভিলাষ হেতু অজ্ঞান গহন (বলদেব)। আমি আমার এই অহঙ্কারাত্মক অজ্ঞান (মধু)।

নির্ব্বেদ—বৈরাগ্যযুক্ত, আসক্তিবিহীন।

শ্রুত কিম্বা শ্রোতব্য বিষয়—যে উপদেশ পূর্ব্বে শ্রুত হইয়াছে বা হইবে। (শঙ্কর ও স্বামী)। আধ্যাত্মিক শাস্ত্র ব্যতিরিক্ত শাস্ত্রের উপদেশ, (গিরি)। শ্রুত ও শ্রোতব্য কর্ম্ম ফলের বিষয়, (মধু)। সর্ব্বকর্ম্মের উপলক্ষণ (রাঘবেন্দ্রযতি)। কেহ অর্থ করেন, বেদ ও স্মৃতি শাস্ত্র।

(৫৩) শ্রুতিতে বিক্ষিপ্ত—অনেক সাধ্য সাধন বিষয় শ্রবণ করিয়া (শঙ্কর)। অথবা নানা লৌকিক ও বৈদিক কার্য্যের ফলশ্রুতি দ্বারা (স্বামী)। নানাবিধ ফল শ্রবণে কাম্য কর্ম্মে বিক্ষিপ্ত (মধু)। শ্রবণ মাত্র বিক্ষিপ্ত (রামানুজ)। কেহ কেহ অর্থ করেন, বেদ বাক্যে বিক্ষিপ্ত

সমাধি—পরমাত্মায় সমাধি (মধু) যাহাতে সমাহিত হওয়া যায়, বা আপনাকে ডুবাইয়া দেওয়া যায়, তাই

হবে স্থির, সমাধিতে হইবে অচল—
সেই কালে এই যোগ লভিবে নিশ্চয়। ৫৩

অর্জ্জুন—

সমাধিতে স্থিত-প্রজ্ঞ যে জন কেশব !—
কিরূপ লক্ষণ তার ? হয় কি প্রকার
অবিস্থান তার কিম্বা বচন চলন ? ৫৪

শ্রীভগবান—

ত্যজে যেই মনোগত কামনা সকল,
আত্ম-বলে রহে তুষ্ট আত্মাতে আপন;—
স্থিত-প্রজ্ঞ কহে, পার্থ, তখন তাহারে। ৫৫
দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত, সুখে স্পৃহাহীন,
বীতরাগভয়ক্রোধ—স্থিতধী সে মুনি। ৫৬
সর্ব্বত্র যে স্নেহশূন্য, নহে উল্লাসিত

আত্মা (শঙ্কর ও স্বামী) জাগ্রত স্বপ্নরহিত বা বিক্ষেপ রহিত সুষুপ্তি অবস্থা (মধু) যাহাতে চিত্ত সমিহিত হয় সেই সমাধি (বঙ্কিম বাবু)।

স্থির— বিক্ষেপ বর্জ্জিত (শঙ্কর)।

এই যোগ বিবেক প্রজ্ঞা সমাধি (শঙ্কর)। যোগফল তত্ত্বজ্ঞান (স্বামী) আত্মসাক্ষাৎকার 'সোঽহং' জ্ঞানরূপ যোগ (মধু)। স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থা। আত্মাব লোকান (রামানুজ)।

(৫৪) স্থিত প্রজ্ঞা—নিশ্চলা বুদ্ধি যার (স্বামী)। যাহার সমাধি লাভ হইযাছে অথবা পরব্রহ্ম আমি [illegible] হইযাছি এরূপ জ্ঞান যাহার, অথবা যিনি [illegible]ত্যাগ করিয়া জ্ঞানযোগ নিষ্ঠায় প্রবৃত্ত কিম্বা [illegible] কর্ম্মযোগ প্রবৃত্ত, তাঁহারা স্থিতপ্রজ্ঞ (শঙ্কর)। বঙ্কিম বাবু অর্থ করেন, যখন তোমার বুদ্ধি সমাধিতে অর্থাৎ পরমেশ্বরে স্থির হইবে, তখন তুমি কর্ম্মযোগ সিদ্ধ হইবে।

কিরূপ লক্ষণ —মধুসূদন বলেন, স্থিতপ্রজ্ঞের দুই অবস্থা—সমাধি ও ব্যুত্থান। এই শ্লোকে চারিটী প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্নে, সমাধিযুক্ত স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা হইয়াছে। তাহার পর তিন প্রশ্নে (১) ব্যুত্থিত স্থিত-প্রজ্ঞের বাক্য, (২) অবস্থান বা মনের ও ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ কার্য্য, এবং (৩) বিষয় বিচরণের অবস্থা বা কর্ম্ম [illegible]—তাহাই জিজ্ঞাসা হইয়াছে।

(৫৫) মনোগত কামনা—কামনা মনেরই ধর্ম্ম (বলদেব)। সঙ্কল্পাত্মক মনোবৃত্তি—"প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি" ভেদে পাঁচ প্রকার। (পাতঞ্জল দর্শন) কামনাত্যাগ অর্থাৎ সর্ব্বচিত্তবৃত্তি শূন্য হওয়া। কারণ যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ (মধুসূদন)।

রহে তুষ্ট—যে বাহ্য বস্তু লাভে নিরপেক্ষ হইয়া কেবল নিজ আত্মাতেই তুষ্ট অর্থাৎ পরমাত্মা দর্শনরূপ [illegible] আস্বাদনে পরিতুষ্ট আত্মারাম সন্ন্যাসী (শঙ্কর)। আত্মাবলোকন তুষ্ট, (রামানুজ)। পরমাত্মাতে তদেকচিত্ত হইয়া তৎপ্রসাদে সন্তোষ যুক্ত (রাঘবেন্দ্র যতি)। [illegible] আছে—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামাযেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।"

এই শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। বঙ্কিম বাবু বুঝাইয়াছেন যে, আত্মাতে আনন্দযুক্ত বা আত্মারাম হইলে যে বহির্বিষয়ে আনন্দ উপভোগ করিতে হইবে না —এই শ্লোকে বা ইহার পরের কয় শ্লোকে এমন কথা নাই। সেই সকল স্থায় মত উপভোগের বিঘ্নকারী কামনা ও ইন্দ্রিয় বশ করিতে হইবে ইহাই উদ্দেশ্য।

(৫৬, ৫৭)—মধুসূদন বলিয়াছেন, ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ "কি বলেন"—এই দুই শ্লোকে সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এ কথা ঠিক বুঝা যায় না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কামনা মনের ধর্ম্ম। অতএব কামনা ত্যাগ করিতে হইলে বা নিষ্কাম হইতে হইলে সেই মনের বৃত্তিগুলি দমন করা প্রথম কর্ত্তব্য। কারণ, সেই গুলিই কামনার বীজ। অতএব সেই মনোবৃত্তি গুলিই আগে বশ করিতে হয়। সে বৃত্তিগুলি কি তাহা এই দুই শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা, দুঃখ, উদ্বেগ, সুখ, স্পৃহা, রাগ, ভয়, ক্রোধ, উল্লাস ও দ্বেষ। মধুসূদন এই সকল বৃত্তির নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেন।

দুঃখ—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ রজঃগুণজ সন্তাপাত্মক চিত্তবৃত্তি।

উদ্বেগ—সেই দুঃখ হেতু অনুতাপাত্মক ভ্রান্তিরূপ তামস বৃত্তি।

সুখ—উক্তরূপ ত্রিবিধ সাত্ত্বিক প্রীতিজনক চিত্তবৃত্তি।

স্পৃহা—সুখজ ধর্ম্মানুষ্ঠান বিনা সুখের [illegible] তামস চিত্তভ্রান্তি। অথবা তৃষ্ণাত্মক চিত্তবেগ।

রাগ—(অনুরাগ)শোভনঅধ্যাস নিবন্ধন বিষয়ে রঞ্জনাত্মক রাজসী চিত্তবৃত্তি।

ভয়—অনুরাগের বিষয়ে বিঘ্নকারী বা নাশক উপস্থিত হইলে তাহাকে বাধা দিবার অসামর্থ্য জন্য চিত্তের তামসিক দীনতা।

ক্রোধ—সেই বাধা নিবারণের ক্ষমতা থাকিলে, আপনাকে বড় মনে করিয়া তাহাকে বাধা দিবার চেষ্টায় যে চিত্ত জ্বালা হয় সেই রাজস বৃত্তি।

স্নেহ—অন্য বিষয়ে প্রেমাপরপর্য্যায় তামস বৃত্তি বিশেষ। অন্যের সুখ দুঃখ ক্ষতি বৃদ্ধি হইলে, আত্ম

লভি শুভ, বিষাদিত নাহি হয় কভু
অশুভ লভিয়া,—তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ৫৭
করে যেই প্রত্যাহার ইন্দ্রিয় সকল
ইন্দ্রিয়-বিষয় হতে,—কূর্ম্ম করে যথা
নিজ অঙ্গ সঙ্কুচিত—স্থিতপ্রজ্ঞা তার। ৫৮
বিষয়-সম্ভোগ-হীন দেহীর না যায়
বিষয় বাসনা কভু; আত্ম দৃষ্টি লভি
বিষয়ের অনুরাগ তার হয় দূর। ৫৯
বিবেকী পুরুষ যেই, কত চেষ্টা করে—
প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণ তথাপি সবলে
মন তার, হে অর্জ্জুন, করয়ে হরণ। ৬০
যোগী যেই—সে সকল করিয়া সংযম
হয় মম পরায়ণ; ইন্দ্রিয় যাহার
রহে বশে,—প্রজ্ঞা তার হয় প্রতিষ্ঠিত। ৬১
করিলে বিষয় ধ্যান, জন্মে মানবের

নাতে তাহা আরোপ করা। বলদেব বলেন, ঔপাধিক প্রীতিশূন্য—নিরুপাধিক প্রীতি শূন্য নহে। শঙ্কর বলেন, দেহ জীবনাদিতে স্নেহ। স্বামী বলেন পুত্রমিত্রাদিতে স্নেহ। ভক্তেরা বলেন ঈশ্বর ব্যতীত অন্য পদার্থে স্নেহ। 'আমার' এই অভিমানে স্ত্রীপুত্র দেহাদিতে যে মমতা—তাহাই এস্থলে উদ্দিষ্ট হইয়াছে বোধ হয়, নতুবা সর্ব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করিয়া তাহাতে যে প্রীতি তাহা দোষাবহ নহে।

দ্বেষ—দুঃখহেতু অশুভ বিষয়ে অসূয়া জনিত নিন্দাদি প্রবর্ত্তক ভ্রান্ত তামস বৃত্তি।

উল্লাস—(মূলে আছে অভিনন্দন) সুখ হেতু (স্ত্রী পুত্র ধনাদি) শুভ বিষয়ে প্রশংসা প্রবর্ত্তক ভ্রান্ত চিত্ত বৃত্তি।

(৫৮)—মধুসূদন বলেন, স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপে অবস্থান করেন এই প্রশ্নের উত্তরে ৫৮ হইতে ৬৩ শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে। প্রারব্ধকর্ম্মবশে ব্যুত্থিত হইয়া ইন্দ্রিয়গণ বিক্ষিপ্ত হইলে, তাহাদিগকে সমাধি জন্য পুনর্ব্বার বিষয় হইতে আকর্ষণ বা নিরোধ করিতে হয়—তাহাই এই ৫৮ শ্লোকে বুঝান হইয়াছে।

(৫৯) আত্মদর্শনই যে ইন্দ্রিয়ের এই বিষয়াকর্ষণ নিবারণের মুখ্য উপায়—এই শ্লোকে ইহা বুঝান হইয়াছে। আত্মাতে চিত্ত স্থির হইলেই ইন্দ্রিয় দমন হয়, বাসনায় কোনচিত্তবিক্ষেপ ক্ষমতা থাকে না—তাহা পরবর্ত্তী ৭০ শ্লোকে বুঝান হইয়াছে।

বিষয়সম্ভোগ হীন—(মূলে আছে 'নিরাহারস্য', অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বিষয় আহরণ করিতে পারে না—বা করে না (শঙ্কর)। ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণই তাহার আহার। যে তাহাতে অশক্ত, যেমন জড় আতুর প্রভৃতি, তাহারা নিরাহারী। ইহারা আর যাহারা চিত্ত শুদ্ধির পূর্ব্বে কর্ম্ম সন্ন্যাস করিতে যায়, বিষয় ভোগ করে না, তাহারা (রস) আশক্তিটুকু (বর্জ্জং) বাদ দিয়া বিষয় ভোগ ত্যাগ করে। অর্থাৎ তাহাদের মনের মধ্যে পূর্ব্ববাসনাজাত বিষয়ভোগতৃষ্ণা বা অনুরাগ টুকু থাকিয়া যায়।

আত্মাদৃষ্টে—(মূলে আছে "পরং দৃষ্ট্বা") অর্থাৎ বিষয় হইতে শ্রেষ্ঠ পরমাত্মাকে দেখিয়া। ইহা সকল টীকাকারগণই অর্থ করেন।

• (৬০) ইন্দ্রিয় নিগ্রহ প্রথমে না করিলে—৫৬ ও ৫৭ শ্লোকোক্ত সুখ দুঃখাদি মনোবৃত্তি দমন করা যায় না—ইহাই এই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে। মূলোচ্ছেদ করিলে তবে বৃক্ষ নষ্ট হয়। নদীর গতি বন্ধ করিতে হইলে তাহার উৎপত্তি স্থান রোধ করিতে হয়। সেই জন্য প্রথমে ইন্দ্রিয় প্রবর্ত্তিত মনের দমন জন্য এই ইন্দ্রিয় বিক্ষেপের দমন করিতে হয়।

কঠোপনিষদের তৃতীয় বল্লীর ৫ম শ্লোক যথা—
"যস্তু বিজ্ঞানবান ভবত্যযুক্তেন মনসা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বাইব সারথেঃ॥"

(৬১) এই শ্লোকে ইন্দ্রিয় বশ করিবার মুখ্য উপায় (Key) দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া তাঁহাতে যুক্ত বা তাঁহাতে মন স্থির করিলেই ইন্দ্রিয় সংযম করিতে পারা যায়। ঈশ্বরপরায়ণ বা তাঁহাতে অনুরক্ত হওয়া ও আত্মজ্ঞানে অবস্থিতি করা উভয়ের ফল এক। তাহা এখানে আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। মধুসূদন বলিয়াছেন যেমন বলবান রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দস্যুদিগকে নিবারণ করা যায় ও বা দস্যু আপনিই সরিয়া যায় সেইরূপ ভগবানের আশ্রয় লইলে দুষ্ট ইন্দ্রিয় আপনিই নিগৃহীত হয়।

কঠোপনিষদের ৩ বল্লীর ৬ শ্লোক এইরূপ—
"যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥

(৬২-৬৩)—ঈশ্বরে মন সমাহিত না করিয়া ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ না করিয়া, যদি বিষয়ে মন আকর্ষিত হয়; অর্থাৎ বিষয় ভাবনা করা যায়,—তবে যে ফল হয়, তাহা এই দুই শ্লোকে বুঝান হইয়াছে। আমাদের এক দিকে আত্মা আর অন্য দিকে বিষয় রহিয়াছে। মধ্যে আছে বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়। এক দিকে বিষয় এ গুলিকে আকর্ষণ করিতেছে। অন্যদিকে ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহাদের আত্মাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে। বিষয় আকর্ষণই তন্মধ্যে প্রবলতর। কেন না বিষয় আমাদের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ আপাত রমণীয় ও দিবার প্রকাশমান। আত্মা প্রত্যক্ষ অথবা কেবল অন্তর প্রত্যক্ষ সাপেক্ষাও কষ্টকর সাধনা লভ্য ও রাত্রের ন্যায় প্রথমে অপ্রকাশিত। কাজেই বিষয়াকর্ষণ বড়ই প্রবল। অনেকরূপ কৌশল করিয়া সাধনা করিতে [illegible]

আসক্তি তাহাতে; সেই আসক্তি হইতে
জন্মে কাম—কাম হতে ক্রোধের উদ্ভব; ৬২
ক্রোধ হতে জন্মে মোহ; ভ্রম—মোহ হতে,
এ স্মৃতিবিভ্রম হতে হয় বুদ্ধি নাশ—
বুদ্ধি-নাশ হতে হয় বিনষ্ট সে জন। ৬৩
আসক্তি-বিরাগ-হীন, আত্মবশেস্থিত,
ইন্দ্রিয়ের দ্বারা করি বিষয় সম্ভোগ,
আত্ম-জয়ী জন করে প্রসন্নতা লাভ। ৬৪
এই প্রসন্নতা লভি তার দুঃখ সব
হয় দূর; যেই জন প্রসন্ন অন্তর,—
ত্বরায় তাহার বুদ্ধি হয় প্রতিষ্ঠিত। ৬৫
যোগযুক্ত নহে যেই, নাহি বুদ্ধি তার—
না থাকে ভাবনা তার, ভাবনাহীনের
নাহি শান্তি; অশান্তের সুখ বা কোথায়। ৬৬
যে বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়ের মন অনুগামী
নিশ্চয় সে প্রজ্ঞা তার করয়ে হরণ,
বায়ু যথা হরে তরি বারিধি মাঝারে। ৬৭
অতএব সমুদয় ইন্দ্রিয় যাহার
হইয়াছে নিগৃহীত বিষয় হইতে,—
হে অর্জ্জুন, প্রতিষ্ঠিত হয় প্রজ্ঞা তার। ৬৮
অন্য জীব ভাবে যাহা নিশার আঁধার—
সংযমী জাগ্রত তাহে, যাহে জাগে জীব
সেই নিশি, তত্ত্বদর্শী মুনির নিকট। ৬৯

আকর্ষণ প্রবল করা যায়। এই আকর্ষণ যত প্রবল হয়, বিষয় আকর্ষণ তত ক্ষীণ হয়। বিষয় আকর্ষণ প্রবল হইলে আত্মার আকর্ষণ ক্ষীণ হয়। বিষয়ের এই টান প্রবল হইয়া কিরূপে আমাদের ক্রমে ক্রমে অজ্ঞাতসারে মৃত্যুর দিকে নিয়া যায় তাহাই এই দুই শ্লোকে দেখান হইয়াছে।

বিষয়ধ্যান—সুখ বুদ্ধিতে বিষয় চিন্তা (শঙ্কর)। মধুসূদন বলেন, বাহ্য ইন্দ্রিয় নিগৃহীত হইলেও যদি কেহ মনে মনে বিষয় ধ্যান করে বা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করে। এ অর্থ সঙ্কীর্ণ।

আসক্তি—মমতা উৎপাদক আসক্তি। শোভন অধ্যাস লক্ষণ যুক্ত প্রীতি। (মধু)

কাম—তৃষ্ণা, বাসনা। মমতা (মধু)।

ক্রোধ—এই বাসনা বা ইচ্ছা কাহারও দ্বারা প্রতিহত হইলে সেই প্রতিঘাতরূপ চিত্তজ্বালাই ক্রোধ, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

(৬৩) মোহ—কার্য্য ও অকার্য্য বিবেকজ্ঞান লোপ।

ভ্রম—ইন্দ্রিয় বিষয়ে যত্ন।

বুদ্ধিনাশ—আত্মজ্ঞানার্থ অধ্যবসায় নাশ।

বিনষ্ট—বিষয় ভোগে নিমগ্নহওয়ায় ধর্ম্মপথহইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সংসারাবর্ত্তন বা নরকগতি (বলদেব)।

স্মৃতি—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশাদি হইতে সংস্কার জাত স্মৃতি। (শঙ্কর)

(৬৪-৬৫)—মন ও ইন্দ্রিয়কে প্রথমে বিষয় হইতে আত্মাতে আকর্ষণ করিতে অভ্যাস করিয়া যখন বৈরাগ্য জন্মিয়া চিত্ত বশ হইবে, তখন চিত্তকে বিক্ষিপ্ত না করিয়া [illegible] আসক্তি ও ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্য হইয়া সমত্বজ্ঞানে নিষ্কাম ভাবে ও কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ করিলেও চিত্তের নির্ম্মলতা জন্য প্রসন্নভাব (আত্মপ্রসাদ) দূর হয় না। কাজেই দুঃখাদি চিত্ত বিকার থাকে না, বুদ্ধি স্থির হয়।

আসক্তি ও বিরাগ—(মূলে আছে 'রাগ দ্বেষ') অর্থাৎ সুখকর বিষয়ে আসক্তি ও দুঃখকর বিষয়ে বিরক্তি। পাতঞ্জল সূত্রে আছে—"সুখানুশয়ী রাগঃ, দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।" (২—৭।৮)

প্রসন্নতা—বিষয়াসক্তি রূপ মলা দূর হওয়ায় চিত্তের নির্ম্মলতা।

বুদ্ধি—আত্মস্বরূপ বিষয়ক বুদ্ধি (মধু)।

(৬৬) অযুক্ত—অসমাহিত চিত্ত।

ভাবনা—আত্মজ্ঞানাভিনিবেশ (শঙ্কর ও গিরি)। ধ্যান (স্বামী)। নিদিধ্যাসনাত্মক আত্ম বিষয়ে ভাবনা (মধু)।

শান্তি—অবিদ্যাজনিত সমস্ত লৌকিক ও অলৌকিক (বা বৈদিক) কর্ম্মে বিক্ষেপ নিবৃত্তি (মধু)। বিষয় চেষ্টা নিবৃত্তি হেতু প্রসাদ (বলদেব)।

সুখ—মোক্ষানন্দ (মধু)।

(৬৭)—এই শ্লোকের অর্থরূপ যদি কোন একটী ইন্দ্রিয়ের বিক্ষেপ নিবৃত্তি হইতে বাকি থাকে, তাহা হইলে, ইহাই মনকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া শেষে বুদ্ধি পর্য্যন্ত বিচলিত করিতে পারে। সুতরাং সকল ইন্দ্রিয় গুলিকেই প্রথমে সংযত করিতে হইবে—নিগৃহীত করিতে হইবে। ইহা পরের শ্লোকে বলা হইয়াছে।

হরণ—বাহ্য ইন্দ্রিয় বিষয়ে প্রবর্ত্তিত—সুতরাং ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয় (রামানুজ, মধু)। বিক্ষিপ্ত বা বিচলিত করে (স্বামী), নষ্ট করে (শঙ্কর)।

(৬৯) নিশার আঁধার—অজ্ঞানান্ধকারে বা মায়ায় মোহিত হইয়া, অবিবেকী আত্মজ্ঞানকে সম্পূর্ণ অন্ধকারবৎ দর্শন করে, অথবা তাহার কিছুই দেখিতে পায় না। বিবেকীরা সেই মোহাবরণ না থাকায় আত্ম

পশে বারি বারিধি অন্তরে
করে পূর্ণ তারে ;—তবু স্থির
রহে সিন্ধু- নহে উচ্ছ্বলিত ;—
সেইরূপ কামনা সকল
পশে যাহে—লভে শান্তি সেই ;—
কামী কভু শান্তি নাহি পায়। ৭০
যে পুরুষ করি ত্যাগ কামনা সকল,
নির্ম্মম নিস্পৃহ হয়ে, ত্যজি অহঙ্কার
করে বিচরণ, সেই—শান্তি করে লাভ। ৭১

দর্শন করে (স্বামী)। এই তমোগুণজাত অন্ধকার বা অজ্ঞানমোহ সকল ভূতেই বা সকল জীবেই অবিবেক উৎপাদন করে বলিয়া ইহাকে রাত্রির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এই অজ্ঞানরূপ নিদ্রায় লোকে অভিভূত বা নিদ্রিত থাকে—কিন্তু যোগী অজ্ঞান দূর করিয়া সে নিদ্রা হইতে জাগরিত হয়—তাহার আত্ম সাক্ষাৎকার হয়। আর এই অবিবেকী লোকেরা বাহ্য ইন্দ্রিয় ব্যাপারে লিপ্ত থাকে—ও তাহাতেই কেবল মনস্থির করে—যোগী সে সকল বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করিয়া, তাহা একেবারেই অনুভব করে না—বা সে বিষয় সম্বন্ধে নিদ্রিত থাকে (স্বামী)। অথবা যোগী সংসারকে স্বপ্নময় ভাবেন—অবিবেকী তাহাকে সত্য মনে করে(শঙ্কর)। আত্মনিষ্ঠ আত্ম বিষয়ে বুদ্ধি সর্ব্বভূতে অপ্রকাশিত, আর ইন্দ্রিয় বিষয় বুদ্ধি সংযমীর নিকট অপ্রকাশিত (রামানুজ)।

সংযমী—যিনি যোগের অষ্টাঙ্গ সাধন করিয়া সমাধি লাভ করিতে করিয়াছেন। কোন ব্যাপারের প্রতি ধারণা ধ্যান ও সমাধি এই ত্রিবিধ মানস প্রক্রিয়া প্রয়োগ করাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। পাতঞ্জল দর্শনে আছে—"ত্রয়মেকত্র সংযমঃ" (৩।৪) এই সংযম হইতে প্রকাশ স্বভাব নিস্কল উৎকৃষ্ট বুদ্ধির আলোক আবির্ভূত হয়, "তজ্জয়াৎপ্রজ্ঞালোক" (পাতঞ্জল দর্শন ৩।৫)

চণ্ডীর ১ম অধ্যায়ের ৩৫শ্লোকে কতকটা এইরূপ। যথা—
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিন স্তুল্য দৃষ্টয়ঃ॥

(৭০) পশে যাহে—অর্থাৎ কামনা যাহাকে আদৌ বিচলিত করিতে পারে না। (শঙ্কর)প্রারব্ধ কর্ম্ম বশে প্রবেশ করে (মধু)।

কামনা—অর্থাৎ প্রারব্ধাকৃষ্ট বিষয় (বলদেব)

(৭১) বিচরণ—কেবল জীবমাত্র চেষ্টা দোষ হইয়া পর্য্যটন করে (শঙ্কর)।

প্রকৃত সাংখ্যজ্ঞানী সমাধিযুক্ত নির্ব্বিকল্প যোগী ব্যতীত এরূপ অহংভাবদূর করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে না। অভিমানই অহঙ্কার (পাতঞ্জল দর্শন)।

বিবরণ—প্রারব্ধ কর্ম্ম বশে বিষয় ভোগ করে। (মধু) ইহা সুসঙ্গত অর্থ বলিয়া বোধ হয় না।

ব্রহ্মে-স্থিতি এই পার্থ! যাহা প্রাপ্ত হলে
নাহি থাকে মোহ আর। অন্তিমেও ইথে
হলে অবস্থান—হয় ব্রহ্মেতে নির্ব্বাণ। ৭২

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

(৭২) ব্রহ্মে স্থিতি—মূলে আছে—"ব্রাহ্মী স্থিতি"। ব্রহ্ম জ্ঞান নিষ্ঠা (স্বামী) ব্রহ্ম প্রাপিকা কর্ম্মে স্থিতি। (রামানুজ ও বলদেব)। ব্রহ্মরূপে অবস্থান (শঙ্কর)

মোহ—সংসার প্রত্যাবর্ত্তন কারণ অজ্ঞান। (রামানুজ)

মধুসূদন বলেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ই গীতার সার। এই অধ্যায়েই সমস্ত শাস্ত্রার্থ ও ধর্ম্মতত্ত্ব একত্র মুদ্রিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায় গুলিতে তাহাই আরও বিস্তারিত করিয়া বুঝান হইয়াছে। প্রথম সাধন-মার্গে নিষ্কাম কর্ম্ম নিষ্ঠা—ফল অন্তঃকরণ শুদ্ধি। দ্বিতীয় শমদমাদি সাধন পূর্ব্বককর্ম্ম সন্ন্যাস—জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ বেদান্তাদি হইতে জানিয়া পরম বৈরাগ্য প্রাপ্তি। তৃতীয়—ভগবদ্ভক্তি নিষ্ঠা। চতুর্থ জ্ঞান নিষ্ঠা—ফল জীবন্মুক্তি ও শেষ বিদেহ। এই সাধন মার্গের অনুকূল দৈবী সম্পদ ও তাহার অন্তরায়- আসুরী সম্পদ।

এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমে "কর্ম্ম কর যোগযুক্ত হয়ে" বলিয়া যে নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠা সূচিত হইয়াছে, তাহাই তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরে সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ কর বলিয়া যে কর্ম্মসন্ন্যাস-নিষ্ঠা সূচিত হইয়াছে,তাহা পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত হইয়াছে। তৎপরে শমপরায়ণ হও যে বলা হইয়াছে, তাহাতে ভগবদ্ নিষ্ঠা সূচিত হইয়াছে, এবং তাহা সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছে। ১২ হইতে ৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত যে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান বা সাংখ্যজ্ঞান নিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে,তাহা ত্রয়োদশে বিস্তারিত হইয়াছে। 'ত্রিগুণ বিষয় বেদ—ত্রিগুণাতীত হও' যে বলা হইয়াছে, সেই ত্রিগুণতত্ত্ব চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিস্তারিত হইয়াছে। শ্রুতি শ্রোতব্য বিষয়ে নির্ব্বেদ হইবার যে বৈরাগ্য তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে, তাহা পঞ্চদশ অধ্যায়ে বুঝান হইয়াছে। 'দুঃখে অনুদ্বিগ্ন চিত্ত' বলিয়া যে দৈবী সম্পদ সূচিত হইয়াছে ও 'পুষ্পিত বচন' বলিয়া যে সেই সম্পদের বিরোধী আসুরী সম্পদ সূচিত হইয়াছে—তাহা ষোড়শ অধ্যায়ে বিস্তারিত হইয়াছে। সেই আসুরী সম্পদ ত্যাগ করিয়া "দ্বন্দ্বহীন" ও নিত্য সত্ত্বস্থ হইবার উপায় সমস্ত শ্রদ্ধার কথা হইয়াছে, তাহা সপ্তদশ অধ্যায়ে বুঝান আছে। অষ্টাদশঅধ্যায়ে উক্ত সমস্ত বিষয় সংক্ষেপে একত্র পুনরুল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া গীতার উপসংহার করা হইয়াছে।

অতএব এই দ্বিতীয় অধ্যায় মনোযোগ পূর্ব্বক বুঝিলেই সমস্ত গীতা শাস্ত্র বুঝা যাইতে পারে।

দ্বাদশ খণ্ড—দ্বাদশ সংখ্যা। চৈত্র, ১৩০১।

নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী।

বিষয়। পৃষ্ঠা

কলিকাতা,

১১ শঙ্করঘোষেরলেন, নব্যভারত-বসুমতী প্রেসে, শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত,
২১০/৪নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, নব্যভারত-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২৪শে চৈত্র, ১৩০১।

[ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক মূল্য ৩] [এই সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা।

উপনিষদঃ।

অর্থাৎ ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই ছয়খানি উপনিষৎ। "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীসীতানাথ দত্ত কৃত "শঙ্কর-কৃপা" নাম্নী সরল ও সংক্ষিপ্ত টীকা ও "প্রবোধক" নামক বঙ্গানুবাদ সমেত সুপ্রসিদ্ধ বেদাচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্ত্তৃক সংশোধিত। মূল্য ১৲ টাকা, ডাক-মাশুল /০ আনা। ২১০।৩২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, লেখকের নিকট প্রাপ্তব্য।

নব্যভারতের মূল্যপ্রাপ্তি।

২৪২৩ বাবু তারিণীচরণ ঘোষ, ১২৯৯, ১৩০০ ৬
৩১৬১ „ অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী, ১৩০১, ২৲
৩০৮৫ „ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৩০১ ৩৲
২৬৭৬ „ কালাচাঁদ দালাল, ১৩০০ ১৲
৩১১৭ „ কৃষ্ণবল্লভ রায়, ১৩০১ ৩৲
২৬৩৩ রাণাঘাট ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরির সম্পাদক, ১৩০১ ১॥০
৮১ বাবু চন্দ্রমাধব মুখোপাধ্যায়, ১২৯৮ ১৲
৩০৪৫ „ কালিদাস ভট্টাচার্য্য, ১৩০১ ২৲
২৮২১ „ দুর্গামোহন দাস, ১৩০১ ৩৲
৩০৮৭ „ শ্যামাচরণ মিত্র, ১৩০১ ৩৲
২৭৭ „ অমৃতলাল মজুমদার, ৯৯, ১৩০০ ৬৲
[illegible]০ „ নীলমাধব রায়, ১২৯৮, ৯৯ ২৲
১৬৫[illegible] „ ললিতমোহন গুহ, ১৩০০ ২৲
১৬৬৮ „ অপূর্ব্বকৃষ্ণ সিংহ, ১২৯৬ ১৲
১৮৪৪ „ বৈকুণ্ঠনাথ দাস, ৯৮, ৯৯, ১৩০০ ৭৲
১৯৪৫ „ প্রিয়নাথ ঘোষ, ১৩০০ ৩৲
২৭৩৫ „ গোবর্দ্ধন শীল, ১৩০০, ১৩০১ ২৲
১৩১১ „ কুঞ্জবিহারী চট্টো, ১২৯৬, ৯৭ ৫৲
১৩৭৪ „ চন্দ্রভূষণ বন্দ্যো, ১৩০০ ৩৲
১৩৯৩ „ তারাপ্রসাদ মিত্র, ১২৯৭ ৩৲
১৪৪২ „ মথুরালাল নাগ, ১২৯৭ ২৲
১৭৩০ „ তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২৯৭, ৯৮ ৩৲
১৭২৯ „ শশধর মিত্র, ১২৯৫ ২৲
১৭২৮ „ তারাচাঁদ রায়, ১২৯৬ ॥০
১৭২৭ „ যাদবচন্দ্র দাস, ৯৬, ৯৭ ৪৲
১৪১০ „ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যো, ১২৯৫ ২৲
১৬৭৬ „ গুরুদাস সেন, ৯৬, ৯৭ ৪৲
১৬৭৫ „ হৃদ্‌কমল দাস, ১২৯৭ ৩৲
১৬৭৪ „ চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ১২৯৮ ৩৲
১৭৫৯ „ সারদাচরণ বসু, ১২৯৯ ৩৲
১৬৮০ „ নৃপেন্দ্রনাথ পাল, ১২৯৭ ৩৲
৬০৭ „ অম্বিকাচরণ বসু, ৯৬, ৯৭ ২৲
১৯৪২ „ বিহারীলাল মুখো, ১২৯৬ ১৲
২১৯৪ „ কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৯৬, ৯৭ ৫৲
২১ „ অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়,
২৩৪১ বাবু কামিনীকুমার দাস, ২৲
১৯৯৩ „ শরচ্চন্দ্র মহিন্তা ২৲
৫০৪ „ বৈকুণ্ঠনাথ দাস, ৩৲
২১৬৬ „ যোগেশচন্দ্র সেন, ৩৲
৩৮৫ „ অশ্বিনীকুমার দত্ত, ৫৲
২০৪০ „ কালীপ্রসন্ন দাস, ৩৲
৪৮৬ „ বসন্তকুমার গুহ, ৩৲
৫২৫ „ গঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত, ৩৲
৬২২ „ দ্বারকানাথ সেন, ৩৲
৬২১ „ রজনীকান্ত দাস, ৩৲
২৪০৫ „ চণ্ডীকান্ত ঘোষ, ৩৲
২৭৭৪ „ কৈলাসচন্দ্র সেন, ৩৲
১৩৯৯ „ গুরুচরণ সেন, ৩৲
৬২৫ „ আনন্দচন্দ্র সেন, ৩৲
১৩৯৮ „ কালাচরণ দে, ৯৲
২৩৪১ „ কামিনী কুমার দাস, ২৲
১৪৭৮ „ প্যারীলাল রায়, ৩৲
১৮৫৮ „ বিহারীলাল চৌধুরী, ৩৲
৪৮৪ „ কৈলাসচন্দ্র দাস, ৪৲
৩৯০ „ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ২৲
২৩৪৬ „ বৃন্দাবনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ৩৲
৩১৬২ „ মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ১৩০১ ৩৲
২৬৬৭ „ রামশঙ্কর রায়, ১৩০১, ১৩০২ ৬৲
২৬৬৮ „ দেবেন্দ্রমোহন ভৌমিক, ১৩০১ ১৸৵০
২০৭৮ „ অন্নদাপ্রসাদ সরকার, ১৩০০, ১৩০২ ৬৲
১৮৮৯ „ আনন্দনাথ সেন, ১৩০০ ৩৲
১৮৬ „ সতীশচন্দ্র দাস, ১৩০০ ৩৲
১৮৫৫ „ মহিমচন্দ্র রুদ্র, ১৩০১ ২৲
২৬৯৬ „ খোশালচন্দ্র দাস, ১৩০১ ৩৲
২৪৪৯ „ ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, ১৩০১, ১৩০২ ৬৲
২৭২৯ „ রজনীকান্ত সরকার, ৯৯, ১৩০০ [illegible]
২৮৯২ „ শশিকুমার দত্ত, ১৩০০ [illegible]
৬০৪ „ তিনকড়ি বসু, ১৩০০ [illegible]
২৩৭৫ „ ভোলানাথ সামন্ত, ১২৯৯ [illegible]

ক্রমশঃ।

নব্যভারত।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত।

দ্বাদশ খণ্ড—১৩০১।

কলিকাতা,

১/১ শঙ্করঘোষের লেনস্থ, "নব্যভারত-বসুমতী" প্রেসে,
শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত, ও ২১০।৪ নং
কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে সম্পাদক
কর্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ৩্ তিন টাকা মাত্র।

দ্বাদশ খণ্ড নব্যভারতের সূচী।

১৩০১।

বিদ্যাপতি। *

কবিকুলকেশরী বিদ্যাপতির পদাবলী প্রেমিকের প্রাণধন। সাধু বা সংসারী, বৃদ্ধ বা যুবা, শাক্ত বা বৈষ্ণব উৎকর্ণ হইয়া মৈথিল কবির কাকলী শ্রবণ করেন। পদকল্পতরু, পদকল্পলতিকা, পদামৃতসমুদ্র, পদসমুদ্র, গীত চিন্তামণি প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থে ও কীর্ত্তনীয়াদিগের মুখে প্রাচীন মহাজন পদাবলী সংগৃহীত ছিল। বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র প্রথমে তাহা ইংরাজী শিক্ষিত পাঠকের উপযোগী করিয়া প্রকাশিত করেন। সে আজ ২২ বৎসরের কথা, তখন বিদ্যাপতির নামও অবৈষ্ণব সাধারণে অবগত ছিল না। সেই অন্ধকারে জগদ্বন্ধু বাবু যে বিজ্ঞতা, যত্ন ও সুরসিকতা দেখাইয়াছিলেন, বিদ্যাপতির নামের সহিত তাঁহার নাম বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে গ্রথিত রহিবে। তাঁহার পরে বাবু সারদাচরণ মিত্র ও বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার বিদ্যাপতির এক সংস্করণ প্রকাশিত করেন। এই সংস্করণ আর এক বার বঙ্গবাসীর সত্বাধিকারী উদ্যোগী অধ্যবসায়শীল ও কৃতিমান বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার একখানি সংগ্রহ গ্রন্থে বিদ্যাপতির কয়েকটী পদ প্রকাশ করেন। আমার প্রেমহারে আমিও কয়েকটী পদ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। এতদ্ভিন্ন গ্রীয়ার্সন্ সাহেব মৈথিল ভাষায় কতকগুলি পদ প্রকাশিত করিয়াছেন।

বিদ্যাপতির জীবনকালে তাঁহার পদাবলী মুদ্রিত হয় নাই। মুখে মুখে ও হাতের লেখা পুঁথিতে পদগুলি সংগৃহীত ছিল। র, ব, ণ, ন প্রভৃতি অক্ষরগুলি বিদ্যাপতির সময় হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক রূপান্তর ধারণ করিয়াছে। ছাপার সীসার অক্ষরে সীমাবদ্ধ হইয়া বাঙ্গলা অক্ষরের পরিবর্ত্তন প্রিয়তার হ্রাস হইয়াছে। বিদ্যা বুদ্ধি অনুসারে নকল করিবার সময় অনিচ্ছায় বা স্বেচ্ছায় পাঠান্তর ঘটে। সুতরাং বিদ্যাপতির পদাবলীর বিভিন্নপাঠ বিস্ময়ের বিষয় নহে। এবং ইহার মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত-পাঠ রুচি ও অভিজ্ঞতায় তাহার নির্দ্দেশ করিতে হইবে। আমার পাঠ আমার বিশ্বাস ও শিক্ষা মত সঙ্গত বলিয়া আমার বোধ হইতে পারে। কিন্তু মতভেদ হইলে অন্যদিগকে তিরস্কার করিবার আমার অধিকার নাই। কোন একখানি পুঁথির পাঠ প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে সে পুঁথি খানি কতদিনের, কোথায় কি অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, অনুসন্ধান করিতে হয়। আত্মম্ভরিতার স্থান এখানে নাই। একটী পদ উদ্ধৃত করা যাউক :—

> "বোলন রসিক বিলাসিনী ছোটি
> কবে ধরইতে কত কর না কোটী"

পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাঁহার নব প্রকাশিত বিদ্যাপতি গ্রন্থে পদটী এই রূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি অন্য পাঠ দেখিয়াছেন, রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনদিগের ব্যাখ্যা শুনিয়াছেন, অথচ এই পাঠ ধরিয়াছেন এবং বোলন শব্দ বোঢ় শব্দজ বলিয়া ইহার অর্থ বর, নাগর এবং কোটী শব্দে কুট + ঙ করিয়া কুটিলতা বুঝিয়াছেন। শব্দটী বোলন হইলে যে ছন্দপাত হয়, তাহা ভাবেন নাই বোধ হয়। বলবন্

* শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদকৃত টীকা, কবির জীবনবৃত্তান্ত এবং বাঙ্গলা ও মৈথিলী ভাষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমেত।

শব্দটী বিহারে বল অন—ইংরাজী wর মত ব টীর উচ্চারণ হয়—এই শব্দ হইতে অপভাষার পলোয়ান শব্দ হইয়াছে। কোটী অর্থে কুটিলতা করিলে রাধার প্রথম মিলনের রস ভঙ্গ হয়। কুটিলতা যাহাদের সম্ভব, তাহাদের সঙ্গে রাধার নাম করিলে বোধ হয় পাপ হয়। আমরা এ পদটী এইরূপে পড়ি:—

"বলবন রসিক বিলাসিনী ছোটি
করে ধরাইত কত করুণা কোটী"

পাঠে যেমন অন্তর হয়, অর্থেও তেমনি অন্তর হয়। লোকে আপন রুচি, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অনুসারে অর্থ বুঝে। অনেক সময়ে কবি স্বয়ং যে অর্থ অনুমান করেন নাই, সে অর্থও প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। বিশেষতঃ পাঠান্তর হইলেই অর্থান্তরের সম্ভাবনা হয়। এরূপ স্থলে পূজনীয় মনীষিগণকে অবজ্ঞা প্রদর্শন ধৃষ্টতা মাত্র।

বিদ্যাপতি যে সময়ে আবির্ভূত হন, সে সময়ে বাঙ্গলার ভাষা কিরূপ ছিল, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গ্রন্থাবলী ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ দ্বারা জানিবার উপায় নাই।

বিদ্যাপতির আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। তিনি ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে বিসফী নামক গ্রাম দান প্রাপ্ত হন। ভক্তি-নিধি হারাধন দত্ত চণ্ডীদাসের একটী পদ হইতে অতি সুন্দর উপায়ে চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিয়াছেন। সে পদটি এই:—

"বিধুর নিকট নেত্র পক্ষ পঞ্চবাণ
নবহুঁ নবহুঁ রস ইহ পরিমাণ"।

এই পদটী ১৩২৫ শকে রচিত। বাঙ্গলা দেশে সংবৎ অপেক্ষা শকাব্দের চলন অধিক ছিল। এজন্ত আমরা ইহা শকাব্দ গণ্য করিয়া লইলাম। আমাদের অনুমান সত্য হইলে, যে বৎসর বিদ্যাপতি বিসফী দানপ্রাপ্ত হন, সেই বৎসর চণ্ডীদাস এই পদটী লিখিয়া বলিয়াছিলেন:—

"পরিচয় সঙ্কেত অঙ্ক নির্দ্ধা
চণ্ডীদাস কয় কৌতুক কির্দ্ধা।"

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার ভাষা—অপভ্রংশ। পণ্ডিতের ভাষা সংস্কৃত—অপভাষা কি ছিল তাহা অনুমান সাপেক্ষ। জয়দেবের পদাবলী হইতে দেখা যায়, হিন্দী বাঙ্গলা মিশ্রিত একটী ভাষা পূর্ব্ব হইতে সাধারণ লোকে ব্যবহার করিত। পাল ও সেন বংশের সময় মিথিলা বাঙ্গলার এক অংশ ছিল। মিথিলার বর্ত্তমান ভাষা ভোজপুরী হিন্দী অপেক্ষা বাঙ্গলার অনেক নিকটবর্ত্তী। মিথিলার সমাজ তখন বাঙ্গলার আদর্শ। আহার ব্যবহারে অদ্যাপি মিথিলা বাঙ্গলার নিকটতর। সুতরাং মিথিলা ও বাঙ্গলার ভাষা—উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গলার ও রাঢ় দেশের ভাষা—প্রায় একরূপ ছিল অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলীতে দুই প্রকার ভাষা দেখা যায়—এক বীরভূমের বাঙ্গলা আর এক ব্রজবোলী। খাড়ী বোলী ও ব্রজবোলী হিন্দী দুই প্রকার। ব্রজবোলী বিহারের সকল হিন্দু বুঝিতে পারে এবং বাঙ্গালীরও বোধগম্য। এ "ব্রজবোলী" কোথা হইতে আসিল? ব্রিজি বা লিচ্ছবী নামে এক পরাক্রান্ত জাতি মিথিলায় বাস করিত। সে অনেক দিনের কথা। ইহারা ভোট দেশ হইতে এখানে আসিয়াছিল। সিদ্ধার্থ ইহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, বৌদ্ধপুরাবৃত্তে ইহাদিগের বিবরণ পাওয়া যায়। ভবিষ্যৎ কালে ইহারা মিথিলা ছাড়িয়া নেপালে গিয়া বাস করে। ইহাদের ভাষা বলিয়া কি মিথিলার ভাষার নাম "ব্রজবোলী" হইয়াছিল? বোধ হয় না। যখন সিদ্ধার্থের আবির্ভাব হয়, তখন গাথা ভাষা বিহারে প্রচলিত, তাহার

পর শত শত বৎসর পালিভাষা রাজত্ব করে। পালি ভাষা হইতে হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি। ব্রিজিদের এখন কোন চিহ্ন মিথিলায় নাই। মিথিলাকে জনকভূম বা দ্বারবঙ্গ ভিন্ন ব্রজপুর নামে কেহ অভিহিত করে নাই। বোধ হয় মহাজনগণ ব্রজলীলা যে ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন, সেই কৃত্রিম ভাষার নাম ব্রজবোলী হইয়াছে। আপন লালিত্যে ব্রজবোলী সকলের প্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গ্রীয়ার্সন সাহেব বিদ্যাপতির যে সকল পদ মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহার কতকগুলির ভাষা ঠিক ব্রজবোলী নহে। আবার বাঙ্গলা দেশে প্রচলিত কতকগুলি পদের ভাষা যেরূপ পরিষ্কার বাঙ্গলা, মিথিলায় কখন সে ভাষা প্রচলিত ছিল বিশ্বাস হয় না। ইহাতেই অনুমান হয়, একদিকে মৈথিলগণ বিদ্যাপতির ভাষা খাঁটি হিন্দীতে, অন্যদিকে বাঙ্গালীরা খাঁটি বাঙ্গলায় পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। অথবা অন্য কবিগণ আপন রচনায় বিদ্যাপতির ভণিতা সংযোগ করিয়া দিয়াছেন।

বস্তুতঃ বিদ্যাপতি কোন্ ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন, কোন্ পদটী বিদ্যাপতির প্রকৃত, এখনও নিঃসংশয়ে বলিবার সময় হয় নাই। কখন হইবে কি না কে বলিতে পারে? পদসমুদ্র প্রকাশিত হইলে * এ প্রশ্ন মীমাংসার কিছু সাহায্য হইবে। নিশীথ নিস্তব্ধতায় স্বর্গীয় সঙ্গীতের ন্যায় বিদ্যাপতির পদাবলী আমাদের চিত্তহরণ করিতেছে—কে গাইতেছে, কোথায় গাইতেছে—বাক্যগুলির অর্থ কি, আমরা বুঝি না, বুঝিবার প্রয়োজনও রাখি না, মধুরতায় মুগ্ধ হইয়া আছি। ব্যাকরণের বজ্র প্রহারে কাব্যবিশারদগণের আনন্দ হইতে পারে, মৈথিল ফলকে তড়িত জ্যোতি প্রতিবিম্বিত করিয়া পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার স্পর্দ্ধা করিতে পারেন কিন্তু স্বপনের সুখ মোহে। তড়িৎ জ্যোতি ও বজ্রনিনাদ বিদ্যাপতি হইতে শতক্রোশ দূরে থাকুক।

পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সংস্করণে আমরা কয়েকটী নূতন পদ দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারীগণ বিদ্যাপতির একটী নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। আমার নিকট কতকগুলি পদ আছে—যাহা কাব্য বিশারদের গ্রন্থে দেখিলাম না। কোন মুদ্রিত গ্রন্থে সে গুলি লিপিবদ্ধ হইবে আশা করিয়া এ স্থলে কয়েকটী প্রকাশিত করিলাম; এতদ্ভিন্ন আরো অনেক বাকী রহিল। সংগ্রহ গ্রন্থে সে গুলি প্রকাশ করা চলে, কিন্তু নব্যভারতের ন্যায় পত্রিকায় সে গুলি প্রকাশিত করা উচিত বোধ হয় না।

করতলে বয়ান শোভয় মুখচন্দ
কিশলয় মেলি জনু নব অরবিন্দ
অনুখণ নয়ানে গলয়ে জলধারা
পঙ্কজ গিলি উগল মতিহারা
তুঁহু মানিনী পালটি না নেহারি
অরুণ পিব চাহি ঘোর আঁধিয়ারী
বিরল নক্ষত্র নভোমণ্ডল ভাস
অরুণ ত্যজি কো বিমুখ হাস
তরুণ তড়াগে কুয়ল অরবিন্দ
ভুলিল ভ্রমর পিবই মকরন্দ
তে অপরাধ মারু পাঁচ বাণ
ধনি ধরহ হরি রাখহ পরাণ
বিদ্যাপতি কহে কে নাহি জানে
আদর লাগি নারী করু মানে।

২

শুন সুন্দরি বিদগধ সুপুরুখ সোই
কামুক হৃদয় সবহঁ হাম বুঝলুঁ কবহঁ না বিছুরই তোই
এক দিবস হাম মথুরা সমাগমে পন্থহি দরশন ভেলা
তুয়া কাহিনী কত পুন পুন পুছত লোরে লোচন ভরি গেলা
গীত বিচোলে নয়ন যুগ মোছই পুন পুন অচেতন হোই

* পণ্ডিতবর হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় এই মাস হইতে খণ্ডে খণ্ডে পদসমুদ্র প্রকাশিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন।

উরুপর পাণি হানি পিতি লুটই ফুকরি ফুকরি কত রোই।
তুয়া বিমু রাতি দিবস নাহি জানয়ে অত এ বুঝনু অনুমানে
তোহে বিছুরল ব্রজ কবহুঁ না বোলবি সুকবি বিদ্যাপতি ভাণে।

(৩)

ছেদল চম্পক পনস রসাল
রোপনু শিমুল এরণ্ড মন্দার
গুণবতী পরিহরি রূপবতী সঙ্গ
হায় হিরণ্য ছাড়ি বাগ হি বঙ্গ
কি কহব রে সখি পামর বোল
পাথর ভাসল তল গেল সোল
পণ্ডিত গুণিজন দুখ অপার
আছয়ে মরম সুখে পরম গোঁয়ার
বিদ্যাপতি কহে বিহি অনুবন্ধ
গণই গুণিজন মনে রহে ধন্দ।

৪

সুহই।

সহকার মুঞ্জর মধর গুঞ্জর কোকিল পঞ্চম গায়
দখিণ পবন বিরহ বেদন নিঠুর নাহ না আয়
সজনি কহ মোরে সোই উপায়
মধুমাসে যব মাধব আযব বিরহ বেদন যায়
একু বেরি হর ভসম করল তে শর নয়ন আগি
আহির কুলে পুন জনম লায়ল হামারি বধের ভাগী
অঙ্গজ আছল অনঙ্গ ভই গেল ধনু ভাঙ্গল হাথ
নাহ নিরদয় ত্যাগি পলায়ল ছোড়ল হামারি সাথ
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী আবল না করহ চিত
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লছিমা দেবী সহিত।

৫

বালা ধানশী।

শুন শুন মাধব কর অবধান
তো বিমু দিবস রয়নী না জান
যতহুঁ কলানিধি সঁপুরণ ভেল
ততহুঁ কলাবতী ছিন ভই গেল
নীল নলিনী লেই যব কবি বায়
হৃদয়ে বহুত ভয় উড়ি জনি যায়
চল চল মাধব কর আগুসার
ইন্দু পুরল ধনি না জীয়ব আর
ভণে বিদ্যাপতি শুন ব্রজরায়
তুরিতে চলহ ধনি মরি জনি যায়।

৬

ধানশী।

সজনি গেল সে সব দিন
বয়েস গরবে যো কিছু কহলি সো সব রহিল চিন
দাঁত ভাঙ্গল গোথর বোয়ায়েল কামাবল সাপ
বৈসল রহিয়ে সকল সহিয়ে ভাঙ্গল বীরক দাপ
গগন মণ্ডলে উগয়ে কলানিধি কত নিবারিব দিঠ
যখন যে হব তেজি গোঙায়ব যে হব তা দিব পিঠ
সজনী না বোল বচন আন
বহুত বিপতি দেখব করব কবি বিদ্যাপতি ভাণ।

আজ কাল কোন কোন গ্রন্থকার গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কোন বিখ্যাত লেখকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বা অনুরোধ পত্র লইয়া এক একখানি প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করেন। সাহিত্য-ব্যবসায়ীর দারিদ্র্য সকল যুগে ও সকল দেশে বিখ্যাত। কিন্তু এ দারিদ্র্যেও সাহিত্যসেবী আত্মসম্মান রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহারা বীণাপাণির ভক্ত। আজ কাল ভণ্ড সাহিত্যসেবীর নীচতায় মস্তক অবনত হয়। যাঁহারা সাহিত্যের নামে প্রসংশাপত্র ভিক্ষা করিতে লোকের দ্বারস্থ হন, তাঁহারা যেমন মর্য্যাদাশূন্য, যাঁহারা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চক্ষুলজ্জায় প্রশংসাপত্র প্রদান করেন, তাঁহারা তেমনি দুর্ব্বলচিত্ত এবং উভয়েই সাহিত্যের শত্রু।

বিদ্যাপতির উপক্রমণিকায় দেখিলাম—

"কৃষ্ণের প্রীতির জন্য ইন্দ্রিয়াসক্তি ভক্তের মতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অঙ্গ।" "ফলতঃ এ বিষয়ে (রুচি) যদি কিছু দোষ থাকে সে দোষ বিদ্যাপতির নহে—বৈষ্ণব ধর্ম্মের। এই ধর্ম্ম প্রভাবেই তড়িত লতা অবলম্বনে অবতীর্ণ, নিষ্কলঙ্ক শশধর বিনিন্দিত রমণীবদন কিছু ক্ষণ দেখিয়া বিদ্যাপতির আশা পূর্ণ হয় নাই। "মদন জ্বালা" বাড়িয়াছিল। সৌন্দর্য্য ও চমৎকারিত্বে মগ্ন হইয়াও এই ধর্ম্মের প্রভাবে তাঁহার ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রকাশ পাইয়াছে।"

কাব্যবিশারদ মহাশয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম যেরূপ

বুঝিয়াছেন, সেইরূপই লিখিয়াছেন। এই পুস্তক খানি পড়িয়া বৈষ্ণব চূড়ামণি বাবু শিশির কুমার ঘোষ অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন দেখিয়া অবাক্ হইয়া আমার ও শিশির বাবুর একটী বন্ধু, তিনিও একজন ভক্ত বৈষ্ণব এবং সুলেখক, তাঁহাকে এ রহস্যের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি লিখিয়াছেন, শিশির বাবু শাস্ত্রমত ব্যবহার করিয়াছেন।

"অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি"

পাঠক, প্রশংসাপত্র গুলির অর্থ অনুভব করিবেন। বস্তুতঃ কাব্যবিশারদ মহাশয় পণ্ডিত, সুলেখক ও সাহিত্যপ্রিয়। তাঁহার অনুগ্রহপত্র সংগ্রহ দেখিয়া আমরা লজ্জিত হইয়াছি। যিনি বঙ্গ সাহিত্যের রথীগণকে ঘৃণার সহিত পদাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহাকে অন্যের দ্বারস্থ দেখিলে মন কেমন হয় বুঝা যাইবে।

কালীপ্রসন্ন বাবু অন্যের পাঠাশুদ্ধি ও অর্থাশুদ্ধি দেখিয়া হুঙ্কার করিয়াছেন। আমরা এখানে তাঁহার পাঠ ও আমাদের পাঠ কয়েকটী পদ হইতে উদ্ধৃত করিলাম এবং কয়েকটী পদের তাঁহার কৃত অর্থ ও আমাদের কৃত অর্থ তাঁহার ও পাঠকগণের সমালোচনার জন্য তুলিয়া দিলাম। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের পাঠ প্রথমে, তাহার পর আমার পাঠ। আমার পাঠ কোনটী স্বকপোল কল্পিত নহে। দুই শত বৎসরের প্রাচীন পুঁথি হইতে উদ্ধৃত।

সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু সাঙর চিকুর তার
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল পিছে করি আন্ধিয়ার।
রামাহে অধিক চন্দিম ভেল
কত না যতনে কত অদ্‌ভুত বিহি বহি তোহে দেল।

বিশারদ মহাশয় চন্দিম অর্থে কান্তি এবং বহি অর্থে উয়ো—উহা বুঝিয়াছেন। আমার অর্থ চন্দিম, চাঁদ, বহি শব্দ নিহি বা নিধি (রত্ন) হইবে।

সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু সাঙল চিকুর তার
জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল, পিছে করি আন্ধিয়ার
রামাহে অধিক চন্দিম তুঁহু ভেল।
কতহুঁ যতনে কত অদ্‌ভুত বিহি নিহি তোহে দেল।

(৭)

যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধর বিজুরি রেহা
দ্বন্দ্ব পশারিয়া গেলি।

বিশারদ মহাশয় দ্বন্দ্ব শব্দে যুগ্ম বা কলহ বুঝিয়া দুইটী স্বতন্ত্র অর্থ করিয়াছেন (ক) নবজলধর ও বিজলী লেখার মিলন সম্পন্ন করিয়া গেল। (খ) নবজলধর সম্ভূত যে বিদ্যুৎ তাহার সহিত কলহ বিস্তার করিয়া গেল অর্থাৎ সেই বিদ্যুল্লেখা অধিক রূপবতী কি রমণী অধিক রূপবতী, এই বিবাদের বিস্তার বা সূত্রপাত করিয়া গেল।

যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নব জলধর বিজুরি রেহা ধন্দ পশারিয়া গেলি।

বিদ্যুতের আলোতে চোখে ধান্দা লাগে। সন্ধ্যার অন্ধকারে বিদ্যুতের মত কি চলিয়া গেল, চোখে ধাঁধা লাগিল, ঠিক যেন বুঝা গেল না।

(৮)

সিংহ জিনিয়া মাঝারি খিনি, তনু অতি কোমলিনী
কুচ ছিরি ফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি
কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়ন বর
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল পর
বলি অর্থ—বলিয়া।
শিরিষ কুসুম তণি, সিংহ জিনি মাঝা খিনি
কুচ ছিরিফল ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি
কাজরে রঞ্জিত কিয়ে ধবল নয়নবর
ভ্রমর ভুলল জনু বিকচ কমলোপর।

(৯)

আধ আঁচর খসি, আধ বদনে হাসি, আধ হি নয়ান তরঙ্গ
আধ উরজ হেরি, আধ আঁচর ভরি তব ধরি দগধে অনঙ্গ
একে তনু গোরা কনক কটোরা অতনু কাঁচলা উপাম
হারে হরি লব মন জনু বুঝি ঐছন ফাঁস পসারল কাম।

আতনু কাঁচলা উপাম—মদন কাঁচুলি সদৃশ হইয়াছে।
চায়ে হরি লব মন—হায়ে যেন মন হরিয়া লয়।
আধ আঁচর খসি আধ বদনে হাসি আধ হি নয়ান তরঙ্গ
আধ উরজ হেরি গেলি পুরুখ বধি অন্তর দগধে অনঙ্গ
একে তনু গোরা কনক কটোরা ওতনু কাঁচর উপাম
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন ফাঁস পসারল কাম।

(১৪)

অলখিতে হাম হেরি বিহসিলি থোরি
জনু রজনী ভেল চান্দ উজোরি।

অর্থ—কবির তুলনায় কামিনী যামিনীর সদৃশ, হাস্য কৌমুদী তুল্য। সাদৃশ্য কিসে দেখাইলে ভাল হইত। রাধা কি রাত্রির মত কৃষ্ণবর্ণা? আমার পাঠ এইরূপ :—

অলখিতে হামে হেরি বিহসিল থোরি
জনু বয়ান ভেল চাঁদ উজোরি।

এই পদটীর আর এক স্থানেও অশুদ্ধ পাঠ উদ্ধৃত করা হইয়াছে বোধহয়,

তৈ ভেল বেকতপয়োধর শোভা
কনক কমল নাহি কাহে মনোলোভা

অর্থ—কনককমলে কার মন না মোহিত হয়? আমার পাঠ এই—

তেঁ ভেল বেকত পয়োধর শোভা
কনক কমল হেরি কাহে না লোভা।

এই পদটীর শেষভাগে আমার পুঁথিতে দুইটী নূতন ছত্র আছে। বিশারদ মহাশয়ের গ্রন্থে পাইলাম না।

সে সব অমূল নিধি দেগলি সন্দেশ
কিছুই না রাখলি রস পরিশেষ।

আর অধিক পদ উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। এইরূপ ভিন্ন পাঠ ও ভিন্ন অর্থ অনেক পদে পাওয়া যায়। বিশারদ মহাশয় সূচিপত্র না দেওয়াতে তুলনা করিবার বড় অসুবিধা হইয়াছে।

পাঠ ও অর্থসম্বন্ধে ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও বলিতে হয়, বিদ্যাপতির এই নূতন সংস্করণে অনেকগুলি নূতন পাঠ একত্র থাকাতে পাঠকের সুবিধা হইয়াছে। পুস্তক খানি প্রকাশিত করিতে কাব্যবিশারদ মহাশয় পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াছেন। তজ্জন্য তিনি আমাদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়।

কৈফিয়ৎ।

বিগত আষাঢ় ও ভাদ্র মাসের নব্যভারতে "ঐতিহাসিক মীমাংসা" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য যথাসাধ্য সংক্ষেপে নিম্নে প্রদান করিলাম।

গতবর্ষের আশ্বিন মাসের নব্যভারতে বাবু চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের মতের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে আমার বিরুদ্ধে প্রথম লেখনী চালনা করেন। উক্ত প্রবন্ধে "শ্রীমান্ সখারাম গণেশের" প্রতি একটু তীব্র ব্যঙ্গ ও অশিষ্ট ভাষা প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস। বিগত চৈত্র মাসের নব্যভারতে আমার স্বীয় মতের সমর্থন জন্য "মগধের রাজবংশ" শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশ করি, তাহাতে চারু বাবুর মতের প্রতিবাদ ছিল। যদিও "সকলের মতের প্রতিবাদ করিয়া" বেড়ান আমার অভ্যাস, তথাপি বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সে নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, দৃষ্ট হয়। আশ্বিন মাসের নব্যভারতে চারুবাবুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হই-

বার পূর্ব্বে, আমি তাঁহার বিরুদ্ধে কখনও কিছু লিখি নাই, লেখা আবশ্যকও মনে করি নাই। চারুবাবুই প্রথমে গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিয়াছেন। "যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল" প্রবন্ধে চারুবাবু তাঁহার প্রতিবাদিগণের প্রতি যে সকল শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, চৈত্রমাসের নব্যভারতে সেই বাক্যগুলির অধিকাংশ আমি চারুবাবুর সম্বন্ধে যথাযোগ্য স্থলে ব্যবহার করি।

সত্য বটে আমি ("জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া" অথবা "সত্যের অনুরোধে") তর্করত্ন-মহাশয় ও কানাই বাবুর মতের বিরুদ্ধে আমার যাহা বক্তব্য ছিল, তাহা হিতবাদী, তত্ত্ববোধিনী ও ভারতীতে প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে তাঁহাদের প্রতি "ব্যাসদেবের গ্রীবাভঙ্গের" দোষারোপ, অথবা শ্লেষবাক্য বা অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করি নাই। তাঁহাদের মতের যে সকল অংশ আমার নিকট অসঙ্গত বোধ হইয়াছিল, আমি যথাসাধ্য সরলভাষায় তাহারই বিরুদ্ধে যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সুখের বিষয়, তাঁহারা আমার আপত্তি নিচয়ের উত্তর প্রদান কালে সরলতা, ধীরতা ও মহত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহার পর বিগত বর্ষের আশ্বিন মাসের নব্যভারতে চারুবাবুর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। এই প্রথম পরিচয় কালেই তিনি আমার সহিত যেরূপ শিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে ভদ্রতা ও উদারতার নিতান্ত অভাব ছিল, একথা আমি নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি। তাহার পর, তাঁহার তাদৃশ ব্যবহার স্মরণ করিয়া বিগত চৈত্র মাসের নব্যভারতে আমি তাঁহারই কথাগুলি পাল্টাইয়া তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করি। ইহা যে সম্পূর্ণ সুনীতি সঙ্গত হইয়াছিল, একথা বলি না। কিন্তু চারুবাবু যদি প্রথমেই ধীরতা ও শিষ্টতার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আজ তাঁহাকে ও আমাকে এতটা বিভ্রাটে পড়িতে হইত না।

পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে রাজতরঙ্গিণীর মতকে প্রামাণিক বলিয়া মনে করিতাম। পরে মনোযোগের সহিত মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতাদি পাঠ করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্বাপরান্তে অর্থাৎ কলি প্রবৃত্তির আনুমানিক সাত আট বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন ও কলির প্রথম শতাব্দীর তৃতীয় পাদের মধ্যভাগে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়পাদের মধ্যভাগে বা মগধাধিপতি মহারাজ নন্দের রাজ্যাভিষেকের ১৫ শত বৎসর পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমর সংঘটিত হয়। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে আমার যাহা বক্তব্য তাহা ইতিপূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, হিতবাদী ও ভারতীতে প্রকাশ করিয়াছি।

ইহার পূর্ব্বে তর্করত্ন মহাশয়ের পুরাবৃত্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কলির দ্বাদশ শতাব্দীতে পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভ হয়, এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। কারণ, তখনও স্বয়ং এ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে কিছু আলোচনা করি নাই। ইহার অল্পকাল পরে, (১২৯৯ সালের আষাঢ় মাসে) যুধিষ্ঠিরের সময় সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে ও বিশিষ্ট মনোযোগের সহিত সমস্ত পুরাণাদি আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী প্যারাগ্রাফে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। বিগত আড়াই কি তিন বৎসরের মধ্যে এরূপ কোনও প্রমাণ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত পরি-

ত্যাগ করিতে পারি। সুতরাং এই আড়াই কি তিন বৎসরের মধ্যে এ সম্বন্ধে আমার মতেরও কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই।

কিন্তু চারুবাবু বলেন, ইতিমধ্যে আমি নাকি ৩৷৪ বার মত পরিবর্ত্তন করিয়াছি। তিনি বলেন,—

"সত্যের অনুরোধেই তিনি তর্করত্ন মহাশয়ের "পুরাবৃত্ত" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া যুধিষ্ঠিরের স্থিতিকাল দ্বাপরান্তে সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। এইরূপ সত্যের অনুরোধেই তিনি কানাই বাবুর মত সমালোচনা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কলির প্রথম শতাব্দীতে আনিয়াছিলেন। * * * * আজ ছ মাস হয় নাই, তিনি যুধিষ্ঠিরকে কলির প্রথম শতাব্দীর লোক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আর ইহারই মধ্যে আবার কলির দ্বাদশ শতাব্দীতে (নন্দাভিষেকের ১৫ শত বৎসর পূর্ব্বে) ধর্ম্মরাজকে আনিতেছেন। কি সুন্দর সত্যের অনুরোধ।"—নব্যভারত দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা ২য় স্তম্ভ।

তাঁহার এই উক্তি যে সত্য হইতে বহু দূরে অবস্থিত, তাহা দেখাইবার জন্য, গত আড়াই বৎসরের মধ্যে যে তিন প্রবন্ধে যুধিষ্ঠিরের সময় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে কয়েক পংক্তি করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

১। (ক) "এই সকল প্রমাণে জানা গেল, বিষ্ণু পুরাণের মতে শ্রীকৃষ্ণ (ও যুধিষ্ঠির) দ্বাপরের শেষে জন্ম গ্রহণ ও কলির প্রথম শতাব্দীর শেষে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। * * * *

(খ) কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, বিষ্ণুপুরাণের মতে, যুধিষ্ঠিরাদি কলির ১ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ভাগবতের মতও বিষ্ণুপুরাণ হইতে ভিন্ন নহে। * *

(গ) ইহা দ্বারাও (গর্গসংহিতার বচনের দ্বারাও) যুধিষ্ঠিরাদির কলির প্রথম শতাব্দীতে বিদ্যমানতা প্রমাণিত হইতেছে।" হিতবাদী ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৯২ সাল।

২। (ক) "ইঁহারা সকলেই (শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদি) দ্বাপরযুগের শেষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। * * (খ) কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরাদি কলির প্রথম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন (অর্থাৎ বর্ত্তমান ছিলেন) স্বীকার করিলে, উল্লিখিত আশঙ্কা সমূহ নিরাকৃত হয় ও মহাভারতের সহিতও বিরোধ হয় না। * * * (গ) নন্দের ১৫ শত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ২৬ বৎসর পরে (১) পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভ হয়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, পৌরাণিক মতে ৪২৬+১৫০০—২৬=১৯০০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভ হয় ও তাহার একশত বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দে কলিযুগের আরম্ভ হয়।" —তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১২৯৯ সাল ১৪৮১৯।

৩। "এখন আমাদের ধারণা, কলির প্রথম শতাব্দীতে যুধিষ্ঠির বিদ্যমান ছিলেন।"—ভারতী ১৭শ ভাগ, ভাদ্র—"যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব কাল" ২৫৮পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পাঠকগণ দেখিবেন, হিতবাদীর (খ) চিহ্নিত উদ্ধৃতাংশের সহিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার (ক) চিহ্নিত অংশের ও ভারতীতে প্রকাশিত মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। হিতবাদীর (ক) চিহ্নিত অংশ পাঠ করিলে, পাঠক তত্ত্ববোধিনীর (ক) ও (খ) চিহ্নিত অংশের একবাক্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তত্ত্ববোধিনীর (গ) চিহ্নিত অংশ পাঠ করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, আমি যাহাকে "পৌরাণিক মতে কলির প্রথম শতাব্দী" বলি, চারু বাবু (ও পঞ্জিকাকারগণ) তাহাকেই কলির দ্বাদশ শতাব্দী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। "কলির দ্বাদশ শতাব্দীতে যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব হয়" একথা আমি (১২৯৯ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের পর

(১) আমি যখন এই প্রবন্ধ রচনা করি, তখন যে মহাভারত আমার কাছে ছিল, তাহাতে দুই স্থলে ২৬ বৎসর ও একস্থলে ৩৬ বৎসরের কথা লিখিত ছিল। এখন বোম্বাই সংস্করণও অপর দুই একখানি মহাভারতে সর্ব্বত্র ৩৬ বৎসর লিখিত আছে, দেখিতেছি। এতদনুসারে ১৮৯০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষিতের রাজ্যারম্ভ ধরিতে হইবে।

আর) কুত্রাপি বলি নাই। সুতরাং "ইহারই মধ্যে আবার কলির দ্বাদশ শতাব্দীতে ধর্ম্ম-রাজকে আনিতেছেন।" একথা ভিত্তিহীন।

উল্লিখিত প্রবন্ধত্রয় ব্যতীত বিগত আড়াই বৎসরের মধ্যে আমি যুধিষ্ঠিরের সময় সম্বন্ধে আর কোনও প্রবন্ধ লিখি নাই। এই প্রবন্ধ-ত্রয়ে যে সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাতে ভ্রম থাকিতে পারে, কিন্তু পরস্পর বিরোধ বা "দ্রুতগতিতে মত পরিবর্ত্তনের" প্রমাণ কোথায়? চারুবাবু যে মিথ্যা কথার অবতারণা করিয়া তাঁহার প্রতিপক্ষকে সাধারণের নিকট অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এমন আমরা বলি না; কিন্তু যিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি ধারণ করিয়া "ঐতিহাসিক মীমাংসা" করিতে বসেন, তাঁহার এ সকল বিষয়ে আরও একটু সতর্ক হইয়া লেখনী ধারণ করা কর্ত্তব্য।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে, যুধিষ্ঠিরের বয়স কত ছিল, মহাভারতে তাহা কোথাও সুস্পষ্ট কথিত হয় নাই. দ্রোণপর্ব্বের ১২৫ অধ্যায়ের এক স্থলে লিখিত আছে যে, মৃত্যুকালে দ্রোণাচার্য্যের বয়স ৮৫ বৎসর ছিল।

"আকর্ণ পলিতঃ শ্যামো বয়সাশীতিপঞ্চকঃ।
রণে পর্য্যচরৎ দ্রোণো বৃদ্ধঃ ষোড়শ বর্ষবৎ॥"

যুধিষ্ঠির দ্রোণের শিষ্য; সুতরাং তিনি দ্রোণের অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৭০ বর্ষ বয়স্ক ছিলেন, অনুমান করা অসঙ্গত নহে। মহাভারত-কারের উক্তির উপর স্থাপিত আমার এই অনুমানকে চারুবাবু 'দেউস্কর মহাশয়ের স্বকপোল কল্পিত, ভিত্তিহীন ও নবাবিষ্কৃত" বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার উত্তরে মৌনাবলম্বন করাই যুক্তিসিদ্ধ মনে করি। (২)

এ সকল বাজে কথা ছাড়িয়া দিয়া, এখন আসল কথা পাড়া যাউক্। চারু বাবু বলেন, জরাসন্ধ-পৌত্র সোমাপির পরবর্ত্তী ভূ[illegible]-গণের রাজ্যভোগ কাল ছয় শত ব[illegible] অধিক নহে।" আমার [illegible]চনায় [illegible] পুরাণবিরুদ্ধ। বিগত চৈত্র মাসের ন[illegible] বায়ু, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে বার্হদ্রথ বংশীয় নৃপতিগণের বংশ তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, সোমাপি—যিনি ভারত সমরের অব্যবহিত পরেই মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহার সময় হইতে উক্ত বংশীয় শেষ নরপতি রিপুঞ্জয় পর্য্যন্ত বার্হদ্রথ রাজগণের রাজত্বকাল হাজার খানেক বৎসর। অর্থাৎ বায়ুপুরাণ মতে ৯২১ বৎসর, মৎস্য মতে ৯৩৫ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণানুসারে ৯১৯ বৎসর। বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণে সামান্যতঃ সহস্রবৎসর বলা হইয়াছে। চারিসহস্র বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা সম্বন্ধে ৬০ বা ৭০ বৎসর লইয়া এইরূপ সামান্য মতভেদ বা অনৈক্য ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। যাহা হউক, বায়ু, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে সোমাপির রাজত্বকাল ৫৮ বৎসর। সুতরাং সোমাপির পরবর্ত্তী ভূপালগণের স্থিতি কাল মৎস্য মতে (৯৩৫ – ৫৮ =) ৮৭৭ বৎসর, বায়ুমতে (৯২১ —৫৮ =) ৮৬৩ বর্ষ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে (৯১৯ – ৫৮ =) ৮৬১ বৎসর। অর্থাৎ মোটের

(২) কুন্তীর বয়স সম্বন্ধে চারুবাবু যে আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহার উত্তরে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এ, মহোদয় একদিন বলিতেছিলেন যে, দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী গ্রহণ (বা গৌতম বংশীয়া জটিলার সপ্তস্বামী ও মুনিকন্যা বার্ক্ষীর দশ স্বামী গ্রহণ) যদি তাৎকালীন আর্য্যসমাজের অননুমোদিত না হয়, তবে বয়োজ্যেষ্ঠা কুন্তীর সহিত দ্রোণাচার্য্যের বিবাহ পাশ্চাত্য প্রথার অনুকরণ বলিয়া বিবেচিত হইবে কেন?

উপর ৮৬০ বৎসরের কম নহে। কিন্তু চারুবাবু বলেন, ছয় শত বর্ষের অধিক নহে। কাজেই আমার বিবেচনায় তাঁহার মত পুরাণ-বিরুদ্ধ। এ সম্বন্ধে চারুবাবু এপর্য্যন্ত যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এমন কোনও যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই,যদ্দারা তাঁহার মতের সহিত এই পৌরাণিক মতের একবাক্যতা সাধিত হইতে পারে।

চারুবাবু "আপাততঃ" দেখাইতে চান্ যে, "দেউস্কর মহাশয় বার্হদ্রথ ভূপতিগণের যে রাজ্যকাল উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদপেক্ষা ন্যূন সংখ্যা ঐ তালিকা হইতেই সংগ্রহ করিতে পারা যায়"। তিনি বলেন, বিষ্ণুপুরাণে যে ভবিষ্য রাজগণের কথা বলা হইয়াছে,সোমাপি তাঁহাদের প্রথম নহেন,—তৎপৌত্র অযুতায়ুই প্রকৃতপক্ষে ভবিষ্য রাজগণের প্রথম। বিষ্ণু পুরাণের ৪র্থ অংশের ১৯শ অধ্যায়ের উপসংহারে,বার্হদ্রথ বংশীয় অতীত ভূপালগণের নাম কীর্ত্তন কালে, সোমাপি পুত্র শ্রুতশ্রবার নাম উল্লেখিত হইয়াছে দেখিয়া চারুবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিষ্ণু পুরাণ অযুতায়ুর সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে—শ্রুতশ্রবার রাজত্বকালে রচিত হইয়াছে ; এবং সেই জন্যই তিনি অযুতায়ুকে ভবিষ্য নরপতিগণের আদি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ২১ অধ্যায়ের প্রারম্ভে পুরাণকার যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে, সোমাপির রাজত্বকালে—সোমাপির মৃত্যুর অন্যূন ৯। ১০ বৎসর পূর্ব্বে বা ভারতসমরের প্রায় ৫০বৎসর পরে) বিষ্ণু পুরাণ রচিত হয়। ঐ একবিংশ অধ্যায়ের প্রারম্ভ এইরূপ,—

"পরাশর উবাচ। অতঃপরং ভবিষ্যানহং ভূমিপালান্ কীর্ত্তয়িষ্যে। যোহয়ং সাম্প্রতমবনীপতিঃ তস্যাপি জনমেজয় শ্রুতসেনোগ্রসেন ভীমসেনাঃ পুত্রাশ্চত্বারো ভবিষ্যন্তি।"

অস্যার্থঃ।—পরাশর বলিলেন,—"অতঃপর ভবিষ্য ভূমিপালগণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি। সম্প্রতি যিনি পৃথিবী শাসন করিতেছেন, তাঁহার জনমেজয়, শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন নামক চারি পুত্র জন্মিবে।"

এতদনুসারে জনমেজয়াদি ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ের জন্মের পূর্ব্বেই বিষ্ণুপুরাণ রচিত হইয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়। মহাভারত মতে, ভারত সমরের ৬০ বৎসর পরে পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়। যে বৎসর পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়,সেই বৎসরই তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ভীমসেনের জন্ম হইয়াছিল, স্বীকার করিলেও, তাঁহার মৃত্যুর অন্ততঃ ৮। ৯ বৎসর পূর্ব্বে তদীয় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র জনমেজয় ভূমিষ্ঠ হয়েন, স্বীকার করিতে হইবে(৩)। বিষ্ণুপুরাণ ইহারও পূর্ব্বে অর্থাৎ পরীক্ষিতের মৃত্যুর অন্ততঃ ১০। ১২ বৎসর পূর্ব্বে (ও সোমাপি, যিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ৫৮ বৎসর পরে ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তাঁহার মৃত্যুর অন্যূন ৯। ১০ বৎসর পূর্ব্বে) রচিত হয়। সুতরাং বিষ্ণুপুরাণে যাঁহারা বার্হদ্রথবংশীয় ভবিষ্য ভূপাল নামে অভিহিত হইয়াছেন,অযুতায়ু তাঁহাদের প্রথম না হইয়া, সোমাপি পুত্র শ্রুতশ্রবাই তাঁহাদিগের প্রথম রূপে পরিগণিত হওয়া উচিত।

বিষ্ণু পুরাণের ৪র্থ অংশের ১৯ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে,—"জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, তৎপুত্র সোমাপি, তৎপুত্র শ্রুতশ্রবা"। কিন্তু ২১ অধ্যায়ে পরীক্ষিত পুত্র জনমেজয় ভবিষ্য নরপতিগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। অতএব ইহাই সম্ভব বোধ হয় যে, বিষ্ণুপুরাণ রচিত হইবার অন্ততঃ ২।১ বৎসর (বা সোমাপির মৃত্যুর ১০। ১২বৎসর) পূর্ব্বে শ্রুতশ্রবার জন্ম হইয়াছিল (এরূপ হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভবও নহে) বলিয়া ১৯ অধ্যায় জরাসন্ধের

(৩) এখানে বলা অবিশ্যক, মহারাজ পরীক্ষিৎ একাধিক দার পরিগ্রহ করেন নাই।

বংশ কীর্ত্তন কালে শ্রুতশ্রবার নামোল্লেখ করা হইয়াছে। এবং শ্রুতশ্রবার জন্মগ্রহণের ও বিষ্ণুপুরাণ রচনার কিছুদিন পরে জনমেজয়ের জন্ম হইয়াছিল, এই কারণে তাঁহার জন্মঘটনা ভবিষ্য বংশ বর্ণন স্থলে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপ সামঞ্জস্য করিয়া না লইলে,উক্ত উভয় অধ্যায়ের বিরোধের নিরাস হয় না।

এই সকল কথার বিচার করিয়া আমি এ বিষয়ে শ্রীধরস্বামীর মতানুসরণ ও অযুতায়ুকে বার্হদ্রথবংশীয় ভবিষ্য নরপতিগণের প্রথম স্থান প্রদান করি নাই। নতুবা যে, "পুস্তক উদ্‌ঘাটন করিয়া যাহা" দেখিয়াছি, "তাহাই প্রামাণিক মনে" করিয়াছি ও "বিতণ্ডা করিবার ইচ্ছা এত প্রবল হইয়াছিল যে,শ্রীধর স্বামীর টীকা দেখিবারও (আমার) অবকাশ হয় নাই," তাহা নহে। চারুবাবু এ সকল কথা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই,এবং আমার প্রতি অকারণে নানা প্রকার ব্যঙ্গ ও অশিষ্টতাপূর্ণ বাক্যাবলী বর্ষণ করিয়া স্বীয় জিঘাংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছেন।

আমার বিবেচনায়, সোমাপিই বিষ্ণুপুরাণবর্ণিত ভবিষ্য বার্হদ্রথ ভূমিপালগণের প্রথম। কারণ উক্ত পুরাণে স্পষ্টই লিখিত আছে,—

"জরাসন্ধসুতাৎ সহদেবাৎ সোমাপিঃ ভবিষ্যতি।"

অর্থাৎ "জরাসন্ধসুত সহদেব হইতে সোমাপি জন্মগ্রহণ করিবেন।"

ভাগবতকারও স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন যে, "ভবিতা সহদেবস্য মার্জ্জারি যৎশ্রুতশ্রবা"।

অর্থাৎ সহদেবের মার্জ্জারি (অপর নাম সোমাপি) নামক একপুত্র হইবে। মার্জ্জারি বা সোমাপি যদি ভবিষ্য রাজগণের প্রথমই না হইবেন, তবে পুরাণকারগণ "ভবিষ্যতি" ও "ভবিতা" এই ভবিষ্য-বোধক ক্রিয়া পদ ব্যবহার করিয়াছেন কেন?

এস্থলে একটি কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, বিষ্ণু ও ভাগবতাদি পুরাণকারগণ স্ব স্ব প্রণীত পুরাণের প্রাচীনত্ব খ্যাপন জন্য আপনাদিগকে পরাশর, মৈত্রেয় বা শুকদেবের স্থলাভিষিক্ত এবং পরীক্ষিতের সমসাময়িক ও ভবিষ্যদ্বক্তা বা ত্রিকালজ্ঞরূপে পরিচিত করিতে যাইয়াই এই সকল স্থলে একটু গোল বাধাইয়াছেন, এইরূপ আমার বিশ্বাস। ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত পুরাণ সমূহে বর্ণিত বংশানুচরিতগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে দৃষ্ট হইবে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধঘটনাকে কেন্দ্র স্বরূপ করিয়া অতীত ভূপালগণের চরিত কীর্ত্তন ও ভবিষ্য (অর্থাৎ ভারতসংগ্রামের পরবর্ত্তী) রাজবংশ সমূহের স্থিতিকাল নির্দ্দেশ করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতসংগ্রামরূপ একটি অতি প্রসিদ্ধ যুগচিহ্নস্বরূপ ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্রস্বরূপে গ্রহণ করত কাল নির্ণয় করা বিশেষ সুবিধা জনক বলিয়াই প্রাচীনগণ উক্ত ঘটনার পর হইতে (বা পরীক্ষিতের জন্ম কাল হইতে) সময় গণনা করিতেন। এই কারণে, বিষ্ণুপুরাণকার আপনাকে সোমাপির ও ভাগবতকার আপনাকে পরীক্ষিতের মৃত্যুকালের (বা মগধপতি শ্রুতশ্রবার) সমসাময়িক রূপে পরিচিত করিয়াও, বার্হদ্রথবংশীয় অবশিষ্ট নরপতিগণের স্থিতিকাল নির্দ্দেশ স্থলে, ভারত যুদ্ধের অব্যবহিত পরে অভিষিক্ত সোমাপিকেই ভবিষ্যবংশের আদিপুরুষ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

আর একটি উদাহরণ একথার প্রমাণ স্বরূপে এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনানুসারে ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি বৃহদ্বল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমন্যু হস্তে নিহত হয়েন, এবং তাঁহার অব্যবহিত পরেই তৎপুত্র "বৃহৎক্ষণ" অযোধ্যার রাজ-

সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, ভারতসমরের প্রায় ৫০ বৎসর পরে (বা পরীক্ষিতের মৃত্যুর দশ বার বৎসর পূর্ব্বে) পরাশর কর্ত্তৃক বিষ্ণুপুরাণ কথিত হয়। অন্ততঃ বিষ্ণুপুরাণকার এইরূপ ভাবেই আত্ম পরিচয় প্রদান ও স্বীয় গ্রন্থরচনার সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ইক্ষ্বাকুবংশীয় ভবিষ্য ভূপালগণের নামকীর্ত্তন কালে বৃহৎক্ষণ পুত্র "গুরুক্ষেপের" নামই প্রথমে উল্লেখিত হওয়া উচিত। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণকার ৪র্থ অংশের ২২ অধ্যায়ে বৃহৎক্ষণকেই ভবিষ্য ভূপালগণের প্রথম বা আদিরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহার দ্বারাও আমার পূর্ব্বানুমিত সিদ্ধান্তেরই দৃঢ়ীকরণ হইতেছে। ফল কথা, বিষ্ণুপুরাণ যে সময়েই রচিত হউক না কেন, ভারতসমরের পারভবিক নৃপতিগণই যে উহাতে ভবিষ্য বংশীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, এবিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। এই জন্যই, স্বয়ং বিষ্ণুপুরাণকার "ভবিষ্যতি"এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ দ্বারা সোমাপিকে ভবিষ্যবংশীয়গণের মধ্যেই গণনা করিয়াছেন।

এখন চারুবাবু বুঝিবেন যে, কেন আমি অযুতায়ুকে পরিত্যাগ করিয়া সোমাপিকে ভাবী বার্হদ্রথ ভূপালগণের প্রথম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। যাহা হউক, সোমাপি প্রভৃতি ভারতসংগ্রামের পারভবিক অবশিষ্ট বার্হদ্রথ নরপতিগণের স্থিতিকাল সহস্র বৎসর, একথা বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণে স্পষ্টই লিখিত আছে। বায়ু, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে সোমাপি প্রভৃতির রাজ্যশাসনকালের যে বর্ষসংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সমষ্টি করিলে ঊর্দ্ধকল্পে ৯৩৫ বৎসর ও ন্যূনকল্পে ৯১৯ বৎসর পাওয়া যায়। এইরূপে সমস্ত পুরাণের একবাক্যতা দ্বারা লক্ষসিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি টীকাকারগণের মতানুসরণ পূর্ব্বক "ভাব্যাঃ" "ভবিতা" ও "ভবিষ্যতি" প্রভৃতি পদের অর্থবৈচিত্র্য সাধন করা আমি যুক্তিযুক্ত ও আবশ্যক মনে করি না।

বিষ্ণুপুরাণের যে শ্লোকে "পরীক্ষিতের জন্ম অবধি নন্দের রাজ্যাভিষেক কালের অন্তর ১০১৫ বৎসর", একথা আছে, সেই শ্লোকের সহিত বংশতালিকা-লিখিত বর্ষসংখ্যার ঐক্য হয় না দেখিয়া আমি উক্ত শ্লোকে লিপিকর প্রমাদ কল্পনা করিয়াছিলাম। ইহার বিরুদ্ধে চারুবাবু বলিয়াছেন,—

"বিবাদাস্পদীভূত শ্লোকে লিপিকর প্রমাদ ঘটিয়াছে কি না, তাহাই দেখা যাউক। দেউস্কর মহাশয় যেরূপ পুরাণবর্ণিত বংশতালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাই আমরা আপাততঃ স্বীকার করিয়া লইতেছি। তাহা হইলে বায়ু পুরাণ মতে বার্হদ্রথগণের রাজ্যকাল ৯২১ বৎসর হইতেছে। উক্তপুরাণ মতে প্রদ্যোত বংশের রাজ্যকাল ১৩৮ বৎসর এবং শৈশুনাগ বংশের রাজ্যকাল ৩৩২ বৎসর। সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ ১৩৯১ বৎসর সোমাপি ও নন্দের অন্তর হইতেছে। কোথায় ১০১০ আর কোথায় ১৩৯১। বেচারা লিপিকরের দোষ আর কি করিয়া বিশ্বাস হয়? না হয় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের মত ধরা হউক। ৮৮১+১৩৮+৩৬২=১৩৮১ বৎসর হইল। এতদনুসারেও ১০১০ বৎসর সংস্থান হয় কি? এত কষ্ট কল্পনা করিয়া ১০১০ বৎসর দেখাইতে পারিলেন কৈ? না হয়, ১৫ শত বৎসর (অভাব পক্ষে ১৪৯৮) বৎসর দেখাইলেও চলিত"—(নব্যভারত দ্বাদশ খণ্ড ২৩৯পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ইহার উত্তরে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, গত বর্ষের আশ্বিন মাসের নব্যভারতে আমি মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ হইতে যে বংশতালিকা উদ্ধৃত করিয়াছি, তদনুসারে সোমাপি ও তৎপরবর্ত্তী নৃপতিগণের স্থিতিকাল যথাক্রমে ৯৩৫ ও ৯১৯ বৎসর। ইহাতে প্রদ্যোত ও শৈশুনাগবংশের রাজ্যকাল যোগ করিলে নন্দ

ও সোমাপির অন্তর মৎস্য মতে ৯৩৫+১৩৮+৩৬২=১৪৩৫ বৎসর ও ব্রহ্মাণ্ড মতে ৯১৯+১৩৮+৩৬২=১৪১৯ বৎসর হয়। কিন্তু তাহা হইলে যে এই দুই সংখ্যা ১৫শত বৎসরের কাছাকাছি যায়, এবং চারুবাবুর অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না! কাজেই তিনি মৎস্য পুরাণের কথাটা একেবারেই চাপিয়া গিয়াছেন, ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ৯১৯ বর্ষ স্থলে ৮৮১ বৎসর ধরিয়া ৮৮১+১৩৮+৩৬২=১৩৮১ বৎসর ধরিয়াছেন। ইহা ঐতিহাসিক মীমাংসকের সরলতা, দেউস্কর মহাশয়ের অজ্ঞতা ও লিপিকরগণের নির্দ্দোষিতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই!

বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের সহিত মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের প্রায় ৭০ বৎসরের * পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এই পার্থক্যের কারণ, ইতিপূর্ব্বে নব্যভারতের একাদশ খণ্ডের ৬৫৭ পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভে বিস্তারিত বুঝাইয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বিষ্ণু, ভাগবত, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ মতে শৈশুনাগ বংশের স্থিতিকাল ৩৬২ বৎসর —কেবল বায়ুপুরাণের মতে ৩৩২ বৎসর। বৈষ্ণবাদি পুরাণ চতুষ্টয় যখন শৈশুনাগ বংশের অবস্থিতিকাল সম্বন্ধে একমত, তখন তাঁহাদের প্রদত্ত বর্ষ সংখ্যাই ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণীয়; এবং বায়ু পুরাণের উল্লেখে কিঞ্চিৎ ভ্রম আছে, বিবেচনা করা অসঙ্গত নহে। এবং এই ভ্রমের জন্য বায়ুপুরাণোক্ত বার্হদ্রথ নৃপতিগণের বংশতালিকাকে অনৈতিহাসিক বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না।

* মৎস্যের সহিত ভাগবতের পার্থক্য ৬৩ বৎসর ও বিষ্ণুর সহিত ৬০ বৎসর। ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ভাগবতের পার্থক্য ৭৯ বৎসর ও বিষ্ণুর ৮১ বৎসর। আমি সুবিধার জন্য মোটামুটি প্রায় ৭০ বৎসর ধরিলাম।

বায়ুপুরাণ মতে ভবিষ্য বার্হদ্রথ বংশ ও প্রদ্যোত বংশের রাজত্বকাল ৯২১+১৩৮=১০৫৯ বৎসর। শৈশুনাগ বংশের রাজত্বকাল প্রকৃতপক্ষে ৩৬২ বৎসর (৫)। সুতরাং নন্দ ও সোমাপির মধ্যে ১০৫৯+৩৬২=১৪২১ বৎসর অন্তর পাওয়া যাইতেছে। এই সংখ্যা, ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণীয় তালিকোক্ত সংখ্যা অপেক্ষা ৭৭ বা ৭৯ বৎসর কম।

চারুবাবু বলিতেছেন,—"আমি দেউস্কর মহাশয়ের সংগৃহীত তালিকা হইতেই যাহা (অর্থাৎ যে অনৈক্য) দেখাইলাম, তাহাতে সকলে বুঝিবেন যে, উক্ত বংশতালিকার বলে বিষ্ণুপুরাণ বচনে লিপিকর প্রমাদ কল্পনা করা অনভিজ্ঞতা প্রকাশ মাত্র।" কিন্তু চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের ঘটনার সময় নির্ণায়ক প্রাচীন বংশ পত্রিকার ১৫ শত বৎসরের তালিকার মধ্যে মাত্র ৭০ বৎসরের (ভাগবত ও মৎস্য পুরাণের তালিকার মধ্যে ৬৩ বৎসরের) পার্থক্য বা গরমিলের জন্য সমস্ত বংশ পত্রিকাটিকেই অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কতদূর বিজ্ঞতার কার্য্য, তাহা বলিতে পারি না। কাজেই চারুবাবুর এই যুক্তির বিশেষ সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

উপসংহারে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। এপর্য্যন্ত অনেকেই বিঃ পুঃ ৪র্থ অং ২৪অধ্যায় লইয়া অনেক আন্দো-

(৫) বায়ু অপেক্ষা বৈষ্ণবাদি পুরাণের মতই এ বিষয়ে সমধিক ভ্রমশূন্য বলিয়া বোধ হওয়ায় তাহাই এস্থলে পরিগৃহীত হইল। বায়ু পুরাণে যে ভ্রম আছে, তাহা উক্ত পুরাণের প্রাচীনতা ও লিপিকর প্রমাদ বশতঃই সংঘটিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অপরাপর পুরাণেও এরূপ ভ্রমের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আবশ্যক হইলে ইহা সুন্দররূপে প্রমাণ করিতে পারিব। প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে এস্থলে সম্প্রতি মৌনাবলম্বন করিতে হইল।

জন আলোচনা করিয়াছেন ; কিন্তু তদন্তর্গত "অত্রোচ্যতে" এই কথাটির প্রতি এপর্য্যন্ত কাহারও মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে দেখি নাই।—আমি নিজেও অনেক বার ঐ অংশ পাঠ করিয়াছি ; কিন্তু "অত্রোচ্যতে" কথাটির প্রতি এতদিন আমার লক্ষ্য বা মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের সাহিত্যে মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় এবিষয়ে সর্ব্ব প্রথম সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় প্রদান করেন। তিনি দেখান যে, বিঃ পুঃ ৪র্থ অং ২৪ অধ্যায়ে পরীক্ষিৎ ও নন্দের অন্তর সম্বন্ধে যে শ্লোক দৃষ্ট হয়, উহা একটী প্রাচীন কিম্বদন্তী—"অত্রোচ্যতে" কথার দ্বারা ইহা প্রমাণ হয়। বটব্যাল মহাশয়ের এই নির্দ্দেশ আমার নিকট সম্পূর্ণ সঙ্গত বোধ হইয়াছে ও আমি এ সম্বন্ধে আমার পূর্ব্ব সংস্কারের কিয়দংশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে আমি "যাবৎ পরীক্ষিতোজন্ম" ইত্যাদি শ্লোকে লিপিকর প্রমাদ কল্পনা করিয়াছিলাম কিন্তু এখন আর সেরূপ কল্পনার কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। কারণ উক্ত বচন একটি কিম্বদন্তী মাত্র, তখন উহার সহিত পুরাণকারের সংগৃহীত বংশ তালিকার সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকিলেও বিশেষ কোনও দোষ দেখি না। আর এই প্রসঙ্গে সপ্তর্ষির অবস্থান সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাও বিষ্ণুপুরাণকারের নিজের মত নহে—উহারও মূল কিম্বদন্তীতে।

চারুবাবু বলিতেছেন,—"বিষ্ণুপুরাণকার (পরীক্ষিত ও নন্দের অন্তর সম্বন্ধীয়) শ্লোক গুলি "অত্রোচাতে" বলিয়া প্রামাণিক স্থল হইতে নিজের সমর্থনের জন্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।" এ কথা ঠিক নহে। বিষ্ণুপুরাণকার যে স্বীয় মত সমর্থনের জন্য এই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, এ কথার একান্ত প্রমাণাভাব। সুতরাং আমার মূল সিদ্ধান্ত অক্ষুন্নই রহিতেছে।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

সঞ্জীবনী।

আকাশ মেঘেতে ঢাকা,
নাহি চাঁদ, নাহি আলো,
হাসি মুখ গেছে নিবে,
নদী-বুকে ছায়া কালো!

মেঘের আঁধার কোলে,
ডুবে গেছে ধ্রুবতারা,
হিয়া কাঁপে দুরু দুরু,
কাঁদি একা দিশা হারা!

সহসা মাঝের পথে,
হ'য়ে গেছে পথ-ভুল,
কোথা যেতে কোথা যাব,
চিনিতে পারি না কুল!

আঁধারে হতাশ প্রাণে,
ব'সে আছি শূন্যে চাহি,
কার্য্য-শূন্য লক্ষ্য-ভ্রষ্ট,
সুখ নাহি, শান্তি নাহি!

কে জানে এ মেঘরাশি,
কতদিনে চ'লে যাবে,
কে জানে এ পোড়া হৃদি,
কতদিনে আলো পাবে!

বজ্রদগ্ধ শুষ্ক তরু,
মৃত প্রাণে আছি প'ড়ে,
পারি না ত বুকে নিতে,
আশা-লতা ভূমে প'ড়ে!

উদার কল্পনা রাশি,
না ফুটিতে ঝ'রে গেল,
জীবনের মাঝখানে,
যবনিকা প'ড়ে গেল!

কোথা মোর জ্ঞান-তৃষা,
বিশ্বগ্রাসী মহাক্ষুধা,
কেন ধরা মরুভূমি,
কে হরিল স্বর্গ-সুধা?

কোথা সে শ্যামলা ধরা,
কোথা প্রীতি, কোথা আশা,
কোথা সে অনন্ত দয়া,
পুণ্য তীর্থ—ভালবাসা?

কোথা তুমি ধর্ম্ম কর্ম্ম,
জীবনের সহচর,
কোথা তুমি মহাপুণ্য,
কোথা নিখিল নির্ভর!

অন্ধকার চারি ধারে,
লক্ষ্য-হারা ক্ষিপ্তপারা,
কিবা করি, কিবা চাহি,
বেঁচে আছি আত্মহারা!—

প্রাণ গেছে—আশা গেছে,
আয় রে মরণ আয়,
মধুর পরশ তোর,
স্থান দে রে তোর পায়!

সহসা কি পুণ্যফলে,
ঘুচে গেল অবসাদ,
মস্তকে পড়িল শ্রীরে,
বিধাতার আশীর্ব্বাদ!

আঁধারে জ্বলিল আলো,
সে আলোক চারিধার,
আলোকে হাসিল ধরা,
স্বর্গ মর্ত্ত্য একাকার!

সেই স্নিগ্ধ আলো মাঝে,
দেখিনু দাঁড়ায়ে তুমি,
তোমারি চরণ স্পর্শে,
সুধাপূর্ণ মরুভূমি!

পথ-হারা আমি দীন,
চাহিনু তোমার পানে,
কি সুন্দর আহা তুমি!—
কি মূর্ত্তি আঁকিলে প্রাণে!

ভুলে গেনু আপনারে,
ভুল হ'ল চরাচর,
প্রাণে প্রাণ মিশে গেল,
তুমি-আমি একাকার!

কে তুমি মমতাময়ি!
ছায়া-পথ বিহারিণী,
আঁখিতে করুণা-জ্যোতি,
বুকে প্রেম-মন্দাকিনী?

আসিলে কি দীন পাশে,
মৃত দেহে দিতে প্রাণ,
দিতে কি অভাগাতরে,
আপনারে বলিদান?

মঙ্গল-পল্লব করে,
ঢেলে দিয়ে শান্তিজল,
জুড়াবে কি প্রাণময়ি!
হৃদয়ের দাবানল?

দিবে কি গো যাহা চাই,
সুখ শান্তি ভালবাসা,
অনন্তে বিশ্বাস প্রীতি,
কার্য্য-ক্ষেত্রে গুরু আশা?

পায় যদি, এস দেবি!
হ'বে মোর ধ্রুব-তারা,
তোমা' পরে আঁখি রাখি'
হবনাক পথ হারা!

মঙ্গল পরশে তব,
দূরে যাবে মেঘ রাশি,
হৃদয়ে খেলিবে আলো,
রবি শশী পরকাশি!

পরাণে সাহস পা'ব,
আঁধারে জ্বলিবে আলো,
তোমারে হৃদয় দিয়ে,
সবারে বাসিব ভালো!

চুম্বন-মদিরা তব,
শুষ্কতরু মুঞ্জরিবে,
আশালতা বুকে দিয়ে,
দগ্ধবুক জুড়াইবে!

স্নেহের অঞ্চল খানি,
মুছাবে নয়ন-লোর,
প্রাণে প্রাণে কোলাকুলি,
আনি দিবে ঘুম-ঘোর!

তোমার সুকণ্ঠ সনে,
বাঁশরী ধরিবে তান,
পথহারা চির দীন,
শুনিবে মোহিত প্রাণ!

কভু ত দেখিনে আর
ও মধুর মুখ খানি,
আজি এ প্রথম দেখা,
এরি মাঝে জানাজানি!

আঁধার গিয়াছে চ'লে,
গেছে চ'লে অবিশ্বাস,
ভক্তি প্রীতি শান্তি মিলি'
কোটী রবি পরকাশ!

একটী আলোক-রেখা,
অতি মৃদু, অতি ক্ষীণ,
নিবে বুঝি যেতেছিনু,
প্রতি পলে দীপ্তিহীন!

তুমি দেবি, প্রেমময়ি,
প্রাণে প্রাণ মিশাইলে,
ভুল ভেঙে, আশা দিয়ে,
দগ্ধ হৃদি জুড়াইলে!

স্থিতি-বিধায়িনী তুমি,
দুর্ভাগ্যের চির-আশা,
মৃতপ্রাণে সঞ্জীবনী,
পবিত্র ও ভালবাসা!

শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।

মার্কিন পদ্ধতি।

রাজনৈতিক ও সামাজিক।

যে মার্কিন রাজ্য বর্ত্তমান যুগে সভ্যতা ও সম্পদের, বিজ্ঞান ও উন্নতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, তদ্দেশীয় অধিবাসীদিগের রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে কিছু জানিবার অভিলাষ ও কৌতূহল অনেকেরই থাকা সম্ভব। আমরা আমাদিগের পাঠকদিগের সেই কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করিবার মানসে বর্ত্তমান প্রবন্ধে কতকগুলি মার্কিন প্রথা ও নীতির উল্লেখ করিব।

মার্কিন বলিতে আমরা সাধারণতঃ যুক্ত-

রাজ্যের (United States) বিষয়ই মনে করি। ইহা আদৌ একটি ইংরাজ উপনিবেশ হইলেও, এক্ষণে ইংলণ্ডাপেক্ষাও সমৃদ্ধিশালী ও পরাক্রমশীল। ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দ হইতে অত্রত্য ঔপনিবেশিকগণ মাতৃভূমি ইংলণ্ডের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীনভাবে সাধারণ-তন্ত্র প্রথানুসারে আপনাদিগের রাজকার্য্য সমাধা করিয়া আসিতেছেন।

যুক্তরাজ্য চুয়াল্লিশটি ক্ষুদ্র রাজ্যের সমষ্টি। প্রত্যেক রাজ্য মধ্যে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রচলিত। কিন্তু একটি (Central Government) দ্বারা সমুদয় রাজ্যগুলির শাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। এই কেন্দ্রস্থানীয় শাসন-শক্তির হস্তে দেশ শাসন, ব্যবস্থা প্রণয়ন ও বিচারভার নিহিত। রাজতন্ত্রের রাজার ন্যায় সাধারণ-তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি। সভাপতিই প্রধান ও প্রকৃত শাসনকর্ত্তা। তিনি রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান্ ব্যক্তি। প্রত্যেক চারি বৎসর অন্তর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। সভাপতির বয়ঃক্রম অন্যূন পঁয়ত্রিশ বৎসর হওয়া আবশ্যক। প্রতিভা ও মনস্বিতাই ঈদৃশ উচ্চতম পদে আরূঢ় হইবার একমাত্র সহায়। প্রত্যেক অধিবাসীরই রাজ্যের এই শ্রেষ্ঠতম পদে উন্নীত হইবার অধিকার আছে। জন্ম, বংশ, কুল, ধন, মান, প্রতিপত্তি কিছুই প্রতিবন্ধক বা সহায় হইতে পারে না। প্রতিভা থাকিলে একজন রাখাল, একজন চর্ম্মকার, একজন কাঠুরিয়া অনায়াসে এক দিন সমগ্র যুক্তরাজ্যের সভাপতি পদে বরিত হইতে পারে। ভূতপূর্ব্ব সভাপতিদিগের মধ্যে অনেকেই এইরূপ নিম্নপদ ও শ্রেণী হইতে রাজ্যের এই উচ্চতম পদে আরোহণ করিয়াছিলেন।

সভাপতি রাজ্যের শীর্ষস্থানে সংস্থাপিত হইলেও তাঁহার আর কোন উপাধি নাই। ইংলণ্ড বা অপর দেশের লর্ড, আরল, ব্যারণ, কাউণ্ট, নাইট প্রভৃতি কোনরূপ মর্য্যাদা সূচক উপাধি বা বিশেষণ প্রেসিডেণ্টের প্রতি আরোপ করা হয় না। "Mr." প্রেসিডেণ্ট ব্যতীত, রাজ্যের উচ্চতম পদধারীর অন্য কোন সম্মান-পরিজ্ঞাপক, উপাধি নাই। সভাপতি স্থল সৈন্য ও নৌ সৈন্য উভয় বিভাগের একমাত্র সামরিক প্রধান অধ্যক্ষ। তিনিই পররাষ্ট্রে সন্ধি স্থাপন ও রাজদূত নিয়োগ করেন। তাঁহারই হস্তে বিচারক ও অন্যান্য উচ্চতম রাজ কর্ম্মচারী নিয়োগ ভার সন্ন্যস্ত। তিনিই আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগের উপর তত্বাবধারণ করেন। তদীয় রাজকার্য্যের সহায়তার জন্য একটি মন্ত্রিসভা আছে। আটজন দক্ষ ও রাজনীতি বিশারদ সদস্য লইয়া এই মন্ত্রিসভা পরিগঠিত। সদস্যগণ স্ব স্ব কার্য্য-ভারানুসারে যথাক্রমে পররাষ্ট্র, সমর, নৌসৈন্য, ধনাগার, কৃষি ও স্বরাষ্ট্র সম্পাদক, পোষ্ট-মাষ্টার জেনারাল আর এটর্ণি জেনারাল নামে অভিহিত হন। ইহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন। সদস্য-গণ সপ্তাহে দুইবার সভাপতির গৃহে সমবেত হইয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত, আবশ্যক হইলে, সভাপতির আহ্বানানুসারে অন্য সময়েও তাঁহাদিগকে উপস্থিত হইতে হয়। প্রত্যেক সদস্য স্ব স্ব ভারার্পিত বিভাগের কার্য্য সুচারু-রূপে নিষ্পাদন করিবার জন্য সভাপতির নিকট দায়ী, এবং সভাপতি সমগ্ররাজ্যের সুব্যবস্থা ও সুশাসনের নিমিত্ত প্রজাবৃন্দের নিকট দায়ী।

যুক্তরাজ্যের কংগ্রেস বা পার্লামেণ্ট সভা দুই দল লোক লইয়া পরিগঠিত। এক দলকে (Senate) অপর দলকে (House of Repre-

sentatives) কহে। সেনেট সভা ইংলণ্ডের লর্ড বা সম্ভ্রান্ত সভার সদৃশ। ইহাতে অষ্টাশী জন সেনেটার বা বয়োবৃদ্ধ সভ্য অধিবেশন করেন। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে কেহ সেনেটাররূপে মনোনীত হইতে পারেন না। প্রতি রাজ্য হইতে দুইজন করিয়া,চুয়াল্লিশটি রাজ্য হইতে অষ্টাশীজন সেনেটার নিযুক্ত হন। ইঁহারা স্থানীয় ব্যবস্থাপক বিভাগ হইতে ছয় বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। সময় উত্তীর্ণ হইলে, যে কেহ পুনরায় নির্ব্বাচিত হইতেও পারেন। যুক্তরাজ্যের সেনেটার নির্ব্বাচন প্রথা অতি সুন্দর নিয়মে সাধিত হয়। সেনেট সভার ৮৮জন সভ্য এককালে কর্ম্মে নিযুক্ত বা কর্ম্ম হইতে অবসৃত হন না। ইহার এক-তৃতীয়াংশ সভ্য প্রতি দুই বৎসর অন্তর নির্ব্বাচিত হন। সুতরাং সকল সময়েই দুই-তৃতীয়াংশ এরূপ যোগ্য ও বিজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তি সভায় অধিবিষ্ট থাকেন, যাঁহাদিগের রাজকর্ম্ম সম্বন্ধীয় অন্ততঃ দুই কি চারি বৎসরের অভিজ্ঞতা থাকেই থাকে।

প্রতিনিধি সভা (House of Representatives)সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫০জন প্রতিনিধি সভ্য লইয়া পরিগঠিত। পঞ্চবিংশ বৎসরের ন্যূন হইলে কেহ প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না। নির্দ্ধারিত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, যে কেহ প্রতিনিধি হইতে পারেন। প্রতিনিধিগণ প্রত্যেকে এককালে দুই বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। সময় উত্তীর্ণ হইলে পুনরায় নির্ব্বাচিত হইবার সম্বন্ধে কোন বাধা নাই। সেনেট সভার ন্যায়, প্রতিনিধি সভার সভ্যগণও এককালে অবসৃত হন না। প্রত্যেক দুই বৎসর অন্তর কেবল অর্দ্ধ-সংখ্যক সভ্য সভার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া থাকেন। নবেম্বর মাসে প্রতিনিধি সভার নির্ব্বাচন হইয়া থাকে। আবশ্যক হইলে, সভাপতির নির্ব্বাচনও ঐ সময় হয়। কিন্তু নির্ব্বাচিত নব-প্রতিনিধি-সভ্যগণ অথবা সভাপতি নির্ব্বাচনের পর হইতে দ্বাদশ মাস অতীত না হইলে সভামধ্যে অধিবেশনের অধিকার পান না। ফলতঃ নবেম্বর মাসের নির্ব্বাচনের পর তৎপরবর্ত্তী মার্চ্চমাসে নবনির্ব্বাচিত-সভ্যগণ রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন।*

সভাপতি, সেনেট ও প্রতিনিধি সভার ক্ষমতা পরস্পরের দ্বারা সীমাবদ্ধ। কেহই একাকী আপন স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে সক্ষম নহে। কোন বিষয়ের পাণ্ডুলিপি (রাজস্ব-বৃদ্ধির পাণ্ডুলিপি ব্যতীত) সেনেট সভা কিম্বা প্রতিনিধি সভা দ্বারা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। কিন্তু মঞ্জুর হইবার পূর্ব্বে উভয় সভারই ঐক্য অভিমত আবশ্যক। রাজস্ব বৃদ্ধির পাণ্ডুলিপি কেবল প্রতিনিধি সভা কর্ত্তৃকই প্রথম প্রবর্ত্তিত হইবে। উভয় সভা কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ও সমর্থিত পাণ্ডুলিপি শেষ মঞ্জুর হইবার জন্য সভাপতির নিকট প্রেরিত হয়। সভাপতি বিল মঞ্জুর বা পরিত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু কোন বিল সভাপতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও, যদি বিলের স্বপক্ষে দুই

* মার্কিন রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে প্রতিনিধি সভার পরিবর্ত্তন নিয়ম একটি দোষাবহ প্রথা। প্রত্যেক দ্বৈবাৎসরিক নির্ব্বাচন উপলক্ষে অনেক বৃথা অর্থ শ্রাদ্ধ, উত্তেজনা, ও আন্দোলন এবং নানাবিধ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও অপ্রিয় ভাব ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ ঘন ঘন প্রতিনিধি পরিবর্ত্তন জন্য প্রতিনিধি সভা সর্ব্বতোভাবে শাসন-ক্ষমতার সহিত সংস্পর্শ রক্ষা করিতে পারে না। এই জন্য অনেক সময়ে শাসন-বিভাগ ও ব্যবস্থা-বিভাগ সমবেত ভাবে কার্য্য না করিয়া পরস্পর স্বতন্ত্র ও বিরোধী ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে, এ কুপ্রথার প্রতি রাজনৈতিকদিগের দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে। সম্ভব, অচিরে এ প্রথার সংশোধন ঘটিবে।

তৃতীয়াংশ সভ্য—সেনেট সভার ও প্রতিনিধি সভার—একমত হন, তাহা হইলে সভাপতির নামঞ্জুর রহিত করিয়াও, বিল পাশ হইতে পারে। সেনেট সভার সম্মতি বা অসম্মতির উপর সভাপতির প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ অথবা পররাষ্ট্র সহ সন্ধিবিগ্রহ করণ প্রধানতঃ নির্ভর করে। যখন সাধারণ প্রতিনিধিসভা উচ্চপদস্থ কোন রাজ কর্ম্মচারীকে অভিযুক্ত করে,তখন সেনেট সভা বিচারকের স্থলাভিষিক্ত হয়।

রাজ্যময় বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য তিন শ্রেণীর বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত আছে—সুপ্রীম কোর্ট, সার্কিট কোর্ট, ও ডিষ্ট্রিক্ট কোর্ট। সুপ্রীম কোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি ও আট জন সহযোগী বিচারক (Associate justices) কার্য্য করেন। ওয়াসিংটন নগরে প্রতি বৎসর জুলাই হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের অধিবেশন হয়। নয়টি বিচার সংক্রান্ত এলাকার মধ্যে, প্রতি বৎসর সার্কিট জজ একাকী, কিম্বা কোন এক জন সুপ্রীম কোর্টের জজ, অথবা সার্কিট জজ ও সুপ্রীম কোর্ট জজ উভয়ে একত্রে, কিম্বা ইহাদিগের মধ্যে একজন অপর কোন এক ডিষ্ট্রিক্ট জজের সহিত একত্রে, বসিয়া বিচার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে সমুদয় যুক্ত রাজ্যে সর্ব্ব সমেত পঞ্চান্নটি ডিষ্ট্রিক্ট কোর্ট সংস্থাপিত আছে। ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টে অপেক্ষাকৃত সামান্য বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়। সুপ্রীম কোর্টই রাজ্যের সর্ব্ব প্রধান ক্ষমতাধারী। ইহার ন্যায়ের সমক্ষে সভাপতি,কংগ্রেস-সভা,প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তা, স্থল ও নৌ-সৈন্য সংক্রান্ত সামরিক কর্ম্মচারী—সকলকেই বিনীতভাবে মস্তক অবনত করিতে হয়।

যুক্ত-রাজ্যের অন্তর্গত প্রত্যেক ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনপ্রণালী সমগ্র যুক্ত-রাজ্যের সদৃশ। প্রত্যেক রাজ্যের আপন আপন শাসনকর্ত্তা ও আইন আছে। সমগ্র যুক্তরাজ্যের ন্যায় তদন্তর্গত এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বতন্ত্র সভাপতি, সেনেট ও প্রতিনিধি সভা, এবং বিচার সংক্রান্ত কোর্ট আছে। সভাপতি বা শাসনকর্ত্তা শুল্ক, কর প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করেন, এবং ইহাতে যাহা আয় হয়, তদ্দ্বারা রাজ্য শাসন সংক্রান্ত সমুদয়, এবং অন্যান্য ব্যয়ভার নির্ব্বাহিত হয়। দেশ শাসনের জন্য যে বিপুল অর্থাবশ্যক হয়, প্রজা সাধারণের পক্ষে তাহা ভারযুক্ত বোধ হয় না। কারণ, বিদেশাগত পণ্য ও আবকারী হইতে যে শুল্ক সংগৃহীত হয়, তাহাই সমগ্র দেশ-শাসন ব্যয় সঙ্কুলনে যথেষ্ট হইয়া থাকে।

রাজ্য শাসন-ব্যবস্থা-কর্ত্তাগণ মার্কিন যুবকদিগের শিক্ষাকল্পে সমূহ যত্ন প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যুক্ত-রাজ্যের প্রায় প্রত্যেক বর্গ মাইল স্থানের উপর একটি করিয়া স্কুল স্থাপিত আছে। এখানে সরকারী ব্যয়ে বিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ ও বিদ্যালয়ের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়। সমুদয় ইয়ুরোপে প্রত্যেকের জন্য শিক্ষার্থে যত ব্যয় করা হয়, আমেরিকায় তদপেক্ষা ছয় গুণ ব্যয়িত হইয়া থাকে। অধিকাংশ রাজ্য উচ্চশিক্ষা ও নিম্নশিক্ষার জন্য ইউনিভার্সিটি ও স্কুল স্থাপন করিয়া সরকারী ব্যয়ে ইহাদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইউনিভার্সিটির সহিত কিণ্ডারগার্টেন প্রণালী মতে নিম্নশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় আছে। তথায় বালক বালিকাগণ চতুর্দ্দশ হইতে বিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বিনা ব্যয়ে সকল প্রকার শিক্ষা লাভ করিতে পারে। ঈদৃশ অবৈতনিক শিক্ষা প্রদানের সুবিধার প্রধান কারণ এই যে, অধিকাংশ

কলেজ, ইউনিভার্সিটি ধনী ও সম্ভ্রান্ত অধিবাসী-দিগের বদান্যতা ও দানশীলতায় সংস্থাপিত ও সংরক্ষিত। প্রতি বৎসরই ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এই সকল বিদ্যালয়ে প্রচুর অর্থ দান করিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত, বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্র-গণ সংসারে উন্নতিলাভ করিয়া সঙ্গতিপন্ন হইলে, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ পূর্ব্ব পরিচিত বিদ্যালয়ে অর্থদান করেন। অস্মদ্দেশে, আমরা প্রাচীন বিদ্যালয় ও অধ্যাপকদিগের নিকট এরূপ কৃতজ্ঞ যে, কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইলে শিক্ষক কিম্বা শিক্ষা-স্থানের কথা স্বপ্নেও ভাবি না। একবার কষ্টেসৃষ্টে পরীক্ষো-ত্তীর্ণ হইলে যখন অনেকেরই পুস্তকের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না, তখন আর শিক্ষার প্রকৃত মর্য্যাদা তাঁহারা কি বুঝিবেন? প্রাচীন শিক্ষক ও শিক্ষাস্থানের প্রতি সম্মান বা কৃত-জ্ঞতা প্রদর্শন ত ঢের দূরের কথা!

সাধারণ শিক্ষা-সৌকর্য্যার্থে ব্যক্তিবিশে-ষের দানশীলতার কথা শুনিলে আমাদিগকে আশ্চর্য্য হইতে হয়। একজন সেনেটার কোন এক ইউনিভার্সিটিকে এককালে ছয় কোটী টাকা দান করিয়াছেন। ইঁহার অতুল বিষয়; কিন্তু ইনি অপুত্রক। সম্ভব মৃত্যু কালে সমুদয় সম্পত্তি সাধারণ শিক্ষার্থে দান করিয়া যাইবেন। আমাদের দেশে হইলে এমন ধনী লোক বিষয় রক্ষার চিন্তায় এক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতেন, তথাপি এরূপ সৎকার্য্যে কখনই অর্থদান করিতেন না। মার্কিন সেনেটারের উচ্চ ও মহদ্দৃষ্টান্ত এদেশে কবে অনুসৃত হইবে? আমাদের দেশে ধন-কুবেরের অভাব নাই। নৃত্যগীত প্রভৃতি, অনেক অসৎ কার্য্যে কত সহস্র অর্থ তাঁহারা ঢালিয়া দিতেছেন! কিন্তু স্বদেশবাসীর শিক্ষার জন্য একটি পয়সা দিতেও কত কুণ্ঠিত! পোষ্য-পুত্রগণ প্রায়ই উত্তরাধিকৃত ও অনায়াসলব্ধ সম্পত্তির অপচয় করিয়া থাকেন। চক্ষের সমক্ষে এরূপ কত দৃষ্টান্ত লোকে দেখিতেছে। তথাপি বিষয়ী অপুত্রকগণ নিজেদের অর্থ এক অপোগণ্ডের হস্তে তুলিয়া দিয়া সচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া যান; নিঃস্বার্থ সৎকার্য্যে স্বদেশ-হিতকল্পে দান করিয়া বিপুল অর্থের সার্থকতা করিতে ইচ্ছা করেন না। আবার, যাঁহারা কিছু দান করেন, নাম কিনিবার জন্যই হোক, আর যে জন্যই হোক, তাহাও গবর্ণমেণ্টের হস্তে। আজ কাল ত অনেক যোগ্য স্কুল, কলেজ গবর্ণমেণ্ট সংসৃষ্ট না হই-য়াও অতি গৌরব ও প্রশংসার সহিত শিক্ষা-দান করিতেছে। এই সমুদয় প্রাইভেট বা বেসরকারী কলেজ ও স্কুলের মূলধন অতি অল্প। সমুচিত অর্থ সাহায্য ব্যতিরেকে অনেকেই ভাল করিয়া যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারিতেছে না। এই সকল প্রাইভেট কলেজ, স্কুল কি দানের সুপাত্র নহে? আমাদিগের দেশ যেমন হতভাগ্য, সেইরূপ প্রথা ও নীতি অনুসৃত হইয়া থাকে। আশা, মার্কিনদিগের ন্যায় আমাদিগের স্বদেশীয় ধনাঢ্য মহাত্মাগণ সাধারণের শিক্ষা সৌক-র্য্যার্থে বেসরকারী স্কুল কলেজে অর্থদান করিয়া আপনাদিগের অর্থের সার্থকতা করিবেন।

মার্কিন দেশের বালক বালিকাগণ স্কুল কলেজে একত্রে শিক্ষা করে। বাল্যাবধি এইরূপ মেশামিশির জন্য অতি স্বাস্থ্যকর পবিত্রভাব পরস্পরের হৃদয়ে সঞ্জাত হয়। স্ত্রী ও পুরুষ একত্রে শিক্ষা পাইলেও, পুরুষ পুরুষই থাকেন এবং রমণী কদাচ মহিলো-চিত কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হন না। বস্তুতঃ পরস্পরের প্রতি ভদ্র ব্যবহার ও সম্মান প্রদ-র্শনে এবং মহৎ ও পবিত্রহৃদয়তা ও উচ্চ

জ্ঞানে মার্কিন জাতি পৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষাও হীন নহে। বালক অপেক্ষা অধিকাংশ বালিকা অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে পাঠ করে। এই জন্য আমেরিকার অধিকাংশ রমণী তাহাদিগের স্বামী অপেক্ষা সুশিক্ষিতা; এবং এইরূপ সুশিক্ষিতা মহিলাগণ যখন মাতা হইয়া সংসারে বাস করেন, তখন তাঁহারা কখনই অস্মদ্দেশের অধিকাংশ নিরক্ষরা বা সামান্য শিক্ষিতা মাতার ন্যায় তনয় তনয়াদিগের বিকাশমান ও পরিবর্দ্ধমান জ্ঞানের সমীপে মূর্খা মাতা বলিয়া বিবেচিতা হন না। সন্তান সন্ততির উপর সুশিক্ষিতা মাতার প্রভাব কত যে মধুময় ও উন্নতি সহায়ক, মার্কিন সন্তানদিগের গঠিত চরিত্র, উন্নত-হৃদয় ও মনস্বী মস্তিষ্কের বিকাশ মধ্যে তাহা উপলব্ধি করিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। মার্কিন দেশে সুশিক্ষিতা নারীগণ সুকুমারমতি বালক বালিকার ভবিষ্যজ্জীবনের মূলভিত্তি গঠন সম্বন্ধে প্রধান সহায়িকা হন। বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষক অপেক্ষা শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা দ্বিগুণ অধিক। গৃহে সুশিক্ষিতা মাতা, বাহিরে সুশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রী—উভয় স্থলেই রমণী প্রভাব, বালক বালিকার হৃদয়ে উচ্চ পবিত্র স্বাস্থ্যকর ও উন্নতিকর ভাব সমূহের বীজ বপন করিয়া, তাহাদিগকে অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, মুকুলিত, পুষ্পিত ও ফলিত করিয়া দিতেছেন এবং মার্কিন সন্তানগণ যে এরূপ হৃদয় ও মস্তিষ্ক লইয়া কঠোর সংসারে উন্নতির মার্গে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী জাতি হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি! স্ত্রীজাতির এইরূপ উন্নত শিক্ষায় সমাজের, পরিবারের কত যে মহৎ উপকার সাধিত হয়, মার্কিনজাতীয় জীবনের মহোন্নতি তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন। নগরে, গ্রামে, দেশে, পল্লীতে, প্রাসাদে কুটীরে কোটি কোটি ঈদৃশ সুখ শান্তিপূর্ণ পরিবার মধ্যে যুক্তরাজ্যের সুখ ঐশ্বর্য্য শান্তি বিক্রম উন্নতি বিরাজ করিতেছে। যে গৃহে শান্তি পবিত্রতা নিঃস্বার্থ প্রীতি স্নেহ ও ভালবাসা পরস্পরকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আমরণ বাঁধিয়া রাখে, সে গৃহে স্বাধীনতার জন্য এক স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হয়। স্বাধীন প্রবৃত্তি স্বাভাবিক উৎসের ন্যায় স্বতঃই নির্ম্মল ধারা ছুটাইয়া প্রত্যেক হৃদয়কে পবিত্র অভিষেকে অভিষিক্ত করে। স্বদেশ-বাৎসল্য, স্বদেশ-হিতৈষণা স্বতঃই প্রত্যেক প্রাণে মাতৃস্তন্যধারা পানের সঙ্গে সঙ্গে স্ফুরিত হইতে থাকে। তাই মার্কিন জাতি এত স্বাধীনতাপ্রিয়, এত পরাক্রমশীল। যে মধুময় গৃহ-চতুষ্পার্শ্বে কত স্নেহের স্মৃতি, কত সুখকর শান্তি, পবিত্রতার দৃশ্য, কত আরাম, কত আনন্দ; যে গৃহ জননী, ভগিনী ও সহধর্ম্মিণীর স্নেহ শ্রদ্ধা ও প্রেমে স্বর্গতুল্য; যেথানে সুকুমারমতি ফুল্ল প্রসূন সম তনয় তনয়ার অস্ফুট বা অর্দ্ধস্ফুরিত প্রীতির রোলে নিয়ত পবিত্র আনন্দোচ্ছ্বাস প্রবাহিত; যেথানে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব এবং সহস্র প্রকারের মমতা ও কমনীয় ভাব নিরন্তর বর্ত্তমান থাকিয়া গৃহকে স্বর্গাপেক্ষাও গরীয়সী করে; সেই গৃহ, সেই সুখ, সেই আরাম, সেই আত্মীয় বন্ধু, সেই স্ত্রীপুত্র মাতা পিতা সোদর সোদরাকে পরাধীনতা পাশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোন্ কাপুরুষের প্রাণ না স্বাধীনতার উৎসাহে জ্বলিয়া উঠে? আপনার গৃহের, পরিবারের মর্য্যাদা যে বুঝে, তার প্রাণের অন্তঃপ্রদেশে অনিবার্য্য বেগে স্বাধীনতার উচ্ছ্বাস উঠিবেই উঠিবে, স্বাধীনতার অনল চিরদিন অনির্ব্বাণ জাগিবেই জাগিবে! মার্কিনগণ সুশিক্ষিত পিতামাতা, ভ্রাতা ভগ্নী, স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিবেষ্টিত অতুল গৃহ-সুখের

মর্য্যাদা সম্যক্‌ই বুঝিতে পারে; তাই গৃহ-রক্ষার জন্য, স্বদেশ রক্ষার জন্য সকলেই অকাতরে প্রাণ দিতেও পারে। আমরা পরাধীন ভারতবাসী, এই অতি সুন্দর স্বাভাবিক আত্মদানের প্রবলতম উৎসাহপূর্ণ ইচ্ছার সামান্যতম ছায়া পর্য্যন্তও বুঝি না ও জানি না। সেই জন্য যখন শুনি, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের জাতীয় পতাকার অবমাননার কথা শুনিবামাত্র সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ মার্কিন যুবক অশ্রু-প্লাবিত বক্ষে দৃঢ়মুষ্টি লইয়া দেশের হৃতগৌরব পুনঃস্থাপনের জন্য অগ্রসর হইল, আমরা ইহার প্রকৃত মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারি না। স্বদেশ রক্ষার ভাব প্রত্যেক 'ব্রদার জোনাথেনের' হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল বলিয়া আজ প্রায় পঞ্চবিংশ বৎসর হইল যুক্তরাজ্য সৈন্য সংখ্যার হ্রাস করিয়া পঞ্চবিংশ সহস্র মাত্র রাখিয়াছেন। এক সময়ে এই সৈন্য সংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক ছিল। শাসনকর্তাদিগের দৃঢ় প্রতীতি আছে যে, যদি কখন বিপদের সময় উপস্থিত হয়, দেশের প্রত্যেক অধিবাসী সেনানীবেশে সজ্জিত হইয়া শস্ত্রধারী সৈনিকের কার্য্য করিতে পারিবে। স্বাধীন দেশে স্বাধীনতাপ্রিয় জাতির মধ্যে এইরূপই সম্ভব হয়; অন্য কুত্রাপি ইহা সম্ভব হইতে পারে না। সুসভ্য ও সমুন্নত ইংরাজ যদি ভারতবাসীকে আপনার বিশ্বস্ততার মধ্যে লইয়া, তাহার হৃদয়ের স্বাভাবিক স্বদেশ রক্ষার ইচ্ছাকে মুক্তভাবে পরিগঠিত হইতে দেন, ভারতবাসীকে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈন্য-শ্রেণীতে প্রবৃত্ত হইবার অধিকার দিয়া শারীরিক ও মানসিক নানাবিধ উন্নতির সহিত রণ-বিদ্যায় উন্নতি লাভ করিতে অনুমতি করেন, তাহা হইলে বিশাল ভারতসাম্রাজ্য সংরক্ষার্থে প্রবর্দ্ধমান সামরিক ব্যয়ভার অনেক হ্রাস হইতে পারে এবং তাঁহারাও অন্তঃ বা বহিঃশত্রুশঙ্কার এক দুরপনেয় ও দুষ্পরিহর মর্ম্মভেদী হৃৎকম্পন হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন।

মার্কিন দেশে ধনী নির্ধন, উচ্চনীচ ইত্যাদি বিশেষত্ব নাই; আইনের চক্ষে সকলেই সমান। রাজপথের এক জন মোট-বাহকেরও যে স্বত্ব ও অধিকার, প্রাসাদবাসী অতুল সুখাধিকারী ধনী বা সম্ভ্রান্তেরও সেই স্বত্ব ও অধিকার। রাজ্য-শাসনের দায়িত্ব ও ভার সকলের স্কন্ধেই সমান রূপে আছে। পথের মুষ্টিমেয় ভিখারীও রাজ্যের একজন। এই ভাব প্রত্যেকের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে বলিয়া, বিষয় কার্য্যের উচ্চতা বা নীচতা হেতু পরস্পরের মধ্যে কোন রূপ ঈর্ষা, বিদ্বেষ বা মন্দ ভাব জন্মে না। জমীদার, কি দোকানদার সকলেই এক শ্রেণীর লোক। শ্রমজীবিতা মার্কিনের চক্ষে ঘৃণনীয় বা নিন্দনীয় নহে। বস্তুতঃ সাধারণ লোকে শ্রমশীলতাকে মর্য্যাদার চক্ষে দর্শন করে। "স্বনামঃ পুরুষো ধন্য!" এই প্রবাদ বচনের মাহাত্ম্য ও সার্থকতা মার্কিনেরা প্রকৃততঃ স্ব স্ব জীবনে প্রদর্শন করে। যে ব্যক্তি নিজের পরিশ্রমে বা বুদ্ধি কৌশলে ধন সঞ্চয় না করিয়া, ভাগ্যবলে কোন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, কিম্বা বংশানুক্রমে বিষয় বা উচ্চপদের অধিকারী হয়, তাহার মনে কিছুই নাই। এই জন্য সকলেই আপন উদ্যম ও বুদ্ধি কৌশল সহযোগে অর্থ সঞ্চয়ের উপায় অন্বেষণে সতত ব্যস্ত থাকে। কাজেই, ব্যবসা বাণিজ্য সামান্য দোকান পশার কিম্বা কোন রূপ নীচ শ্রমসাধ্য কার্য্য কেহই ঘৃণা বা নিন্দার চক্ষে দেখে না। এইখানেই মার্কিন জাতির সমূহ বিস্ময়কর উন্নতির এক প্রধান কারণ নিহিত। স্বাধীন ভাবে

স্বাধীন জীবিকা নির্ব্বাহের জন্ত যদি শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহাতে লজ্জা বা অপমান কি? কিন্তু আমরা 'বাবুর' জাতি; শারীরিক পরিশ্রম আমাদের চক্ষে নিতান্তই ঘৃণনীয় ও নিন্দার্হ; এবং এই জন্তই আমাদিগের এত অধোগতি। আর আমাদিগের প্রকৃত জাতীয় উন্নতি এত অধিক দূরে। বাবুতাপ্রিয় হইয়াই আমাদের অদৃষ্টে এত দাসত্ব ঘটিয়াছে! আর সেই নিমিত্তই স্বাধীন ভাবের একটু সামান্তম স্ফুলিঙ্গও আমাদের প্রাণের চতুঃসীমার মধ্যে কদাপি বিকাশ পায় না।

সাধুতা ও সরলতা প্রজাতন্ত্রের মূলভিত্তি। দেশের বা রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা যখন সামান্ত দরিদ্র শ্রমজীবী হইতে উচ্চ ভূস্বামী পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির হস্তে সমভাবে ন্যস্ত, তখন যদি সকলে চরিত্রবান্, ধার্ম্মিক, সৎ ও সরল প্রকৃতি বিশিষ্ট না হয়, প্রজাতন্ত্রের মঙ্গল সুদূর পরাহত। এই নিমিত্ত মার্কিন দেশীয় সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রিকা সকল প্রতিনিয়ত অক্লান্ত ভাবে ব্যক্তিগত দায়ীত্ব ও পরস্পরের নৈতিক উন্নতির অত্যাবশ্যকতা সম্বন্ধে সদুপদেশ প্রদান করিয়া থাকে। সত্যপ্রিয়তা ব্যতিরেকে প্রকৃত সাহস বিকশিত হয় না; আত্ম-মর্য্যাদা-জ্ঞান না থাকিলে প্রকৃত স্বাধীনভাব হৃদয়ে স্ফূরিত হয় না। নিজে সৎ ও সাধু না হইলে, অপরের বিশ্বাস ও নির্ভর আকর্ষণ করা যায় না। পরস্পরের সরলতা ও সততার প্রতি বিশ্বাস না থাকিলে একটা বন্ধন হয় না। যে প্রজাতন্ত্র মতে সকলেই স্বাধীন, সকলেই স্ব স্ব প্রধান, সেখানে পরস্পরের এই সততা বোধ, পরস্পরের প্রতি এক সরল গভীর বিশ্বাসই একমাত্র বন্ধনসূত্র। ইহা ব্যতিরেকে সম্মিলন হয় না, সমিতি হয় না, ঐক্যতা হয় না; কোন উন্নতি কিম্বা সংস্কার সাধনও হয় না। সুতরাং সাধারণের উন্নতি, দেশের স্বাধীনতা, ও জাতীয় উচ্চতা লাভ হয় না।

এতদুদ্দেশ্যে, নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের নৈতিক উন্নতি সাধন কল্পে সহস্র সহস্র নিঃস্বার্থ প্রাণ মার্কিন নরনারী অপরিশ্রান্ত অধ্যবসায় ও যত্ন সহকারে, জীবন মন ঢালিয়া, অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছেন। আমেরিকানদিগের মতে নিরক্ষর ও দরিদ্র ব্যক্তিরাই সমাজের প্রধান ভিত্তি। ভিত্তি অপটু হইলে, সমুদয় প্রাসাদ অচিরে ধ্বংসসাৎ হইতে পারে; আরো, মার্কিনেরা বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই আপন দেশের রাজকার্য্য ভার নির্ব্বাহ সম্বন্ধে কিছু না কিছু করিবার বা বলিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক হওয়া উচিত। সুতরাং সুশিক্ষিত ও মার্জ্জিত বুদ্ধি এবং সুনীতি পরায়ণ না হইলে মনুষ্যের চিন্তাশীলতার সার্থকতা সম্ভব কিরূপে? আর, যখন প্রত্যেক ব্যক্তি ভাবিবে ও মনে করিবে যে দেশের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করা তাহার কর্ত্তব্য, দেশের হিতাহিতের উপর অন্য এক জনের মত, তাহারও স্বার্থ ও ইষ্ট নির্ভর করে, তখনি প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষণা বৃত্তি সম্যক্‌রূপে স্ফুরিত হয়। কিন্তু এইরূপ চিন্তা শক্তির বিস্তার করিতে হইলে, সাধারণের শিক্ষা ও নৈতিক উন্নতি যে নিতান্তই আবশ্যক, মার্কিনগণ ইহা কখনই বিস্মৃত হন না। তাঁহাদের মতে রাজতন্ত্রই হোক, আর প্রজাতন্ত্রই হোক, যে রাজ্যশাসন প্রণালী মনুষ্যত্বের বা মানব জাতির প্রকৃত সম্মান না করে, তাহা অপবিত্র এবং কোন শাসন প্রণালীই শ্রদ্ধা ও সম্মানের যোগ্য নহে, যাহা মনুষ্যকে পবিত্র সামগ্রী বলিয়া বিবেচনা না করে। প্রত্যেক শাসনতন্ত্রের এই মহোপদেশ স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—ইহা বলা বাহুল্য।

শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়।

মধুপুর।

সুন্দর পর্ব্বতপূর্ণ শোভে মধুপুর,
আদি লাবণ্যের লীলা, যে সময়ে উছলিলা,
হঠাৎ জনিলা যেন মধুর মধুর!
গিরি প'রে উঠে গিরি, স্বর্গের শ্যামল সিঁড়ি,
উপরে নন্দন বন নহে বেশি দূর।
অই শোন বাজে বটে, অমরীর কটিতটে,
ভাঙ্গিয়া কামের ঘুম 'ঘুগু'র ঘুঙ্গুর!
অই তারা নাচে গায়, পিকবধূ পাপিয়ায়,
শজারু বাজায় পায় কাঞ্চন-নূপুর!
আলিঙ্গনে সুরবালা, ছিঁড়েছে মুকুতা মালা,
নিঝরে সে নিরমল ঝরে মতিচুর!
তারাই চুম্বন দিতে, ফোটা পড়ে অবনীতে,
ফুটিয়া 'সুরেশা' ফুল মধুর মধুর!
সুন্দর পর্ব্বতপূর্ণ শোভে মধুপুর!

২

শৈলে শৈলে মধুপুর শোভে মনোহর,
যেন এ প্রকৃতিরাণী, রচিয়াছে রাজধানী,
অরণ্য প্রদেশে মরি হিরণ্য নগর।
উচু থাম তালগাছে, শিরে শিরে ধরিয়াছে,
আকাশের নীল ছাদ—অনন্ত সুন্দর!
কিবা রাজ-অট্টালিকা, উপরে উঠেছে শিখা,
জ্যোতির্ম্ময় হেমকুম্ভ দেব দিবাকর!
আরণ্য কুসুমে গাঁথা, রত্নসিংহাসন পাতা,
উপরে 'চাম্বল' ছাতা 'সুরঙ্গী' শিখর! *
পদতলে পাদ্য অর্ঘ্য, 'জয়ন্তী' † ও তৃণবর্গ,
অর্পিছে অনন্ত কাল—যুগ যুগান্তর!
শৈলময় মধুপুর বড়ই সুন্দর!

* সুরঙ্গী—পর্ব্বত। ইহার শিখরে 'চাম্বল' জাতীয় একটী ঘনপত্র বৃহৎ বৃক্ষ ছত্রাকারে শোভা পাইতেছে।

† জয়ন্তী—নদী।

শৈলে শৈলে মধুপুর কত শোভা ধরে,
সুনীল তাম্বুর মত, গিরিশ্রেণী শোভে কত,
সৈন্যের শিবির যেন দিক্ দিগন্তরে!
চারি দিকে শালবন, যেন শিখ সৈন্যগণ,
শ্যামল সাঁজোয়া পরি শ্যাম কলেবরে,
নিশ্চল নির্ভীক দেহ, সংগ্রামে ডরে না কেহ,
বরষে অশনি যদি শত জলধরে,
কিংবা যদি প্রভঞ্জন, এক সঙ্গে করে রণ,
তেমনি কঠিন পণ—পদ নাহি সরে,
অথচ হানে না বাণ, লয় না পরের প্রাণ,
কেমন স্নেহের যুদ্ধ! নিজে যদি মরে—
নীরবে সকলি সয়, যথা রাম দয়াময়,
বাল্মীকির তপোবনে সন্তান-সমরে!
শৈলে শৈলে মধুপুর কত শোভা ধরে!

৪

কত শৈলে কত শোভা রয়েছে ভরিয়া,
কোল হ'তে নামে কা'র, স্নেহের তরল হার,
নিঝরিণী খুকীরাণী হামাগুড়ি দিয়া,
বসুধা তাহার কাছে, বুক পেতে নিতে আছে,
পুলকে যেতেছে তার পরাণ প্লাবিয়া!
চন্দ্রমা দিতেছে 'চিক্', হাসাইয়া চারি দিক্,
পাখীরা গাইছে গান 'ঘুম পাড়ানিয়া'!
স্নেহময়ী মাশী পিসী, প্রতিবেশী 'দিবানিশি',
প্রভাতে সন্ধ্যায় করে সোহাগ আসিয়া!
জনমিলে বড় ঘরে, কে নাহি আদর করে,
কে না দেয় করতালি কুতুহলে গিয়া?
দীন বালকের দেহ, ঘৃণায় ছোঁয়না কেহ,
পড়িলে পায়ের কাছে গড়াগড়ি দিয়া!
অনন্ত শোভায় শৈল রয়েছে প্লাবিয়া!

৫

নানা শৈলে নানা বেশে শোভে মধুপুর,
কোথাও আরক্ত দেহ, মৃণ্ময় পর্ব্বত কেহ,
পড়িয়া রয়েছে যেন প্রকাণ্ড অসুর!
বরষার শত ধারে, বিদীর্ণ করেছে তারে,
অমর অসির ঘায় মরিয়াছে ক্রূর!
কোথা সে বিদার হ'তে, কোথা সে বিশাল ক্ষতে
গলিতেছে রসরক্ত গৈরিক প্রচুর!
কোথাও কেটেছে হাড়, পাষাণ পঞ্জর আর,
কত অস্থি গদাঘাতে হইয়াছে চুর!
যুগান্ত-যুগান্ত কিবা, খাইতেছে নিশিদিবা,
ফুরাইতে পারে নাই শিয়াল কুকুর!
বিশাল অসুর দেহে ভরা মধুপুর!

৬

ঊষায় পাষাণ শৈল হয় অনুমান,
অস্থির অঙ্গার স্তূপ, জ্বলিতেছে অপরূপ,
পূরব গগনে যেন দৈত্যের শ্মশান!
কে জানে এ মহানলে, কত যে যুগান্ত জ্বলে,
আরো যে জ্বলিবে কত নাহি পরিমাণ,
সন্ধ্যায় সহস্র তারা, চেয়ে দেখে দেবতারা,
হইল কি না হইল ভস্ম অবসান,
দানবের দৃঢ় অস্থি পর্ব্বত পাষাণ।

৭

সায়াহ্নে পর্ব্বত শোভা বড় মনোহর!
দিবাকর ধীরে ধীরে, নামে যবে গিরিশিরে,
কাঞ্চন চুচুক শোভে স্তনের উপর!
তেমনি পূরব ভাগে, আরেক পর্ব্বতে জাগে,
পূর্ণিমার সুধাপূর্ণ রাঙ্গা শশধর!
নভ তাহে নীল বুকে, পড়ে যেন অধোমুখে,
ধরণী ঘরণী টানে ছায়ার কাপড়!
সায়াহ্নে পর্ব্বত শোভা বড় মনোহর।

৮

বড় শোভা মধুপুরে সুখ মধুমাসে,
মধুর 'মহুয়া' ফুলে, বধূর ঘোমটা খুলে,
পাহাড় পর্ব্বত জাগে মধুর উচ্ছ্বাসে!
চূত মুকুলের গন্ধে, কি উদাস কি আনন্দে,
কার যেন আবছায়া ছায়া মনে আসে,
যেন কোন প'ড়ো বাড়ী, গৃহস্থ গিয়েছে ছাড়ি,
মুড়া ঝাঁটা ভাঙ্গা হাঁড়ি রেখে ইতিহাসে!
আরো যেন আম গাছে, এমনি মুকুল আছে,
দেখিয়াছি কোন্ দেশে দিক্ ভরে বাসে,
তাহারি একটু ঝাঁজ, নাকে লেগে আছে আজ,
এখনি উড়িয়া যাবে, আরেক নিশ্বাসে!
কত মধু প্রাণে জাগে সুখ মধুমাসে!

৯

বড় শোভা মধুপুরে সুখ মধুমাসে,
লইয়া উৎসাহ আশা, সুখশান্তি ভালবাসা,
ত্রিদিবের দেবতারা বেড়াইতে আসে!
কেবলি উল্লাস স্ফূর্ত্তি, সকলি সজীব মূর্ত্তি,
স্বর্গের আরোগ্য আনে বসন্ত-বাতাসে।
নবীন জলদ হর্ষে, অমৃতের ধারা বর্ষে,
কঙ্করে অঙ্কুর মেলে তরুলতা ঘাসে!
যেন রেণু বালুকায়, সবাই জীবন পায়,
মরণ ভুলিয়া যায় ধরণী উল্লাসে,
মধুময় মধুপুরে সুখ মধুমাসে!

১০

বড় শোভা মধুপুরে সুখ মধুমাসে,
চঞ্চলা বালিকা পরী, চকোরীর গলা ধরি,
খেলায় জোছনা রেতে রজত-আকাশে!
কেহ 'জহরুল' ফুলে, চুমা খায় সখী ভুলে,
ফোটে অধরের দাগ গোলাপী উচ্ছ্বাসে!
আতর তাহারি গন্ধ, তারি রস মকরন্দ,
উড়ে প্রভাতের অলি তারি অভিলাষে!
পরীর প্রসাদ হায় কে না ভালবাসে?

১১

বড় শোভা মধুপুরে সুখ মধুমাসে!
উড়িছে বলাকা শ্রেণী, বিশুভ্র বরফ-বেণী,
বিমল আকাশ গঙ্গা নেমে যেন আসে!
কিবা দিক্-বালিকায়, রয়তের চন্দ্রহার,

নিবিড় নিতম্বে মরি থল থল ভাসে !
সন্ধ্যার শীতল বায়, নীল মেঘ সরে যায়,
বসন্ত আঁচল তার টানিছে উল্লাসে !
লজ্জায় ডুবিছে রবি, সুরুচির চারু ছবি,
নিলাজ বেহায়া কবি তাই দেখে হাসে !
এত 'ছি.ছি !' মধুপুরে সুখ মধুমাসে !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

কাব্যকুসুমাঞ্জলির কবি।

আমাদেরি গৃহে একটি সুন্দর সুগন্ধি কুসুম ফুটিয়া আছে, আমরা আজও বুঝি বা চিনি নাই। বোধ হয় নিশ্চয়ই এক দিন চিনিব ; কিন্তু হায়, যখন—

"————————all
Rush in to Peer and Praise when all in vain
Browning.

সে

'নীরবে ফুটায় সাধ
নীরবে শুকায় আশা,
নীরবে কবিতা তার
গাহিবে প্রাণের ভাষা।'

আরও—

'নীরবে সাঁঝের তারা
তার পানে চেয়ে রয়,
আদর সম্ভাষ সবি
নীরবে নীরবে হয়।'

সে—

'নীরবে মুদিয়া আঁখি
সে মুখ হেরিয়া হাসে,
নীরবে জনম তার
নীরবতা ভালবাসে।'

বিগত প্রণয়ের সুখস্মৃতি যেখানেই উদাসিনীর হৃদয় ব্যাকুল করিয়াছে, সেখানেই তাহার আভাষ আছে, কিন্তু তাহা কি সুন্দর, সুশীল, সংযত এবং সাবধানতার সহিত অভিব্যক্ত ! প্রিয়তমের বিয়োগে ব্যথিত হৃদয়খানি হা হতোস্মির উচ্ছ্বসিত উচ্ছৃঙ্খল স্রোতে কৃপাপাত্র নিরবলম্বনের মতন যেখানে সেখানে ভাসিয়া বেড়ায় নাই, তাহা ফল্গুনদীর গভীর বালুকান্তরের নিম্নে, লোক নয়নের অন্তরালে, নীরবে তাহার প্রাণের দেবতার জন্য করুণ ক্রন্দন করিয়াছে।

আর, সাধনশীল গৃহী যোগী যেমন সম্পূর্ণ সংসারটার মধ্যেও লক্ষ্য রাখিয়াছেন এক অবিনাশী পদার্থে, তেমনি ইহাতেও সংসারের কথা দিয়াই কবি স্বর্গের দিকে অঙ্গুলি হেলন করিয়াছেন। এ শোভা ইহাতে প্রচ্ছন্ন নয়, সমুজ্জ্বল। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের শাস্ত্রাংশ ও কাব্যাংশ পরস্পর বিষয়াংশে যেমন পৃথক্, সে হিসাবে 'কাব্যকুসুমাঞ্জলির' দর খুব বেশী। যে কয়েকটি সাধারণ কথা লইয়া আমাদের নিত্য ঘরকন্না, তাহারি ভিতর দিয়া 'আমার দেবতার' সরল বিশ্বাসী বিশ্বপতির সত্তা কেমন বুঝিয়াছেন :—

অই যে ভাসিছ তুমি নৈশ সমীরণে,
অই যে চাঁদের কোলে
তব চন্দ্রানন দোলে।
এই যে জাগিছ তুমি আমার নয়নে।
গাহিছে বিহঙ্গ বালা তুলিয়া লহরী,
বাগানে ফুটিছে ফুল,
হাসিছে জোনাকী কুল,
ভুবন ভরেছে মরি ! তোমার মাধুরী।

যদি সাকার উপাসনা থাকে, তবে তাহা ইহাই নয় কি ? আর যদি বেদবেদান্ত উপনিষদ-প্রতিপাদ্য বিরাট ওঁকার ধ্যান বল, তাহাও এই কয়টি কথার মধ্যে,—বেশী বক্তৃ-

তার কিছু নাই। বুঝি পুণ্যফলে তিনি একথা বুঝিয়াছেন; বুঝিয়া কি সুন্দর গাহিয়াছেন—

মিছে খুঁজিয়াছি আগে কোথা তুমি রয়ে,
এখন দেখিনু তাই
তোমাময় সব ঠাঁই,
তুমিই রয়েছ সদা বিশ্বময় হ'য়ে।

আর কি দিয়া সেই পরম দেবতার পূজা হইয়াছে? কর্ম্মকাণ্ডময় কোন সম্বল ত নাই। তবু ঐ যে দেখ, তিনি দেবোদ্দেশে যে উপহার দিতেছেন, সর্ব্বান্তর্যামী পরম আদরে নিশ্চয়ই তাহা গ্রহণ করিবেন;—

আবার প্রণমি আমি ধর আর বার,
কিবা দিব উপহার
দিতে কিবা আছে আর?
অশ্রুধারা বিনা আজ্ কি আছে আমার?

কবির সুরভি কবিতাগুচ্ছের সর্ব্বত্র বিশ্বজনীন স্নেহ ভালবাসার যে সৌরভ পাওয়া যায়,তাহাতে তাঁহার প্রতি এক অকপট স্থায়ী শুদ্ধভাবের উদয় হয় এবং তিনি যে আমাদের সকলেরই একজন বিশ্বস্ত ও নিরাপদ সুহৃদ্, অজ্ঞাতসারে হৃদয় যেন তাহাই ভাবিতে ভালবাসে। আমার বোধ হয়—তাঁহার 'পতিতোদ্ধারিণী,' 'মায়ের সাধ,' 'অভাগিনী,' 'আমাদের দেশ,' 'নরবলি' 'ভিখারী,' 'ছোট ভাইটি আমার,' 'পিপাসী,' 'শোকাতুরা মা,' 'পথিক,' 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' 'ভ্রাতার প্রতি ভগ্নী,' প্রভৃতি কবিতা যিনিই দেখিবেন, তাঁহারি মনে এই সকলের সহিত এক অতি অন্তরঙ্গ সহানুভূতির উদ্রেক না হইয়া থাকিবে না।

'ভ্রমর' তাঁহার যথার্থ সমাজচিত্র। সরলা, পবিত্রস্বভাব ভ্রমর অভাগিনী বঙ্গকুলবধূ। ভ্রমরের চরিত্র বুঝাইতে আমাদের অযোগ্য আয়াস স্বীকার নিষ্প্রয়োজন, বঙ্কিমচন্দ্র সে চরিত্র-চিত্রাঙ্কনে সফল হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই লাঞ্ছিতা পতিপ্রাণার উদ্দেশে বলিতে বলিতে কাব্যকুসুমাঞ্জলির কবি অনন্ত সত্ত্বে যাহা অকৃতজ্ঞ, কৃপাপাত্র গোবিন্দলালকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,তেমন গোবিন্দলাল আমরা অনেকে। বঙ্গজননীর অনেক ভ্রমর অসৎপুরুষের মুখ চাহিয়া আছে; কত রমণী প্রাণদিয়া ভালবাসিয়াও প্রতিদানে বিপরীত পাইয়াছে। আরাধ্য পতির একটুখানি স্নেহ ও আদরাকাঙ্ক্ষিনী হইয়া মুগ্ধা বলিতেছে —'ছাই রাজরাণীর সম্পদসুখ, তুলনায় যদি তাহার একটু সোহাগ পাই; আর পতিপ্রেম আশালুব্ধ তাহার হৃদয়হীন, নির্ম্মম প্রতিদান বুকপাতিয়া সহ্য করিতেছে,—অবিশ্বাস—অনাদর—ঔদাস্য!' এখানে কবির কি প্রাণস্পর্শী সম্বোধন!—

হায় অভাগী ভ্রমর!
অনন্ত বিশ্বাস আশা,
সীমাশূন্য ভালবাসা,
যে পতি-চরণে সতী ঢালে নিরন্তর,
সেই কিনা কালো বলে'
চলে যায় পায়ে দলে,'
সে খোঁজে "কাহার রূপে আলো করে ঘর"
কার এ কপাল পোড়ে, অভাগী ভ্রমর!
হায় অভাগী ভ্রমর!
মায়াস্ পুরুষ প্রাণ,
এ উপেক্ষা অপমান,
দিতে কি একটুখানি হ'ল না কাতর?
ও কালো বুকের তলে
স্বর্গমন্দাকিনী চলে,
বুঝিলনা একবারো নিঠুর বর্ব্বর।
এই কি সংসার সুখ, অভাগী ভ্রমর?

সহানুভূতি-কাতর কোনও পুরুষ কবি এস্থলে মহিলা কবির মতন এমন অভেদ অন্তরঙ্গের কথা বলিতে পারিতেন না। কুলরমণীর প্রতি কুলরমণীর কি মধুর একাত্ম সম্বোধন!

কবির বিদ্রূপাত্মক কবিতাগুলিও মানস সৃষ্টির এক একটি সুন্দর কুসুম। তাহার উদ্দেশ্য কোমল, অথচ অনুভবে তীব্র। তাহা ভ্রাতার প্রতি ভগিনীর অতি করুণ আত্ম-বেদনার কথা, অথচ তন্মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা অলক্ষিতে অপরাধীর মনে তাহার আত্ম-কৃতাপরাধের কথা অনুশোচনার সহিত স্মরণ করাইয়া দেয়। গুণপনা এই, ভ্রাতার প্রতি ভগ্নীর উক্তি তাঁহার মর্ম্মাশ্রুর সহিত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, অথচ ভ্রাতাকেও সেই সঙ্গে পরিতাপিত হইয়া যথেষ্ট লজ্জিত হইতে হইয়াছে। ইহাতে পরস্পর বয়স্যোচিত পরিহাস রসিকতার ছায়াও পরিলক্ষিত হয় না, বরং ভ্রাতার প্রতি ভগ্নীর যথার্থ সম্বন্ধের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই কথাগুলি নির্দ্দোষ বিদ্রূপে পরিণত হইয়াছে। এক কথায় ইহা সোঝাসুঝি তিরস্কার নয়, অথচ সুকোমল বিদ্রূপাত্মক তিরস্কার; ইহা সোঝাসুঝি পরিহাস নয়, অথচ শ্লেষাত্মক বিদ্রূপ। স্নেহের ভগ্নী যখন ভ্রাতার অযথা জ্ঞান গর্ব্বোজ্জ্বল মুখের দিকে তাঁহার লজ্জানত নয়ন-পল্লব ঈষৎ তুলিয়া ধরিলেন, তখন জ্ঞানগর্ব্ব স্ফীত ভ্রাতা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল, স্থির কৃষ্ণনীলাভ নয়ন প্রান্তে একটু ঘৃণা, একটু অবিশ্বাস, একটু অনুযোগ ও সেই সঙ্গে তীব্র লজ্জার আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রবাল-রাগ-রক্তাধর-প্রান্তে বিদ্রূপের আধ-প্রচ্ছন্ন হাসিটুকু লুকাইবার চেষ্টা করিয়া ভগ্নী যখন কৌশলে আত্মদৈন্য বলিতে লাগিলেন—

কেন ভাই। আজি হেন ডাকিছ গো আকুলি?
পড়ে' আছি এক কোণে
কেন হেন প'ল মনে?
সহসা মমতা কেন উঠিল বা উথলি?
এসে এসে ফিরে যাই
ভয়ে না আসিতে পাই.
আমি বোন্ তুমি ভাই, জানিছ ত সকলি,
তবে কেন "জাগ জাগ"—ডাক আজি কেবলি?
দাঁড়াতে তোমার পাশে মানা করে' দিয়েছ,
তুমিই দিয়েছ ভয়
"একাল সেকাল নয়"
সাহস ভরসা বল তোমরাই নিয়েছ!
কি কব কপাল মন্দ
জেগে কি করিবে অন্ধ?
আজি কি পুরাণো কথা সব ভুলে গিয়েছ?
'আমাদের যাহা ছিল তোমরাই নিয়েছ!

তখন শুনিতে শুনিতে আত্মপ্রশংসা-পরায়ণ ভ্রাতার উন্নত শির অবনত হয়, লজ্জায় অপরাধী ভ্রাতা ভূতলে দৃষ্টি সংন্যস্ত করে। পবিত্রতাময়ীর মুখের দিকে তিনি তখন তাকাইতে সাহস করিলেন না। হৃদয়ে যত্ন-পালিত অপরাধ লইয়া কোন্ মুখে আমরা আমাদের জননী ও ভগিনীর নিষ্কলঙ্ক মুখের দিকে তাকাই? আমাদেরি অপরাধ সাব্যস্ত করিয়া তিনি আবার কহিতেছেন:—

তোমাদের মাতা কিগো আমাদের জননী?
তোমরাত ধুরন্ধর
আর্য্যগণ বংশধর,
কি মুখে কহিব, মোরা তোমাদের ভগিনী?
তোমরা শিক্ষিত সভ্য
রুচিমান্ নব্য ভব্য,
আঁধারে আঁধারে মোরা ঘুরি দিবা রজনী,
আপনার দশা হেরি লাজে মরি আপনি।

শুধুই রহস্য নয়, সার্থক অনুযোগ! ভ্রাতার নিকট নিরাশ ভগিনীর ন্যায্য আকাঙ্ক্ষার কেমন স্বাভাবিক সংযত উক্তি! এ কথায় আমরা হিন্দুকুলবালার মন বুঝিয়াছি। বুঝিয়া তবু মর্ম্মপীড়িত,—আমাদের নয়ন-প্রান্তে অশ্রু-কণা! কেন, তাহাকি খুলিয়া বলিতে হইবে?

তার পর, আর একটু তীব্রতা আছে। কঠোর সত্যকথা, অথচ যেন অপ্রিয় কথা

কখনই নয়। হিতৈষিণীর তীব্র ব্যঙ্গোক্তি, অথচ বিদ্রূপের চঞ্চল কটাক্ষ নয়।—

ভেবেছিনু একদিন বড় হবে তোমরা,
পুলকে দেখিব চেয়ে—
জ্ঞানের আলোক পেয়ে
সাজাবে জনমভূমি অলকা কি অমরা;
সে আশা হয়েছে হত
এখন ভঙ্গিমা কত।
মুখে শুধু হাঁকাহাঁকি বুকে বিষপসরা।
তোমরা করিলে সব বাকী আছি আমরা?

তিরস্কার হইলেও ইহা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যমাখা এমন একটি যথার্থ কথা যাহা মাথাপাতিয়া মানিয়া লইতে হয় ও শত মুখে সুমার্জ্জিত রুচি, ভাবসম্মিলন, শব্দ-প্রয়োগ-নৈপুণ্য এবং স্নেহ প্রবণ সহৃদয়তাব প্রশংসা না কবিয়া কোন মতেই থাকা যায় না।

মহিলাকবিব কবিতাগুচ্ছ যথার্থই যেন সুন্দর সুগন্ধি বন-যূথিকা। ইহা রাজোদ্যানেব সযত্নশোভিত গোলাপ চামেলি নয়; কোলা-হলোচ্ছ্বাসময়ী নগরীর বিলাস-পুষ্প-শয্যায় মদালস-শায়িত সুন্দরী যুবতীদিগের চারু অঙ্গে শোভা পাইয়া ইহা অত্যুগ্র সৌন্দর্য্য-লালসা উদ্রেক করে না; এই অনাঘ্রাত,পার্থিব কলা-বিকৃত কুসুম লোকনয়নের অন্তরালে, যেখানে স্নেহময়ী সরলা বনবালা তাহার স্নেহ-যত্ন বর্দ্ধিত তরুলতায় তাহার শুভ্র হৃদয়খানি সমর্পণ করিয়াছে, যেখানে শান্ত প্রেমময় মুনিগণের তপোবনবেষ্টিত বন পুষ্প-লতা, মুক্তপালিত নির্ভীক নিরীহ হরিণশাবক, হংসমিথুন, কলকণ্ঠ বিহঙ্গম এবং পুষ্পভারাব-নত তরুশাখা-সখী ঐ ঋষিগণের বিশ্বপ্রেমময় উদার হৃদয়োচ্ছ্বসিত স্নেহলাভ করিয়াছে,ইহা সেই দেবনন্দনোদ্যানের পারিজাত।

যদি প্রতীচ্য তুষার-শুভ্র-সুন্দরীগণ আমা-দের এই মন্দার কুসুমশোভা দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই সরলা নীলনয়না বলিত—

"Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathomed caves of ocean bear,
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness on the desert air"

শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

তুমি কি দেবতা?

১

স্তব্ধ নিশীথে শয্যা উপরে
স্বপ্নে যুবতী বসিল উঠি,
শ্লথ-বন্ধন মুক্ত কবরী
পৃষ্ঠদেশেতে পড়িল লুটি;
ভুলিল টানিতে বক্ষে বসন,—
লজ্জা তখন নাহিক প্রাণে,—
স্বপ্ন-খচিত চক্ষু দুটিতে
চাহিল সুপ্ত পতির পানে।

দ্বাদশীর চাঁদ পশ্চিমাকাশে
হেলাইয়া তনু পড়েছে ঝুঁকি,
আড়ালে থাকিয়া বাতায়ন-পথে
কক্ষ ভিতরে মারিছে উঁকি;
মন্দ পবন নন্দন ভ্রমি
গন্ধ মাখিয়া দাঁড়াল এসে,
অচপল, তবু নিশ্বাস-ভরে
সৌরভ ঘরে এসেছে ভেসে;
জ্যোৎস্না-আড়ালে পাতিতেছে আড়ি

কৌতুকভরা তারকা শত,
জড়াজড়ি করি—নববধূ ঘরে
কিশোরী বালিকাগণের মত!
না দেখিল চাঁদ, না দেখিল তারা,
না জানিল মৃদু-অনিল-শ্বাস,
নাহি সম্বরে মুক্ত কবরী,
নাহি সম্বরে বুকের বাস;
জাগ্রত চোকে, নিদ্রিত মনে,
বিস্মিত যেন,হেরিছে,—কি এ?—
স্বপনের ছবি, নিদ্রার পারে,
এসেছে মানব-শরীর নিয়ে?
কিন্নরী-বীণা-নিন্দিত সুরে
মানবী-কণ্ঠে ঝরিল কথা,—
"প্রিয়! তুমি কি দেবতা?"

২

"প্রিয়! তুমি কি দেবতা?"—
স্বপ্ন-বেলায় প্লাবি, এই কথা
সুধা তরঙ্গে উছলি যায়,—
বর্দ্ধিত করি জ্যোৎস্না প্লাবন,
স্পন্দিত-হৃদি বায়ুর ন্যায়!

৩

নিদ্রিত-পতি-চরণ প্রান্তে
চঞ্চল আঁখি চলিল আগে;
নগ্ন, সুঠাম, চিত্ত-বলন্তি
বক্ষেতে পরে ক্ষণেক জাগে;
সুপ্তি-শান্ত, মুদ্রিত-আঁখি,
শ্লথ-কুঞ্চিত-নিবিড় কেশ,
প্রতিভাদীপ্ত পূর্ণ ললাট
বদনে সুধীরে আসিল শেষ।
চন্দ্রকিরণে মণ্ডিত চারু
সুন্দর সেই মহিমা-ছবি
দীপ্তিছটায় উদ্ভাসে, যথা
স্নিগ্ধ কিরণ প্রভাত-রবি;
স্বর্গ উচিত সূক্ষ্ম সুরভি
নিশ্বাসে যেন আসিছে বহি,—
চঞ্চল আঁখি সুস্থির এবে,
মুগ্ধ নয়নে রহিল চাহি।
কৌমুদী-মৃদু গৌরব জিনি
নয়নে কোমল আলোক ভার,
কল্পনা, যাদু বিস্ময় ঢালি,
বাসবের ধনুঃ মেখেছে তায়;
সুপ্ত সাগরে চন্দ্রমা মত
চুমে প্রিয় মুখে সে আলো কিবা,—
প্রতিভার সোনা, চাঁদের রজত,
জিনিয়া ত্রিদিব-বিমল-বিভা!
স্বপ্ন-তাড়িত হৃদয়-তন্ত্রী
ঝঙ্কারে মৃদু পুলক ব্যথা,—
"প্রিয়! তুমি কি দেবতা?"

৪

"প্রিয়!"

অজ্ঞানের পঙ্কে থাকি, রবিমুখে পদ্মমত,
চেয়ে থাকি তোমা পানে; অস্ফুট সুরভি কত
হৃদয়ের থরে থরে ঘনীভূত হয়ে রয়,
ইন্দ্রিয়, চেতনা, মন, তাহে পরিমলময়।
চাহিনা জানিতে কিছু;তোমার আলোকপ্রাণে
ধরিব, রহিব শুধু তোমারি মুরতি-ধ্যানে।
এই ত শুনিতেছিনু তব মুখে মধুকথা,
সাবিত্রীর দৃঢ় পণ, মৈথিলীর পুণ্য ব্যথা;—
জানি না কেমনে,কিন্তু সে কাহিনী পুণ্যস্রোতে
ভাসিয়া এলাম কোথা,একেলা,অজানা পথে।
সে দেশের শোভা যেন পৃথিবীর শোভা নয়;
শরীরের প্রতি অণু মনে হলো প্রাণময়;
জড়তা যেখানে ছিল চেতনা সেখানে জাগে;
রূপের, রিপুর তৃষা পরিণত অনুরাগে।
নবীন শতেক প্রাণে ভরিল আমার বুক,
কাঁদিল শতেক প্রাণে না হেরে তোমার মুখ

'প্রিয়!' বলে ডাকিবারে চাহিলাম সেবিজনে,
ডাকিতে নারিনু; তবু ডাকিলাম মনে মনে।
তপঃ-সাধনার পরে আশীর্ব্বাদে পূরি আশা,
কে যেন কহিল হৃদে অজানা মধুর ভাষা;
শব্দ তার না বুঝিনু, বুঝিনু কি অর্থ ধরে,
চাহিনু, আকুল-আঁখি, মুখ তুলি, শিরোপরে।
দূরতা, যোজন শত, দৃষ্টি নাহি বাধা দিল,
কি যে শক্তি অমানুষী নয়নেতে সঞ্চারিল;
যা দেখিনু সেথা, প্রিয়, না ভুলিব জন্মে আর,
আলোক-তরঙ্গে খেলে সুষমার পারাবার;
অঙ্কুরিত যে কল্পনা মর্ত্ত্য-হৃদি-মাটি মাঝে,
সে আলোক দিকে চাহি ফুটিল কুসুম-সাজে;
মণ্ডল মাঝারে যেন শরতের যুবা রবি,
বিভাসিল তার মাঝে তব ওই মুখচ্ছবি;
চাহিনু সে মুখ পানে; পুলকে হারানু জ্ঞান,
ইষ্টদেব দরশনে যথা ভকতের প্রাণ;
বিপুল পুলকে তবু গভীর বিষাদ রেখা
পড়িল; কাঁদিনু মনে,—'খালি চোকে২ দেখা?
তৃপ্ত নহে দরশনে,—রমণীর কি পিপাসা!
পরাণে মিশিতে চাহে,—রমণীর কি দুরাশা!
মানস রোদন মম, ধরিয়া কুসুম-কায়,
ছুটিল সে শূন্যপথে, লুটিতে তোমার পায়;
হেরিনু অনন্ত যেন করুণা তোমার মুখে
শত উৎসে উছলিল; নিরুপম শান্ত চোকে
চাহিলে আমার পানে; সুধাময় জ্যোতিঃ তার
ভেদি সে নিবিড় আলো (সূচিভেদ্য অন্ধকার
ভেদিয়া বিচরে যথা চামেলির পরিমল),
ধাইল আমার পানে, প্লাবিয়ে বিমান তল।
তোমার করুণা-জ্যোতিঃ বেদনা-কুসুম মম,
মিশিয়া আধেক পথে ধরিল কি অনুপম
বালক-মূরতি চারু; চরণ হইতে গ্রীবা
রচিত আমার ফুলে; তোমার অতুল বিভা
রচিল মস্তক তার; আসিল আমার কাছে,
বক্ষেতে ধরিনু তায়, ব্যথা দেহে লাগে পাছে।
পুলকে পূরিল তনু; আঁখি নিমিলিত করি,
চুমিনু তাহার মুখে শতবার প্রাণ ভরি।
মনোভব সে শিশুটি কহিল আমার কাণে,—
'এস মা আমার সাথে, ঘুচিবে বেদনা প্রাণে।'
নয়ন মেলিয়া দেখি,—ইন্দ্রজাল চমৎকার!—
যে দৃশ্য দেখিতেছিনু তাহা ত নাহিক আর!
নন্দনকাননমাঝে, মন্দাকিনী উপকূলে
সুগন্ধ কুসুমনম্র মন্দারতরুর মূলে,
কনকশৈকত' পরে, পল্লব শয়নে তুমি
ঘুমায়ে রয়েছ, দেব, আলো করি দেবভূমি।
শশী নীলাকাশ যেন উছলে রজত হাসে,
উছল-হৃদয়ে আমি বসিয়া তোমার পাশে।
অসীম বাসনাভরে চাহিনু চুমিতে মুখে,—
নারিনু মিটাতে সাধ,—সাহস হলোনা বুকে
'তুমি কি দেবতা?' বলি, চুমিনু চরণ-তল,
পরে শুধু হেরিতেছি তব মুখ নিরমল।"

* * * *

নিদ্রার আবেশ পুনঃ আসিল নয়নে ফিরে,
বিকচ কমল পুনঃ মুদে আসে ধীরে ধীরে,
পতির চরণ ছুঁয়ে সে কর মাথায় নিল,
ঢুলু ঢুলু আঁখি ফিরে প্রিয়-মুখ নেহারিল।
আধ-ভাঙা কথাগুলি অবশে ঝরিল মৃদু
(কাঁপিল ঈষৎ বায়ু, চমকিল তারা, বিধু)—
"বল, গো, ব্যগ্রতা করি, তুমি কি দেবতা, প্রিয়!
মানবীর এ পিপাসা,—অপরাধ নাহি নিও!"
বলিতে বলিতে, ধীরে ঢালিল অলস দেহ
নিদ্রিত সে বক্ষোপরে,—পরিচিত প্রিয় গেহ,
নিদ্রিত অধরে প্রিয় চুমিল ঘুমের ঘোরে,
মিটিল বুঝি সে তৃষা যাহা ছিল প্রাণ ভোরে।
গভীর নিদ্রার শ্বাস পতির কপোলপাশে
বহিল, যেমন বহে মলয় প্রভাতাকাশে।
অভ্যাসের বশে সেই প্রিয়তার না জানিল,
অধরে ঈষৎ শুধু হাসিরেখা দেখা দিল।"

* * * *

৫

কৃত্তিকা কহে রোহিণীর কাণে,—
"মিথ্যা মোদের দেবতা-ভাণ,
স্বর্গ ছাড়ায়ে উঠেছে, দেখনা,
মর্ত্ত্য একটি কোমল প্রাণ!"
সপ্তবিংশতি তারকার পতি,
অমৃতভাণ্ডার দেখিয়া খুঁজি,
সরম-জলদে ঢাকে চাঁদমুখ,
এর সমতুল না পেয়ে বুঝি!
নম্র, মথিত, শতেক কুসুমে
মত্তবিলাসী অলস বায়
দীর্ঘশ্বসিল, ভাবি মনে মনে,—
"এ পূজা জীবনে না পেনু, হায়!"

৬

পূর্ণ পরাণে, তৃপ্ত মানসে,
জাগিল যুবতী পতির উরসে,
প্রভাত বেলা;
শিশু কন্যাটি, উষার মতন
(বসুধা আকাশে যেথা আলিঙ্গন)
করিছে খেলা!

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

নেপালের পুরাতত্ত্ব। (১)

প্রথম অধ্যায়।

সাধারণ বিবরণ।

নেপালের উত্তর সীমায় জনশূন্য হিমালয় পর্ব্বত ও তিব্বত, পূর্ব্ব সীমায় মেচি নদী, সিঙ্গলা পর্ব্বত, সিকিমি ও দারজিলিং জিলা, পশ্চিমে (সরদা) কালী নদী ও কুমায়ুন, দক্ষিণ পশ্চিমে পূর্ব্ব অযোধ্যার অন্তর্গত পিলিভিত, খেরি, বারাইচ ও গোণ্ডা জিলা, এবং দক্ষিণে বস্তি, গোরখপুর, চম্পারন, মজফরপুর, দারভাঙ্গা, ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া জিলা অবস্থিত। পূর্ব্ব পশ্চিমে এই পার্ব্বত্য প্রদেশের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫১২ মাইল এবং উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত প্রায় ৭০ হইতে ১৫০ মাইল। নেপালের পরিমাণ ফল ৫৪০০০ বর্গ মাইল এবং অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কাহারও মতে নেপালের বার্ষিক আয় ৩০ লক্ষ, কাহারও অনুমান অনুসারে ৪৩ লক্ষ এবং অন্য কাহারও মতে এক কোটী টাকা।

মুরঙ্গ, চৈনপুর, মকমনি, খটঙ্গ, নেপাল, গুরখা, খাচি ও মলিভূম এই কয় প্রদেশে নেপাল বিভক্ত। করনালি, গণ্ডক, ত্রিশূল গঙ্গা, বুড়ী গণ্ডক, কোশী, ঘর্ঘরা (সরযূ) ও বাগমতী নদী তিব্বতের দক্ষিণস্থ মালভূমি হইতে উৎপন্ন হইয়া নেপালের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কোন নদীই কোন সময়ে যাতায়াত বা বাণিজ্যবর্ত্ম রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। কাটমণ্ডু, ললিতপত্তন, ভাটগাঁও, গুরখা, জমলা ও মকোয়ানপুর নগর বিশেষ প্রসিদ্ধ। নেপাল উপত্যকাস্থিত কাটমণ্ডু নগরীতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক বাস করে। ইহা নেপালের বর্ত্তমান রাজধানী। বাঙ্গলার সমতল হইতে কাটমুণ্ড নগর ৪৭৮৪ ফুট উচ্চ। ৩০০০ হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চ উপত্যকায় নেপালের অধিবাসীরা বাস করিয়া থাকে। এই প্রকার

উপত্যকার মধ্যে নেপাল বৃহত্তম। ইহা দৈর্ঘ্যে ১২ মাইল ও প্রশস্ততায় ৯ মাইল। ইহার চতুর্দ্দিকে উচ্চপর্ব্বতমালা অবস্থিত; ইহার দক্ষিণে চন্দ্রগিরি এবং উত্তরে সেওপুরি ও শীবজীরিয়া পর্ব্বত অবস্থিত।

প্রবাদ আছে যে কাশ্মীরের ন্যায় এই উপত্যকা অতি প্রাচীন কালে জলময় হ্রদে পরিণত ছিল। কৃষিজীবী, শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবসায়ী নেওয়ার জাতি এই উপত্যকায় অধিক সংখ্যায় বাস করে। নেওয়ার জাতি হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী। পূর্ব্বে তিব্বতীদিগের ন্যায় নেওয়ারগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মে অনুরক্ত ছিল। তাহারা তাতার জাতির বংশধর। তাহাদের মুখাকৃতি চীনদেশীয় লোকের মুখাবয়বের অনুরূপ। গুরখা, নেওয়ার, ভূটিয়া, কিরাত, পার্ব্বতীয়া ও নিম্ব প্রভৃতি আদিম অসভ্যজাতি নেপালের প্রধান অধিবাসী। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী গুরখা জাতি হইতে নেপালের মহারাজা এবং গোরখা ও নেওয়ার জাতি হইতে রাজকর্ম্মচারীগণ উদ্ভূত হইয়াছেন।

নেপালের দক্ষিণাংশ 'তরাই' নামে পরিচিত। ইহা নিবিড় বন জঙ্গল ও জলা ভূমিতে পূর্ণ। ইহার জলবায়ু অতি অস্বাস্থ্যকর। তরাইর ভূমিতে ধান্য, পোস্তা, তিসি, রাই, তামাকু এবং উম্বুরের চাষ হয়। চৈত্র হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত এখানে জ্বররোগের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হয়। তরাইর উত্তরে যে নিবিড় বনভূমি আছে, তথায় শাল, শিশু, ভঙ্গ, কত, ওক, পাইন, চম্পা প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ জন্মে।

এই বনভূমির উত্তরে পার্ব্বত্য প্রদেশ আরম্ভ হইয়াছে। জঙ্গলে চেরি, পিয়ার ও চা গাছ জন্মিতে পাওয়া যায়। 'ভিয়া' নামে একপ্রকার শাল গাছের পাতার রসে যে 'চরস' প্রস্তুত হয় তাহা, ধুনার ন্যায় জলিয়া থাকে। সকলের উত্তরে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত হিমালয়, এবং তাহার শৃঙ্গ এভারেষ্ট (২৯০০২ ফুট), ধবলগিরি (২৬৮৬২ ফুট) গোসাইথান ও কাঞ্চন জঙ্ঘা (২৮১৫৬ ফুট) অবস্থিত। ভূটিয়াগণ তিব্বতের সন্নিহিত পর্ব্বতমালায় বাস করিতেছে।

সমুদ্র জলের উপরিভাগ হইতে বিবিধ উচ্চতা অনুসারে নেপালের জলবায়ু অতিশয় বিচিত্রতা ধারণ করিয়াছে। নেপালের উচ্চতা সমুদ্র জলের উপরিভাগ হইতে ৪০০০ ফুটের ন্যূন হইবে না। চির নীহারাচ্ছন্ন হিমালয় পর্ব্বত হইতে কদাচিৎ বায়ু দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়। চৈত্র মাসের মধ্যাহ্নে তাপ ৮০ হইতে ৮৪ ডিগ্রীর অধিক হয় না। এখানের জল বায়ুতে আফ্রিকার মরুভূমির অতি ভীষণ উত্তাপ ও সাইবিরিয়ার দুঃসহ শীত যুগপৎ অবস্থিতি করিতেছে। জলবায়ু সাধারণতঃ দক্ষিণ ইউরোপের ন্যায় নাতিশীতোষ্ণ। দক্ষিণ পূর্ব্বদিক্ হইতে এখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। অতি বৃষ্টিতে সময় সময় উপত্যকাস্থিত নদীতীর আপ্লাবিত হইয়া শস্য নষ্ট করে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে নেপালে বৃষ্টিপাত শীঘ্র শীঘ্র আরম্ভ হয়। কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টিপাত ক্ষান্ত হয়। শীত ৩৪মাস স্থায়ী হয়। শীতের প্রভাবে পর্ব্বতশিখর বরফে আচ্ছন্ন হয়। নিম্নতন উপত্যকাস্থিত দীর্ঘিকাদি জলাশয় সময় সময় জমিয়া যায়। নদীর স্রোত জল কখনও প্রস্তরবৎ কঠিন হয় না।

নেপালে লৌহ, তাম্র, গন্ধক, সীসা ও হরিতালের খনি আছে। পূর্ব্বে নেপাল হইতে অযোধ্যায় প্রচুর তাম্র রপ্তানী হইত। পূর্ব্বে খনিজ দ্রব্য হইতে বৎসরে ২।৩ লক্ষ টাকা আমদানী হইত। গৃহনির্ম্মাণের উপযোগী প্রস্তর ও চুণা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তামা, কাঁসা ও লোহার নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

কলিকাতায় ইউরোপীয় তাম্র একটাকা দরে সের বিক্রয় হইলে, নেপালী তাম্র দেড় টাকা দরে বিক্রীত হয়। ছুরি, বন্দুক, তরবারী, কামান, কাগজ ও মোটা কাপড় নেপালে প্রস্তুত হয়। তাম্র, লৌহ, কাষ্ঠ, তারপিন তৈল, অশ্ব, চমরীর লেজ, হস্তিদন্ত, মধু, মোম, বাজ ও ময়না পক্ষী, আফিম, চিরতা, সোহাগা, মৃগনাভি, কত, পাট, মঞ্জিষ্ঠা, মরীচ, হলদী, ঘি, চর্ম্ম, চাউল, শুষ্ক আদ্রক, সরিষা, তিসি, ধনিয়া ও নানাবিধ ফল মূল বিদেশে রপ্তানী হয়।

নেওয়ার জাতি কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কৃষক পত্নীরা বীজাদি বপন কার্য্যে কৃষকদিগের যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। কৃষকেরা কদাচিৎ হল চালনা করিয়া থাকে। ধান্য, গোধুম যব, মকাই, সরিষা, মূলা, পিঁয়াজ আলু, আদ্রক, ধনিয়া, গোলমরীচ, ইক্ষু ও তুঁত কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে প্রধান। গোময়াদি ও এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ আঁঠাল মৃত্তিকা, ক্ষেত্রে সার দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। তোরি নামে এক প্রকার উৎকৃষ্ট তরকারী নেপালে উৎপন্ন হয়। ধান্যক্ষেত্রে বৎসরে মোটা ও সরু এই দুই প্রকার ধান্যই জন্মিয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর ক্ষেত্রে ধান্য, গোধুম ও যব, মকাই সরিষা, গোলমরীচ, আলু, পিঁয়াজ প্রভৃতি শস্য বৎসরে বৎসরে উৎপন্ন হয়। থাটমুণ্ডু নগরের ইংরেজ রেসিডেন্সীতে সর্ব্ববিধ ইংলণ্ডীয় ফল, ফুল তরকারী জন্মিয়া থাকে। এক প্রকার পার্ব্বতীয় লৌহনির্ম্মিত খুন্তী দ্বারা ক্ষেত্র মধ্যে গর্ত্ত করিয়া, বর্ষার জলপ্লাবনে গর্ত্ত সকল পরিপূর্ণ হইলে তন্মধ্যে ধান্যবীজ রোপিত হয়। চাউলই নেপালীদিগের প্রধান খাদ্য। ঘিয়া ধান্য জলসেচন ভিন্ন অত্যুচ্চ স্থানে জন্মে। হল দ্বারা রীতিমত চাষের প্রণালী নেওয়ারী কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। নেপালে হল বা গোচালিত শকট দেখা যায় না। জলসেচনের প্রথা প্রচলিত আছে। নেপাল উপত্যকার পূর্ব্বাংশে নেওয়ারগণ লবণ ও সোডা প্রস্তুত করিয়া থাকে।

বন্য জন্তুর মধ্যে চমরী গাভী ও চাঙ্গিয়া ছাগল তিব্বতের দক্ষিণস্থ পর্ব্বত মালায় দেখিতে পাওয়া যায়। চাঙ্গিয়ার রোমে এক প্রকার শাল প্রস্তুত হয়। চমরী গাভী লবণ ও শস্যাদি বাণিজ্য দ্রব্যের ভার বহনের জন্য ব্যবহৃত হয়। সারস ও বন্য হংস সময় সময় দেখা যায়। পার্ব্বত্য নদীর স্বচ্ছ ও নির্ম্মল জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য বিচরণ করে। হস্তী অশ্ব ও মহিষ নেপালের অরণ্যে দলে দলে বিচরণ করে। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী নেওয়ার জাতি ভবানীর নিকট বলি দিয়া মহিষের মাংস আহার করিয়া থাকে। গোরখা জাতির তিব্বত আক্রমণ কালে সেনাগণ চমরীর মাংস পর্য্যন্ত আহার করিতে বাধ্য হয়।

মোরঙ্গ ও নেপাল প্রদেশের জঙ্গলে বহুতর শিমুলগাছ আছে। পার্ব্বত্য মগর পুরুষ ও নেওয়ারী রমণীরা শিমুলের তুলায় দরিদ্র লোকের ব্যবহার্য্য এক প্রকার মোটা কাপড় প্রস্তুত করিয়া থাকে। ভুটিয়া জাতি পশমী কম্বল প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে। ইহাই তাহাদের এক মাত্র বস্ত্র। ধনী, লোকেরা বিদেশ হইতে আনীত চীনা রেশম, মলমল, মখমলাদি ব্যবহার করে। নেওয়ারগণ নেপালের প্রধান শিল্পজীবী। তাহারা লৌহ, তাম্র, কাঁসা ও কাষ্ঠের দ্বারা নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকে। পাটন ও ভাটগাঁর কাংস্যপাত্র অতি প্রসিদ্ধ। দফনে নামক এক প্রকার বৃক্ষ লতায় নেওয়ারীরা মোটা কাগজ, ছুরি, বন্দুক, তরবারী, তীর, কোরা নামে ক্ষুদ্র তরবারী

প্রস্তুত করে। জঙ্গলে বাঁশ, বেত, শুক ও পাইন বৃক্ষ প্রচুর জন্মে। ফলের মধ্যে কমলা ও আনারস প্রধান।

কাষ্ঠনির্ম্মিত কারু কার্য্যের জন্য নেপালের নেওয়ার জাতি প্রসিদ্ধ। তাহারা অতি উৎকৃষ্ট রূপ গিল্টি করিয়া থাকে। তিতিবোধি, সক্কিশাল, সকুয়া ও চম্পা নামে চারি প্রকার কাষ্ঠে নেওয়ারগণ 'কুক' ও 'রাঙ্গা' নামে দ্বিবিধ লৌহাস্ত্র দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। দেবতা, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, সর্প, পশু, পক্ষী প্রভৃতি বিবিধ প্রাণীর এবং বিবিধ ফলপুষ্পের প্রতিকৃতি কাষ্ঠে খোদিত হয়। দেবমন্দির, রাজপ্রাসাদ, রাজকীয় কার্য্যালয় ও ধনীর গৃহ কাষ্ঠখোদিত বিবিধ প্রতিমূর্ত্তির দ্বারা শোভিত দেখা যায়। পাটন নগরের দেবমন্দিরে এবংবিধ কারুকার্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। নেপালের সূত্রধরগণ করাত দ্বারা কখনও কাষ্ঠ ছেদন করে না। কারুকার্য্য বিশিষ্ট গৃহদ্বার সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

নেপালের অধিবাসী নেওয়ার ও অন্যান্য জাতি অধিক মাত্রায় সুরাপান করিয়া থাকে। মহুয়াবৃক্ষ, চাউল ও গোধুম প্রভৃতি শস্য হইতে তাহারা স্বহস্তে"ফৌর"ও "রুক্সি" নামে দুই প্রকার মদিরা প্রস্তুত করিয়া, তাহা পান করে।

নেপালীগণ দ্বিতল বা ত্রিতল ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহে সচরাচর বাস করিয়া থাকে। সুরকি চূণের পরিবর্ত্তে মৃত্তিকা দ্বারা ইষ্টক গ্রথিত করিয়া থাকে। প্রস্তর ও চূণা গৃহনির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয় না। বর্ত্তমান সময়ে নির্ম্মিত অধিকাংশ গৃহের ভিতরে কি বাহিরে কারুকার্য্য দ্বারা সৌষ্ঠব সাধনের অণুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় না। নেওয়ার জাতীয় হিন্দু রাজাদিগের সময়ে খাটমণ্ডু, ভাটগাঁও ও পাটন নগরে যে সকল প্রাচীন গৃহাদি নির্ম্মিত হয়, তাহাতে কাষ্ঠখোদিত কারুকার্য্যের বিশিষ্ট উৎকর্ষতা প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৩০ বৎসরের অধিক কাল গত হইল, নেপালে গুরখা বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পূর্ব্বে নেপাল নানা ক্ষুদ্র ও স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সেই সকল রাজাদিগের সময়ে নেপালে কাষ্ঠখনন ও ধাতুময় দ্রব্য নির্ম্মাণাদি নানাবিধ শিল্প কার্য্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। নেপালে হিন্দুধর্ম্ম প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার শিল্প কার্য্যের বিশিষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

নেপালে সিক্কা নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত আছে। এই সকল সিক্কা মুদ্রার প্রত্যেকটীর মূল্য আমাদের আধুলীর তুল্য। প্রচলিত তাম্র মুদ্রার ২০০টী একসিক্কা মুদ্রার সমান।

নেপালের রণপতাকায় হনুমানের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। বন্দুক, কামান, তরবারী, ধনু ও তীর দ্বারা নেপালী সেনারা যুদ্ধ করিয়া থাকে। তাহারা বিলক্ষণ সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু। কথিত আছে যে, নেপালী সেনা ৫০।৬০ দলে বিভক্ত। গোরখাবংশের শাসন কালে নেপালী সেনার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সামবিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ শিল্পকার্য্যের বিলক্ষণ অবনতি ঘটিয়াছে। সেনাগণ ও সৈনিক কর্ম্মচারীগণ বেতনের পরিবর্ত্তে ভূমি ও গ্রাম জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বেতনও পাইয়া থাকে।

নেপালের মহারাজা গোরখা বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। নেপালে এক্ষণে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত। বৌদ্ধধর্ম্ম নেপালে দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। তিব্বত ও চীনের সঙ্গে তখন নেপাল ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনের পর হইতে তিব্বতীয় লামার ধর্ম্মবিষয়ক আধিপত্য নেপালে বিলুপ্ত হইয়াছে।

নেপালের রাজা যথেচ্ছাচারী। প্রাচীন প্রথা ও হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের অনুসারে রাজ্যশাসিত হয়। রাজা ও রাজকর্ম্মচারীগণ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ জাতি হইতে উদ্ভূত। সেনাগণ ক্ষত্রিয় গোরখা জাতি হইতে সচরাচর নির্ব্বাচিত হয়। রাজসরকার হইতে সেনাদিগের বেশ-ভূষা ও অস্ত্রাদি প্রদত্ত হয়। সামান্য সৈনিকেরা বার্ষিক ৭০।৮০ টাকা বেতন পাইয়া থাকে। প্রতি গ্রামের অধিবাসী হইতে ভূমি ও গৃহের কর ব্যতীত তামাকু, সুপারী, লবণাদি ব্যবহার্য্য দ্রব্যের উপর শুল্ক গৃহীত হয়। সৈন্যদিগের বেতনের পরিবর্ত্তে অনেক গ্রাম জায়গীর প্রদত্ত হইয়াছে। এবংবিধ সৈনিক জায়গীরের আয় তিন টাকা হইতে ৫।৭হাজার টাকা পর্য্যন্ত নিরূপিত আছে। প্রতিবর্ষে ৭।৮ লক্ষ টাকা টাঁকশাল হইতে আমদানী হয়। খনিজ দ্রব্যের বিক্রয় দ্বারা প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা আমদানী হয়। এতদ্ভিন্ন মূল্যবান কাষ্ঠ বিক্রয় ও বনকর হইতে বর্ষে বর্ষে রাজকোষে অর্থ সংগৃহীত হয়।

গোরখা ও নেওয়ার জাতি ভিন্ন নেপালে পার্ব্বতীয়া, ভুটিয়া, কিরাত, লিম্বু, হোবু, ধেনোয়ার এবং মগর নামে পার্ব্বত্য জাতি বাস করে। পার্ব্বতীয়াগণ নেওয়ার জাতির ন্যায় কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তাহারা চারি ভাগে বিভক্ত। ধেনোয়ার ও মাঞ্জি জাতি পশ্চিমস্থ প্রদেশে কৃষক ও মৎস্যজীবীর ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

নেপালী ব্রাহ্মণগণ সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিয়া থাকে। ভাটগাঁও সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য বারাণসীর ন্যায় নেপালে প্রসিদ্ধ। নেপালের সর্ব্বত্র অসংখ্য দেবমূর্ত্তি ও দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। নেপালের উপত্যকায় পশুপতি, শম্ভুনাথ ও বুদ্ধনাথ প্রভৃতি বহুসংখ্যক প্রাচীন দেবমন্দির আছে। ভাটগাঁও নগরের এক পুস্তকাগারে পনরহাজার সংস্কৃত পুস্তক রক্ষিত ছিল বলিয়া ইংরেজ রাজদূত (রেসিডেণ্ট)General Kirkpatrick সাহেব ১৭৯৩ খ্রীঃ অবগত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ভিন্ন নেপালে পার্ব্বতীয়া, নেওয়ারী, ভুটিয়া, মগর, লিম্বুয়া ও কিরান্তী প্রভৃতি ভাষা প্রচলিত আছে। হিন্দীভাষায় কথোপকথন,সভ্যতর গোরখা ও নেওয়ার জাতীয় নেপালীরা বুঝিতে পারে। নেপালী (পার্ব্বতীয়া) ভাষা মৈথিলী,হিন্দী, ও বাঙ্গলার ন্যায় প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; গোরখা জাতির মধ্যে এই পার্ব্বতীয়া ভাষা প্রচলিত। নেওয়ারী ভাষা স্বতন্ত্র। নেওয়ারগণ হিন্দীভাষায় কথোপকথন বুঝে। পার্ব্বতী, নেওয়ারী ভাষার অক্ষর সর্ব্বথা দেবনাগরী অক্ষরের অনুরূপী। বিহারের কায়েথী অক্ষর নেপালে প্রচলিত আছে। নেপাল স্বাধীনতার চির-লীলা ভূমি। নেপাল অদ্য পর্য্যন্তও কোন বৈদেশিক জাতির পদানত হয় নাই। আরব, পাঠান, মোগল, তাতার, আফগান প্রভৃতি মুসলমানজাতি পর্ব্বতবেষ্টিত নেপালে কস্মিন্ কালেও প্রবেশাধিকার লাভ করে নাই। নেপাল চিরকাল আপনার অমূল্য স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিয়াছে। নেপালের শাসনকার্য্যে ইংরেজ দূতের হস্তক্ষেপ করার অধিকার নাই। বিনা অনুমতিতে নেপালে কোন বিদেশী প্রবেশ করিতে পারে না।

১৭৯২ খ্রীঃ মার্চ্চমাসে মহামতি গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণোয়ালিসের শাসন কালে নেপালের সহিত বাণিজ্যবিষয়ক সন্ধি সংস্থাপিত হয়। বারাণসীর ইংরেজ দূত সুপ্রসিদ্ধ(Jonathan Duncan)সাহেবের প্রযত্নে এই সন্ধি বন্ধনে ইংরেজরাজের সহিত নেপাল

মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হয়। তদবধি একজন ইংরেজ দূত (রেসিডেণ্ট) নেপালের রাজধানী থাটমণ্ডু নগরে অবস্থিতি করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বোক্ত জেনারেল কার্কপ্যাট্রিক সাহেব তদনুসারে প্রথম রাজদূত নিযুক্ত হইয়া নেপালে গমন করেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম নেপালের বিবরণ সংগৃহীত করিয়া ইউরোপের সহিত নেপালকে পরিচিত করেন *। তৎপূর্ব্বে পাদরী (Guiseppe)সাহেব নেপালের সংক্ষিপ্ত ভৌগলিক বিবরণ প্রকাশিত করেন। (Asiatic Researches) পত্রিকার দ্বিতীয় ভাগে ১৭৯০খ্রীঃ এই বিবরণ প্রচারিত হয়। কার্কপ্যাট্রিক সাহেবের পর থাটমণ্ডুর ইংরেজ দূত (B.H.Hodgson) সাহেব নেপালের সম্বন্ধে নানাবিধ প্রবন্ধ রচনা করিয়া আপনার পাণ্ডিত্য ও গবেষণার পরিচয় দেন। ইংরেজ রাজদূতগণের নিকট নেপালের ইতিহাস সবিশেষ ঋণী। বাঙ্গলা ভাষায় অদ্যপর্য্যন্ত নেপালের ইতিহাস সম্যক্ রূপে আলোচিত হয় নাই।

মলবারের নায়রজাতীয় রমণীদিগের ন্যায় নেপালের নেওয়ার জাতীয় কামিনীদিগের মধ্যে বহুপতিত্ব প্রথা প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোকেরা যথেচ্ছভাবে এক পতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারে। নেওয়ার জাতি শান্তিপ্রিয়, হাস্যমুখ ও সরল প্রকৃতি। তাহারা বিলাসিতা, পরানুবৃত্তি ও বাহ্য বেশভূষা ভাল বাসে না। পুরুষ মধ্যমাকৃতি ও সবল শরীর। তাহাদের বক্ষস্থল ও স্কন্ধদেশ প্রশস্ত, নাসিকা চেপ্টা, চক্ষু ক্ষুদ্র, মুখাকৃতি চেপ্টা ও গোলাকার। তাহাদের গাত্রের রঙ্ ঈষৎ কৃষ্ণমিশ্রিত তাম্রবর্ণ।

নেপালে যে অব্দ প্রচলিত আছে, ৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাহার গণনা আরম্ভ হয়। ইহা নেপালী সংবৎ নামে প্রসিদ্ধ।

চম্পারণ জিলার অন্তর্গত সেগৌলি সেনানিবাস হইতে থাটমণ্ডু পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে,তাহা ৯২ মাইল দীর্ঘ। রাকশূল নামক স্থানে এই পথ নেপালে প্রবিষ্ট হইয়াছে। তদনন্তর সমরবসা, হতৌরা,ভিমফেদি ও থানকোট দিয়া এই পথ থাটমণ্ডু পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছে। এই পথে পাটনা ও রিভেলগঞ্জ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগর হইতে নেপালে প্রতিবৎসর তুলা,সূতা,সূতার কাপড়,সিন্দুর,লাক্ষা, তৈল, লবণ, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, পশমীবস্ত্র, শাল, রেশম, চিনি, নীল, মসল্লা, তামাকু, তামা ও কাঁসার অলঙ্কার, দর্পণ, মালা, চা, মূল্যবান প্রস্তর, বন্দুক এবং বারুদ প্রেরিত হয়। নেপাল হইতে নানাবিধ দ্রব্য এই পথেই ভারতবর্ষে রপ্তানী হয়।

রাজধানী থাটমণ্ডু হইতে কোশী নদীর এক শাখার তীরদেশ দিয়া তিব্বতের প্রান্তবর্ত্তী কুটি বা নিলম পর্য্যন্ত এক অতি দুর্গম রাস্তা আছে। অপর এক রাস্তা গণ্ডক নদের পূর্ব্বশাখার তীর দেশ দিয়া কিরঙ্গ হইয়া সানপু নদীর তীরবর্ত্তী তাড়ম পর্য্যন্ত বিস্তা-

* নেপাল সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কার্কপ্যাট্রিক সাহেবই তাঁহার প্রথম পথপ্রদর্শন করেন প্রয়োজনীয় বোধে নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল। সুবিখ্যাত হগসন সাহেব (১৭৯৯—১৮৯৩) দীর্ঘকাল নেপালে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নেপালের ইতিহাস, সাহিত্য ধর্ম্ম,শিল্প, আচার ব্যবহার ও প্রাণীবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বহুতর প্রবন্ধ রচনা করেন।

General Kirkparrick's Account of Nepal.
Dr. Wright s History of Nepal.
B. H. Hodgson's Essays (Asiatic Researches xvi, xvii, xx and Journal of A. S. B. i, ii, iii, iv, v, xii, xvi, xvii, xxv, xxvi.)
Indian Antiquary (vii, pp. 89—92, ix pp. 163—94,) xiii 411,(and xiv pp. 97, 342—44.)
Dr. Bhagavanlal Indraji's, "Twenty-three Inscriptions from Nepal" (1885).
C. Bendall's "Catalogue of Buddhist Sanskrit MSS in the Cambridge University Library.

রিত আছে। নিলম সমুদ্রের উপরিভাগ হইতে চৌদ্দ হাজার ফুট এবং কিরঙ্গ নয় হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত। এই উভয় পথই অতিশয় দুর্গম ও দুরারোহ। পুরুষ ও রমণীরা এই দুই পথ দিয়া তিব্বতে যাতায়াত করিয়া থাকে। স্ত্রীপুরুষেরা প্রায় সকল দ্রব্যই স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া যায়। তাহারা কেবল লবণ ও শস্যাদি পার্ব্বতীয় ভেড়া ও ছাগলের পৃষ্ঠে বহন করিয়া থাকে। তিব্বত হইতে এই পথে পশমিনা (পশমী শাল), মোটা পশমের শীত বস্ত্র, চৌরী, মৃগনাভি, সোহাগা, লবণ, পায়রা, হরিতাল, স্বর্ণরেণু, রসাঞ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, চরসাদি বিবিধ ভৈষজ্য দ্রব্য, ও শুষ্ক ফলমূলাদি আনীত হয়।

নেপাল হইতে তিব্বতে তৎপরিবর্ত্তে তাম্রপাত্র, কাংস্যপাত্র ও লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র প্রেরিত হয়। ইহা ভিন্ন বিলাতী বস্ত্র ও লৌহনির্ম্মিত দ্রব্য, তামাকু, মসল্লা, পান, সুপারী, নানাবিধ ধাতু ও মূল্যবান প্রস্তর তিব্বতে নীত হয়।

নেপালে সর্ব্ববিধ আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের উপর শুল্ক গৃহীত হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মাশুল বিলাসিতার উপযোগী দ্রব্যের শুল্ক অপেক্ষা অনেক কম। বাণিজ্য বর্ত্মের স্থানে স্থানে ও প্রতি বাজারে শুল্ক আদায়ের জন্য রাজকীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে। কখন কখন শুল্ক আদায়ের ভার প্রকাশ্য নিলামে ঠিকাদারের প্রতি অর্পিত হয়। বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন হারে বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্ক গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই বিভিন্নতার জন্য বাণিজ্যব্যবসায়ীদিগকে কোন রূপে উৎপীড়িত হইতে হয় না। বাণিজ্যজীবীরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের শুল্কের হার অবগত থাকাতে, কেহই তাহাদিগকে উৎপীড়ন করিতে সমর্থ হয় না। কোন কোন দ্রব্যের মূল্যের উপর শতকরা হারে শুল্ক আদায় হয়। কিন্তু সচরাচর ওজন, ভার বা সংখ্যা অনুসারে বিভিন্ন দ্রব্যের মাশুল আদায় হয়। কাষ্ঠ, গজদন্ত, লবণ, তাম্র মুদ্রা, তামাকু ও ধনিয়া বিক্রয়ের ব্যবসায় মহারাজ নিজ হস্তে রাখিয়াছেন। রাজার প্রিয়তম সভাসদ বা অমাত্যগণ সময় সময় রাজার অনুগ্রহে এই সকল দ্রব্যের ব্যবসায় চালাইয়া থাকে। অন্যান্য দ্রবের ব্যবসায় সকল প্রজাই স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে স্বচ্ছন্দে চালাইতে পারে।

নেপাল রাজ্য সম্বন্ধে নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় উপরে উল্লিখিত হইল। এই বিবরণ হইতে নেপালের নৈসর্গিক ও ভৌগোলিক অবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। নেপাল সম্বন্ধে বাঙ্গলা ভাষায় কোনও বিবরণ লিখিত হইয়াছে কিনা, তাহা জানি না। এই নিমিত্ত বহু যত্নে যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ভারতবর্ষের মধ্যে নেপাল ও ভোটান মাত্র স্বীয় স্বাধীনতা অদ্য পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। কত যুগ অতীত হইল, কত দেশ উচ্ছন্ন হইল, কত জাতি ও ধর্ম্ম জগতের নানা স্থানে অভ্যুদিত ও পতিত হইল, কত রাজবংশ কালগর্ভে বিলীন হইল,—সুদৃঢ় পর্ব্বতময় দুর্গে পরিবেষ্টিত থাকিয়া নেপাল তাহার কোনও সংবাদ লয় নাই। নিয়তিচক্রের গতি পরিবর্ত্তনে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির শাসন প্রতিষ্ঠিত ও উন্মূলিত হইয়াছে, হিমাচলের আশ্রয়ে নিভৃতে ও নিরাপদে অবস্থিতি করিয়া নেপাল সে সকল ব্যাপার অবগত হইতে কোনও চেষ্টা করে নাই। নেপালে হিন্দুরাজত্ব অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, হিন্দুজাতির পূর্ব্ব

মাহাত্ম্য জগতে কীর্ত্তন করিতেছে। স্বাধীনতার লীলাভূমি নেপালের ইতিহাস ভারতবাসী হিন্দু মাত্রেরই অতি আদরের ও গৌরবের সামগ্রী। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

বিধুরা।

আমি চাই ভুলে যেতে,
পূর্ণ বিস্মৃতিরে পেতে,
কাঁদিতে ভাবিতে নাহি সাধ!
শান্তি গেছে কোন দূরে,
অশান্তি বেড়ায় ঘুরে,
প্রেমে কলঙ্কিনী অপবাদ।

একাকিনী কুঞ্জমাঝে,
আমি কেন বৃথা কাজে,
আকাশ কুসুম লোভে আসি?
হাসে চন্দ্র সুষমায়,
ভাসে দিক জোছনায়,
ফুটে উঠে কুসুমের রাশি;

নব নব ব্যাকুলতা,
বিজন প্রাণের কথা,
আশার উত্তাপে উঠে ফুটে,
ঢালে ফুল পরিমল,
ব্যথা আনে অশ্রুজল,
যায় যায় বুক যেন টুটে;

প্রতি রজনীর শেষে
আশাগুলি ম্লান বেশে,
মূর্চ্ছাতুর হয়ে পড়ে প্রাণে,
দিন আসে দিন যায়
প্রদোষ হাসিয়া চায়,
মৃত আশা জীয়ে উঠে ধ্যানে!

উদাস হৃদয় মাঝে
কার যেন বাঁশী বাজে,
কোথা হতে কে আমারে ডাকে;
একি রহস্যের খেলা,
যে করে সতত হেলা,
প্রাণ কেন সদা চায় তাকে?

এ কেমন ঘোর ভ্রান্তি,
অশান্তির মাঝে শান্তি,
লভিতে বাসনা করে মন;
প্রেম যে চাহেনা কভু
তারে প্রাণ চায় তবু,
তার তরে সদা উচাটন।

করেছি যাহারে দান,
আমার সমগ্র প্রাণ,
সে চাহেনা মুখ পানে ফিরে,
নিসর্গ গুম্ফিত মালা
এই যৌবনের ডালা,
ভাসিবে কি নিরাশার নীরে?
বুকেতে উছলে মধু,
এসো তুমি এসো বঁধু!
যাতনা যে নাহি সহে আর,
নিরাশায় কম্পমান,
ম্রিয়মান এ পরাণ,
তোমা তরে কাঁদে বার বার।

যদি অবজ্ঞার বাণে
বিঁধিবে কোমল প্রাণে,
করেছিলে এরূপ মনন;
প্রেমের মূরতি হ'য়ে
অপার সৌন্দর্য্য লয়ে,
তবে কেন ভুলাইলে মন?

মোহ মাখা দরশনে
মণিমন্ত্র পরশনে,
আমাতে নাহিক আমি আর !
চারি ধারে জাগরণ
করিতেছে বিচরণ,
তন্দ্রাহীন নয়ন আমার !

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী।

ভগ্নমনোরথ।

দুই পাশে উষা সন্ধ্যা হেমস্বপ্নবৎ
আশার অলকাপূর্ণ মোহ ইন্দ্রজালে,
মধ্যাহ্ন চলেছে পথে ভগ্নমনোরথ.
জ্বলন্ত জীবন নিয়ে দগ্ধ অন্তরালে !
দুই পাশে প্রস্ফুটিত গিরি-কুঞ্জবন,
পাষাণে আছাড়ে মাঝে নিরাশ-নির্ঝর,
অনাদরে উড়ে তার চূর্ণ প্রাণমন,
অরণ্য পবনে আহা দিক্‌দিগন্তর !
হাসে ধরা শস্যপূর্ণ শ্যাম-মমতায়,
হতাশে জ্বলিয়া মরে মধ্যে মরুভূমি,
এই দয়া এই স্নেহ এই করুণায়,
সংসার ! জগতে ধন্য হইয়াছ তুমি ?
এপারে বসন্ত হাসে ও পারে শরত্,
মধ্যে মরে শীতগ্রীষ্ম ভগ্নমনোরথ !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

সেক্ষপীয়রের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।

অষ্টাদশ সংখ্যা।

সমধিক শান্তি শোভা বিরাজে তোমাতে
বসন্তের সনে তব করিলে তুলনা ;
ক্ষণস্থায়ী শোভা তার ; বসন্ত-প্রভাতে
বিকম্পিত সুকুমার কুসুম ললনা।
উদিত সুতীব্র কভু ত্রিদিব-লোচন
কভুবা তমসাচ্ছন্ন স্বর্ণ-আভা তার ;
সময়েতে সৌন্দর্য্যের অবশ্য পতন
প্রকৃতির আবর্ত্তনে কিম্বা ঘটনার।
কিন্তু চিরস্থায়ী সখে, বসন্ত তোমার,
অতুল সুষমা কভু হবেনা মলিন ;
তবোপরি শমনের নাহি অধিকার,
জীবিত এ গাঁথা বলে তুমি চিরদিন।
যতদিন রবে জীব—দেখিবে নয়ন,
অমর এ প্রেম-গাঁথা—তোমার জীবন।

সপ্তবিংশ সংখ্যা।

পরিশ্রান্ত যাই যবে করিতে শয়ন
লভে শান্তি গতিক্লান্ত চরণ যুগল ;
কিন্তু মন, অবিশ্রান্ত করে পর্য্যটন
দিবসের কার্য্যে যবে শরীর বিকল।
চিন্তা মম অতিদূরে—তোমা পানে ধায়
ব্যাকুলিত ভক্ত যথা তীর্থ দরশনে ;
নিদ্রা অবসন্ন আঁখি তোমাকে ধেয়ায়
আঁধারে ;—আলোক যাহা অন্ধের নয়নে।
কল্পনা—মানস-আঁখি-মূরতি তোমার
আনে মম দৃষ্টিহীন নয়ন সম্মুখে ;
লভিয়া তামসীনিশা রূপ আভা তার
হয় বিভাসিত—যথা উজ্জ্বল মাণিকে।
এইরূপে দেহ মন সারা নিশা দিন
তোমা কিম্বা আমা তরে বিরাম-বিহীন।

শ্রীবিহারীলাল গুহ।

প্রত্যাগত।

(১)

আর কি লইবি কোলে ? মম অশ্রুধার
দিবি কি মুছিয়া ? শ্রান্ত, শোকদিগ্ধজনে,
অসহায় শিশুসম ধরিয়া আবার,
পিয়াবি কি স্তনসুধা ? শৈশব শয়নে
শোয়াইয়া, সাবধানে সেইরূপে, হায়,
হে বসুধে ! আর কি মা ভুলিবি আমায় ?

(২)

হায় মা! ছাড়িয়া তোরে প্রবেশিনু যবে
সংসারের রঙ্গমাঝে,—তখনও আকাশে
হাসে উষা, কালসিন্ধু ধাইছে নীরবে,—
হেরিনু মোহিনী মূর্ত্তি, বিভ্রম-বিলাসে
মায়াবিনী, বংশীরবে ব্যাধের মতন,
সরল পথিক-হৃদি করিল হরণ।

(৩)

যায় বর্ষ, যায় দিন। একদা সমুখে
হেরিলাম সরোবর, কামনা-কহ্লারে
শোভাময়; নিত্য তাহে বিচরিছে সুখে
সোণার তরণী এক। হৃদয় আঁধারে
প্রেমদীপ, কভু মৃদু, কভু বিস্ফুরিয়া,
বাসনার স্নেহসেকে উঠিছে শ্বসিয়া।

(৪)

কে জানে মা! কোথা হ'তে আইল ভাসিয়া
ফুলবাস; গীতরব পশিল শ্রবণে
নন্দনের বীণাধ্বনি সম; বিকীরিয়া
কররাশি শত শশী শোভিল নয়নে!
সুন্দর সংসার-গৃহ, শিশু নারী নর,—
সুন্দর দেখিনু আমি বিশ্ব চরাচর।

(৫)

আনন্দে কহিনু,—লও মোরে, হে তরণি,
সৌন্দর্য্যের কেন্দ্রপথ পানে, হই আমি
ব্যাপ্ত, পূত, বিকশিত; ত্যজিয়া অবনী,
দ্যুলোক হইতে পুন নাগলোকে নামি,
উদার আকাশ সম আলিঙ্গন দিয়া
চাহি আমি বিশ্বরাজ্যে রাখিতে বাঁধিয়া।

(৬)

গেল সুখে-দুখে কাল। অবশেষে, হায়,
অতর্কিতে এক দিন যৌবন-আকাশে
ঘনাইল কালমেঘ, মৃত্যুদূতী প্রায়
আইল ঝটিকা গরজিয়া; ক্রোধে ত্রাসে
নিনাদিল জলরাশি, কাঁপিল অবনি;—
হায় মা! হারানু আমি সাধের তরণী।

(৭)

তাই আজি, জননী গো, তোরই স্নেহাগারে
বিশ্রাম মাগিছে দাস। যে শয্যা ফেলিয়া
ধ'রেছিনু বসুন্ধরে, সদ্যোজাত তা'রে
অসহায়, তা'ই পুন ল'তে সে খুঁজিয়া;—
মাতৃবাহু উপাধান, অঞ্চল শয়ন,
মানব শিশুর আর কি আছে এমন?

(৮)

লতার আশ্রয় ছাড়ি' কুসুম কাননে
পড়ে আসি কোলে তোর; শ্রান্ত যবে পাখী
ধায় তোরই স্নেহনীড় পানে;—প্রেমরণে
পরাজিত তেমতি মা! অশ্রুভরা আঁখি,
হৃতসুখ, নষ্টগৃহ, [illegible],
প্রকৃতি, জননি, আমি এসেছি ফিরিয়া।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

বাঞ্ছিত প্রণয়।

তোমারে কহিব প্রাণ আশা,
যবে মোর ফুটাইবে ভাষা!
তোমারেই দিব সঁপে প্রাণ,
যবে মোরে করিবে আহ্বান।
তোমারেই দিব ভালবাসা,
আগে মোর মিটাইও আশা।
তবরূপ হৃদে ভরে রাখি,
যদি মোর খুলে দেও আঁখি।
তব তরে হইব আকুল,
আগে মোর ভেঙ্গে দিও ভুল।
তোমারি গাহিব গুণ গান,
শিখাইও সুর তাল মান।
তোমারি আবাসে যাব চ'লে,
যদি মোরে পথ দেও ব'লে।

তুমি মোর হৃদয়ের সখা,
ভালবেসে আগে দেও দেখা।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

কৃষ্ণবিরহিণী রাধিকা।

নির্ম্মল যমুনাতট, বারি রেখা লট পট,
তটদের চরণে।
কি শোভা মরিয়ে মরি, গিয়েছে যমুনা ভরি,
শশী তারা রতনে।
নদীর বাতাস পেয়ে, আছে যেন ঘুমাইয়ে,
নদী তটে চাঁদিনী,
পরিধানে শ্বেত বাস, অধরে মধুর হাস,
সুখে ভোর যামিনী।
অপূর্ব্ব গম্ভীর ভাবে, ভাবিতেছে একভাবে,
কোন জনে যমুনা,
হেরি সে অপূর্ব্বভাব, হয় কত আবির্ভাব,
ভাবুকের ভাবনা।
এলাইত কেশ রাশি, অধরে মলিন হাসি,
কে তুমিগো ললনা?
বসিয়া যমুনাকূলে, ভাসিছ নয়ন জলে,
কি এতগো যাতনা?
আকুল ব্যাকুল প্রাণ, গাইছ মধুর গান,
মরমেতে মরিয়া,
পিয়ে সে সঙ্গীত সুধা, চাঁদের মিটিল ক্ষুধা,
লাজে নত পাপিয়া!
পবিত্রতা সরলতা, একত্র রয়েছে গাঁথা,
হৃদিতলে তোমারি,
বদনে রয়েছে ঢালা, সঞ্চিত প্রীতির ডালা,
অমৃতের মাধুরী!
দুলিছে সমীর ভরে, হৃদি পরে ধীরে ধীরে,
কমলের মালিকা।
কমলের প্রতিদামে, রঞ্জিত কৃষ্ণের নামে,
প্রেমাধিনী গোপিকা—
রাধিকা দেখি সে লেখা, নিভাতে বিরহ শিখা,
চাহিতেছে যতনে,
কমল নয়ন বহি, পড়িতেছে রহি রহি,
প্রেমনীর সঘনে।

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস।

আঁধার-মাণিক।

১

আমার এ অন্ধকার ঘরে,
আঁধার সাজানো স্তরে স্তরে,
আঁধারের কর ধ'রে, অন্ধকার নৃত্য করে;
আমার এখানে মাত্র আঁধারের মেলা,
ঘোর অন্ধকার ল'য়ে আঁধারের খেলা।

২

আমার এ অন্ধকার ঘরে,
প্রেতও পলা'য়ে যায় ডরে,
প্রাবৃটের অমানিশা এ'রকাছে হারা দিশা,
আঁধারে জড়ায়ে ধরি আঁধার মহান্,
অট্টহাস কোলাহল বিদরিছে কাণ!

৩

আমার আঁধার পারাবারে,
অন্ধকার আঁধারে সাঁতারে,
এ আঁধার কালিমায় দীপ্ত সূর্য্য ডুবে যায়,
না ফুটে হেথায় চন্দ্র নক্ষত্র কিরণ,
ফুটেনা হেথায় রবি ঊষার মিলন।

৪

আমার এ আঁধার আলয়,
ভয়েতে মলয় নাহি ব'য়,
গোলাপ মালতী ডরে হাসেনা আঁধার ঘরে,
ভয়ে ভয়ে শ্যামা, পিক নাহি করে গান,
উঃ! কি ভয়ানক এই আঁধার মহান্।

৫

আমার এ আঁধারের কাছে,
লীলা তরঙ্গিনী নাহি নাচে,

নেচে নেচে বেলা পরে ঢেউ না বিথারি পড়ে,
বিকশিত কুমুদ কহলার শতদল
মলিন হেথায়, নাহি করে ঝলমল।

৬

হেরে মোর অন্ধকার ঘর,
অবহেলে বিশ্ব চরাচর,
সদা অন্ধকারে চাই, আলোক কভু না পাই,
সুহাসিনী প্রকৃতিও নাহি হাসে ভয়ে,
উঁকি দিয়া চলে যায় ছ'ঋতুকে ল'য়ে!

৭

এ আমার আঁধার ভবনে,
একা আমি ব'সে এক কোণে,
সদা শুনি কোলাহল, বিশ্ব করে টল মল
শত বজ্রনাদে স্বার্থ বাসনাকে ডাকে,
বাসনাও প্রলোভনে সঙ্গে সঙ্গে রাখে।

৮

আশা সদা দীর্ঘ অবয়বে,
ভ্রমিতেছে ঘোর বজ্র রবে,
তাহার ভ্রুকুটি ডরে, বিশ্বস্থিত যোড়করে,
তার(ই) পাশে হতাশার বিকট মূরতি,
ললাট ফলকে রক্তে লেখা "অবনতি।"

৯

গর্ব্ব এই আঁধার ভবনে,
ডাকে হিংসা, ঈর্ষা, দ্বেষগণে,
দন্তে দন্ত ঘরষিয়া, ক্রোধ ভ্রমে গরজিয়া
চূর্ণ করিবারে বিশ্ব চরণের ঘায়,
নেত্রকোণে সর্ব্বগ্রাসী অনল বেড়ায়।

১০

অন্ধমোহ আঁধারে ঘুরিছে,
হাতাড়িয়া "আমিত্ব" খুঁজিছে,
এই আঁধারের তলে, এই ঘোর কোলাহলে,
আকুল ব্যাকুল প্রাণ করে হায়,হায়!
কোথায় লু'কাব আমি লইয়া আমায়?

১১

"শ্মশান কি শান্তিময় স্থান,
তথা গেলে জুড়ায় কি প্রাণ?
উজল আলোক রেখা,তথা কি যায় না দেখা?
কোলাহলনাশী নিস্তব্ধতা না কি র'য়?
তথায় আমাকে আমি লুকালে না হয়?

১২

"না হয় তথায় প্রেতগণ,
অট্টহাসে বিদরে গগন,
করিয়া বিকট রব, শাখিনী পেতিনী সব,
না হয় গলিত শব করয়ে ভক্ষণ,
কড়মড়ি করে নরকঙ্কাল চর্ব্বণ।

১৩

"তবুও তথায় সুখে র'ব,
এ ভীষণ জ্বালা ত না স'ব,
আঁধার ঘরের কোণে, সদা ইহা ভাবি মনে,
সহসা দেখিনু সেই আঁধার আলয়,
আঁধারবিনাশী এক আলো জ্যোতির্ম্ময়।

১৪

ভাবিলাম "এ আলোক রাশি,
বিভাসিল কোথা হ'তে আসি,
এ মোর আঁধার ঘরে,কেহ ত আসেনা ডরে,
কোথা হ'তে এ আলোক ফুটিয়া উঠিল?
অন্ধকার, কোলাহল সব পলাইল!"

১৫

"এ তরল আলোকের ছা'য়,
পরাণ আনন্দ গীতি গায়,
দাহ শূন্য দীপ্ত আলো,নাশি এ আঁধার কালো,
ফুটিয়া উঠিল, স্নিগ্ধ ধাঁধেনা নয়ন,
একি অন্ধকারে খোঁজা মাণিক রতন?"

১৬

কে যেন বলিল কাণে মোর,
"আঁধার মাণিক-আলো চোর"
করি কর প্রসারণ, ধরিবারে সে রতন,

যেমন ছুটিনু, পুনঃ কি দেখিনু হায়!
মিলিল অমৃত জ্যোতি মহাশূন্য গায়।

১৭

জগৎ-জনক হরে হায়!
বিড়ম্বন কেন গো আমায়?
আঁধারমাণিক মোর, ঘুচাবে আঁধার ঘোর
আমার এ আত্মা তুমি লও উপহার,
করুক এ বিশ্ব যাহা ইচ্ছা হয় তার।

১৮

এ সংসারে কিছু নাহি চাই,
যেন আমি তোমাকেই পাই,
তুমিই কোটী রতন, তুমি সাধনার ধন,
তোমা বিনা ধন, মান জীবনেতে ধিক্!
বসো এ আধার গেহে আঁধার মাণিক!

শ্রীকুমুদিনী দাসী।

বাহ্য পূজা এবং ব্রহ্মসাধন।

সাকার নিরাকারের মীমাংসা সাধারণ ভাবে কত দিনে হইবে, কেহ বলিতে পারে না, কিন্তু উন্নত সাধকজীবনে ইহার সীমা নির্দ্ধারিত এবং অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য অবশ্যই আছে। নিম্নাধিকারী অজ্ঞান লোকদিগের জন্যই পুরাতন জ্ঞানীরা মূর্ত্তিপূজা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি, মূর্ত্তিপূজা, গুরুব্রহ্মের পূজা করিয়াও লোকে পণ্ডিত শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে চাহেন। লোকশিক্ষার্থ তাঁহারা কি ইহা করেন? নিজেদের জন্য কি নয়? মূর্ত্তির রাজ্য অতিক্রম করিয়া অমূর্ত্ত চিদানন্দের রাজ্যে প্রবেশের জন্য সাধকদিগের সাধন হবে কত দিনে আরম্ভ হইবে? জনপ্রশংসিত সাধারণ প্রচলিত ধর্ম্মকার্য্যের ভিতর গোলমাল করিয়া দিন কয়টা কাটাইয়া দেওয়াই কি অনেকের উদ্দেশ্য নয়? ধর্ম্মসাধনের যে শ্রেণী-বিভাগ, অধিকারী-ভেদ কল্পিত হইয়াছিল, তাহার সার্থকতা কোথায়? জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেই এক কথা বলেন, এক রূপই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করেন; কোন তত্ত্ব ব্যাখ্যার সময় কেবল পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়, উভয়ের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ দেখিতে পাই। যখন প্রাচীন কাল হইতে সকল দেশে ব্রহ্মজ্ঞান এবং বাহ্য পূজার দুইটী বিভিন্ন মত এবং কার্য্য-প্রণালী চলিয়া আসিতেছে, শাস্ত্রেও তৎসংক্রান্ত ভূরি ভূরি নিদর্শন রহিয়াছে, তখন কার্য্যতঃ বর্ত্তমানে দুইয়ের সীমা নির্দ্ধারণ একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু সীমা নির্দ্ধারণ কোথায় কিরূপে হইবে? জ্ঞানী বহুদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে মূর্ত্তিপূজা করিলেন না বটে, কিন্তু দেবালয়ে দেবমূর্ত্তি কিম্বা অবতারের নিকট প্রণিপাত করিলেন, ভক্তিপূর্ব্বক প্রসাদ খাইলেন, গলায় মালা, নাকে তিলক পরিলেন, আর পৌরাণিক দেবলীলার যাবতীয় কল্পিত কাহিনী গুলি সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন, তৎসঙ্গে বলিলেন, "আমি সর্ব্বভূতে যে অনন্ত চিন্ময় ভগবান আছেন, তাঁহাকেই প্রণাম করিলাম, সর্ব্বত্র তাঁহাকেই বিরাজমান দেখিয়া থাকি।" এ কথাতে আর কাহার আপত্তি হইবে? অজ্ঞানী জনসাধারণও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল, কিন্তু তাহারা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে জানে না; অথচ

বাহিরের ব্যবহার উভয়েরই একই। কোথায় এখন তবে উভয়ের ব্যবহারের সীমা নির্দ্ধারণ করিবে? জ্ঞানী যদি সর্ব্বভূতে ব্রহ্মের আবির্ভাব বাস্তবিক দেখিতে পান, কেনই বা তিনি পূজার্থ প্রতিষ্ঠিত সুন্দর সুসজ্জিত দেবপ্রতিমায় সে আবির্ভাব দেখিবেন না? যদি দেখেন, কেনই বা তবে তিনি সেখানে ভূমিষ্ঠ হইবেন না? এস্থলে কত টুকু তাঁহার লোক শিক্ষার্থ প্রচলিত পন্থার অনুসরণ, বা লোকরঞ্জন, বা গূঢ় স্বার্থ সাধন, আর কত টুকুই বা সর্ব্বভূতময় হরির আবির্ভাব দর্শন, তাহা কেবল অন্তর্যামী ভগবান্‌ই জানেন। শাস্ত্র যুক্তি জ্ঞান বিজ্ঞান দুই পক্ষেই যথেষ্ট আছে। এই বাহ্য পূজানুষ্ঠানের সঙ্গে সামাজিকতা, লৌকিক ভদ্রতার বিলক্ষণ যোগ দেখিতে পাই। ভিতরে বিশ্বাস কর না কর, আত্মীয় প্রিয়জন বন্ধু, বা গুরুজনের অনুরোধে, অন্নদাতার ভয়ে অনেক কার্য্যে যোগ দিতে হয়। এ সম্বন্ধে বিবেক এবং সবল বিশ্বাসকে অকলঙ্কিত রাখিবার উপায় কি? আজ কাল যে রূপ উদারতার প্রাদুর্ভাব, তাহাতে বিশ্বাস সম্বন্ধে আপনার নিকট আপনি ঠিক থাকা যায় কি প্রকারে?

মনুষ্য জড় চৈতন্যে মিশ্রিত, তাহার প্রত্যেক কার্য্য বাহ্য অবলম্বনের ভিতর দিয়া হইয়া থাকে। তিনি ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি বাহ্য পদার্থের পূজা করেন না সত্য, কিন্তু তাহার সাহায্য লইয়া থাকেন। নির্বিশেষ অনন্ত ব্রহ্মকে স্থান কাল ব্যক্তি সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া গ্রহণ করেন, তদ্ভিন্ন ভক্তি যোগ বিশ্বাস প্রেম ঘন হয় না। এই ঘনত্বের অনুরোধেই মূর্ত্তিপূজকেরা বিশেষ বিশেষ স্থান-কাল এবং ব্যক্তি বা পদার্থে একবারে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। এত দূর তাঁহারা ঘন করেন, যে পরিশেষে তাহা আর আত্ম হয় না; ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে বাহ্য ভাবোচ্ছ্বাসে চিরদিন আবদ্ধ থাকিয়া যায়। তাঁহাদের আপাতরম্য শ্রবণমনোহর যুক্তি এ বিষয়ে বড়ই হৃদয়গ্রাহী। ভক্ত ব্রহ্মজ্ঞানীর সঙ্গে সে যুক্তির কোন প্রভেদ দেখা যায় না; কিন্তু উদ্দেশ্য উভয়ের এক নয়। এক জন উপায়কে উদ্দেশ্য করিয়া লইয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, আর এক জন বাহ্যোপায়ের সাহায্যে অন্তর্জগতে প্রবেশ করেন; এবং প্রবেশ করিয়া নিরবলম্ব যোগে মগ্ন হন।

সকল স্থানে, সব বস্তু এবং ব্যক্তিতে, কিম্বা সকল কালে ধর্ম্মসাধন ঘনীভূত হয় না; তাহার জন্য বিশেষ সময়, বিশেষ স্থান এবং বিশেষ ব্যক্তি বা পদার্থের প্রয়োজন হয়। হট্টমন্দির অপেক্ষা দেবমন্দির, জনাকীর্ণ পথ অপেক্ষা গিরিশিখর, সুরম্য বন, উপবন, নদীতট সাধনের অনুকূল। জনসাধারণ বিষয়ী সংসারী লোক অপেক্ষা সাধুসঙ্গের আবশ্যকতাই বা কে অস্বীকার করিতে পারে? সচ্চরিত্র আত্মত্যাগী ভক্তজনের সেবা এবং অধীনতাও সাধনের একটী প্রধান অবলম্বন বটে। পূজার্থ গৃহীত বিশেষ বিশেষ পদার্থ ছবি মূর্ত্তি, সাধুর সমাধি স্তম্ভ, শ্রদ্ধা প্রীতি-উদ্দীপক মনোহর দেবমন্দির, তীর্থ স্থান পুষ্প চন্দন ধূপ ধুনার গন্ধ, তপোবনাশ্রম, এসকল কাহার মনে না ভগবদ্ভক্তি আনিয়া দেয়? কিন্তু এ সমস্ত বাহ্যাবলম্বনপ্রসূত ধর্ম্মভাব কি স্থান কাল অবস্থা ঘটিত ব্যবহিত ভাব নহে? তুমি চর্ম্মচক্ষে প্রতিমার চেতনাবিহীন নাক মুখ চোখ কপাল রাঙ্গাচরণ দেখিলে, নাসিকায় পুষ্প ও ধুনার সুগন্ধ আঘ্রাণ করিলে, কর্ণে শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ মন্দিরার শব্দ এবং স্তব স্তুতি শুনিলে, রসনায় গভীর অর্থ-যুক্ত কবিত্বসম্পূর্ণ মন্ত্রাদি পাঠ করিলে, এ

সমস্তই উপাস্য উপাসকের বাহ্য সম্মিলন সাধক; তদ্দ্বারা কি জীবাত্মা পরমাত্মার পরস্পর ভাব জ্ঞান ইচ্ছার একত্ব সম্পাদিত হয়? দেহধারী মনুষ্য সচেতন জীব, তাহার নিকট কথা কহিলে, কাঁদিলে, ভিক্ষা চাহিলে, সে শুনিতে পায়, বুঝিতে পারে, হৃদয়ঙ্গম করে, তৎপরে প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়। জড় প্রতিমার অবশ্য সে সব ক্ষমতা নাই, সকলেই জানেন। প্রতিমার মৃণ্ময় বধির কর্ণের ভিতর দিয়া অন্তর্যামী দেবতাকে কিছু জানাইতে হয় না, তাহাও জানা আছে, তাহাতে আরোপিত ভগবান আছেন, তিনিই প্রার্থনা শ্রবণ করত পূর্ণ করিয়া থাকেন। এই প্রার্থনা জ্ঞান ইচ্ছা ভাবের বিনিময় ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়ের অতীত, বিশ্বাসগত আধ্যাত্মিক বিষয়; বাহেন্দ্রিয়ের সাহায্যে দৃশ্য স্পৃশ্য পদার্থ এখানে কেবল বাহ্য ভাবের উদ্দীপক মাত্র। অবশ্য এই উদ্দীপনা জীবাত্মা পরমাত্মার অব্যবহিত জীবন্ত জ্ঞানপ্রভা উপলব্ধির সহায় হইতে পারে। এই পর্য্যন্তই উহার উপকারিতা। কিন্তু উহা প্রকৃত জ্ঞানরাজ্যের বহির্ভাগে বহু ব্যবধানে অবস্থিত। যে পর্য্যন্ত আত্মার সহিত পরমাত্মার সাক্ষাৎ জ্ঞানযোগ ঘনতররূপে উপলব্ধি না হয়, ততদিন কেবল বাহিরের বিষয় বিশেষের উপর সাধক নির্ভর করেন, কিন্তু অধিক দিন তাহাতে আবদ্ধ থাকিলে আধ্যাত্মিক সাধন ভজনের আর উন্নতি হয় না, তখন অভ্যস্থ কতকগুলি বাহ্য বস্তু কার্য্যচক্রে মন ঘুরিয়া বেড়ায়, একই বিষয়ের চর্ব্বিত চর্ব্বণ হয়।

এখন কথা এই, ব্রহ্মজ্ঞ নিরাকারবাদীরাও ত পূজার সময় মন্ত্র পাঠ করেন, প্রার্থনা করেন, সঙ্গীতাদি শুনেন, কুসুম চন্দন ধূপ ধুনার গন্ধ বিস্তার করেন। তাঁহাদেরও স্থানে বহু উপাসনামন্দির আছে, কালেবহু উৎসব উপাসনা আছে, তাঁহারবহু চরণকমল, প্রেমমুখ, স্নেহহস্ত, পিতা মাতা বন্ধু সখা ইত্যাদি শব্দও তাঁহারা ব্যবহার করেন; নমস্কার কৃতাঞ্জলি ইত্যাদি নানাবিধ অঙ্গভঙ্গীও আছে, সাধু ভক্ত ঋষি যোগীদিগকে তাঁহারা ভক্তি করেন, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রসাদের ভিখারী হন; তবে কি কেবল প্রতিমা খানারই যত দোষ? যদি গেরুয়া বসন, ফুলের মালা, চন্দনের ফোটায় দোষ না থাকে, তবে কি নামাবলী তুলসীমালা তিলক ছাবেরই যত দোষ? জগন্নাথকে পরমান্ন উৎসর্গ করিয়া তার পর দুধের সঙ্গে ভাত এবং চিনি মিশাইয়া খাও, তবে কি জগন্নাথকে কেবল গুড় গাছটী দিয়া আসিয়াছ? মানবীয় ভাব উভয়েতেই আছে, আমরা সেটাকে না হয় ভোগ নৈবেদ্য শীতলী বৈকালী বলি, উপহার আরতি বরণ ইত্যাদিতে আরো উজ্জলরূপে মানবীয় করিয়াছি; এই কি অপরাধ? দেবদেবীরপূজকেরা এ কথা অবশ্য বলিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে তর্ক বিবাদের প্রয়োজন নাই। এ সকলের মধ্যে কোন্ কোন্টী ব্রহ্মবাদীর অপৌত্তলিক এবং আধ্যাত্মিক যোগ সাধনের অনুকূল অনুষ্ঠান, তাহাই নির্ব্বাচন করিতে হইবে। সমস্তগুলি ত্যাগ করিয়া জড়বৎ মৌনী হওয়া সহজ, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীর ভক্তি সাধনের প্রণালী ঠিক করা বড় কঠিন। প্রতি জনের বিবেকের নিকট ইহার মীমাংসা আছে, তাহাদের সকলের দ্বারা সমবেত বিবেকানুযায়ী একটী সাধারণ বিধি নির্দ্ধারণ প্রার্থনীয়।

ব্রহ্মজ্ঞানীর মধ্যেও এক শ্রেণীর বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয় ভক্ত সাধক আছেন, যাঁহারা অন্তরের প্রত্যেক ভক্তিভাব বাহিরে প্রদর্শন করিতে ভালবাসেন; অর্থাৎ তাঁহাদের ভক্তি প্রকা-

শের আধিক্য বেশী। আর এক শ্রেণীর গম্ভীর স্বভাব চিন্তাশীল ব্যক্তি ঠিক ইহার বিপরীত। ইহারা এক দল বাহ্যপূজা, অন্ধ ভক্তি এবং পৌত্তলিকতার প্রশ্রয়দাতা, অপর পক্ষ শুষ্ক বৌদ্ধ ভাববিশিষ্ট ভক্তিবিরোধী। উভয়ের পরিণাম পৌত্তলিকতা এবং নাস্তিকতা। ইহার মধ্যে একটী মধ্যপথ আছে। তাঁহারা অন্যকে তর্ক দ্বারা বুঝাইতে পারুন না পারুন, নিজের জ্ঞান ভক্তির সামঞ্জস্য করিতে পারেন। তাঁহারা বলেন, বাহ্যাবলম্বনের দিকে অধিক যাইও না, তাহাতে অন্তঃসার বিহীন হইয়া পড়িবে। "কোথায় কি করিব, কারে কি বলিব, দিও বলে সব যে হয় উচিত।" এই বাক্য দ্বারা তাঁহারা ভগবানকে সম্বোধন করেন। ভক্তিভাবের মত্ততা, বাহ্য পূজার আকর্ষণ জন সাধারণের বড় প্রিয়, ইহা বাস্তবিক একটা লোভের বিষয়; শুষ্ক হৃদয় যুক্তিবাদী ব্রাহ্মজ্ঞানীর প্রাণ যখন শুষ্ক নিগুর্ণবাদে এবং অসার সামাজিকতায় পড়িয়া ছটফট করে, তখন অন্ধব্যক্তির বাহ্যাড়ম্বর, গুরুবাদ এবং মত্ততা অতিশয় হৃদ্যপথ্য হইয়া উঠে। তখন সে জ্ঞানকে নিন্দা করিয়া বলে, "তুমি কে কেবল বস্তু, তুমি সে কেবল।" জ্ঞান চেতনাহীন ব্যক্তি অন্ধ, তাহার অন্ধ ভাবুকতা সুরা মত্ততার ন্যায় অসার। ভগবান পরম চৈতন্য দিব্য জ্ঞানময়, এবং তিনি প্রেমে যেন আনন্দ স্বরূপ। তাঁহার স্বরূপতঃ প্রাপ্তি জীবের চরম ধর্ম্ম। স্বয়ং তিনিই সাকার নিরাকারের মীমাংসার স্থল।

শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

স্পর্শদোষ প্রথার রাক্ষসী মূর্ত্তি।

স্পর্শদোষ প্রথা কি প্রকার রাক্ষসী মূর্ত্তিতে হিন্দুজাতীর জীবনের রক্ত শোষণ করিতেছে, অনেকে হয় ত তাহা ভাবেনই না। যাঁহারা বৃহৎ নগর নগরীতে বাস করেন, তাঁহারা এপ্রথার অনিষ্ট যথেষ্ট উপলব্ধি করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। বহুসংখ্যক শান্তিরক্ষক দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া, দিবারাত্রি স্বার্থসেবায় রত থাকিয়া নাগরিকেরা নিকটস্থ প্রতিবেশীকেও চিনেন না। পরস্পর নির্ভর ভিন্ন জীবন যে দুঃসহ হইয়া উঠে, তাহা নাগরিক অপেক্ষা গ্রামিকেরা সমধিক উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এমন স্থান দেখা গিয়াছে যে, পাঁচকাঠা পরিমিত স্থানে পাঁচ প্রকার জাতি বাস করে; তাহার কেহ কাহাকে স্পর্শ করে না। একে অন্যের গৃহে প্রবেশ করেনা। বালকেরা একত্র হইয়া খেলা করিলেও, একে অন্যকে ঘৃণা করিতে শিখে। এই যে পরস্পর ঘৃণার বীজ, ইহা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইহা ঠিক হিন্দুশাস্ত্রের বিধিও নহে, অথচ ইহাতে সহস্র সহস্র লোকের উন্নতির পথ,—মানবত্ব লাভের পথ চিররুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আধুনিক প্রচারকগণের আবার বক্তৃতা এই যে, এরূপে অন্যের সর্ব্বনাশ করাই নিষ্কাম ধর্ম্ম। কেননা, বর্ণভেদরক্ষা করা নিষ্কাম ধর্ম্মের অন্তর্গত। এই নিষ্কাম ধর্ম্মে নগরগুলির ক্ষতি হউক, আর না-ই হউক, গ্রামগুলিকে কলহময় করিয়া হিন্দুজাতি সাধারণের মহানিষ্ট করিবে সন্দেহ নাই।

আমাদের বসুদাস ও দাসগুপ্ত বা রায়গুপ্ত মহাশয়গণেরও অনেকে এই ধর্ম্মের প্রচারক। ইহাদের বিশ্বাস, ইহারা আর্য্য কুলধুরন্ধর; নিম্নশ্রেণী হিন্দু বা পৌরাণিক হিন্দুর সহিত

সঙ্গল ব্যবহারে বড় হইলে ইহাদের আর্য্যত্ব প্রক্ষালিত হইয়া যাইবে। ইহারা সকলে দর্পণ ব্যবহার করেন কিনা, জানিনা; তাহা হইলে অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন, অনার্য্যের কৃষ্ণবর্ণত্ব তাঁহাদের বার আনা লোকের চেহারায় দেদীপ্যমান আছে। অনেক তর্কচূড়ামণি ও বেদান্তবাগীশ মহাশয়েরাও অনার্য্য সংস্রবে বড় রুষ্ট, তাঁহারাও একবার দর্পণ হাতে করিলে বুঝিতে পারেন, আজ যাহাদের জলসংস্রবে আসিলে জাতিচ্যুত হইতে হয়, তাহাদের রক্ত সংস্রবও তাঁহাদের শরীরে যথেষ্ট আছে। এই যদি প্রকৃত ঘটনা, তবে স্পর্শদোষ প্রথা সর্ব্বাগ্রে উঠাইয়া দেওয়া উচিত। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, স্পর্শ দোষ উঠাইয়া দিলে ত একাকার হয়। কিন্তু একাকার ও একতা একই কথা। ধর্ম্মও একতা মাত্র।

ধর্ম্মত্ব মেকত্ব মেব।

ইহাই সকল জাতির ধর্ম্মের মূল সূত্র। হিন্দুর ধর্ম্মেরও মূল সূত্র উহাই। তবে সম্প্রতি বিকৃত মস্তিষ্ক হিন্দুদিগের উহা বুঝিবার উপায় নাই।

স্পর্শদোষ-প্রথার অনিষ্টকারিতা অনুসন্ধান করিতে হইলে, ইহাকে সাত ভাগে বিভক্ত করিতে হয়।

(১) বৈদ্যুতিক স্পর্শ বা দর্শনদ্বারা স্পর্শদোষ। (২) ছায়াস্পর্শ দোষ। (৩) গাত্র স্পর্শ দোষ। (৪) জলস্পর্শ দোষ। (৫) খাদ্যস্পর্শ দোষ। (৬) দেবস্পর্শ দোষ। (৭) পরমাত্মা স্পর্শ দোষ।

সমস্ত হিন্দু সমাজ ইহার কোন না কোন স্পর্শ-দোষ দ্বারা দূষিত। ঘোষবসু, দেবদত্ত, সেনগুপ্ত, বাড়ুইশুঁড়ী, চাঁইচামার হিন্দুর যে শাখাই ধর, দেখিবে স্পর্শদোষ দ্বারা সকলেই দূষিত। ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও প্রায় অর্দ্ধাংশ, যথা অগ্রদানী, গণক, বর্ণ ব্রাহ্মণ এই প্রথার একাধিক গুণানুসারে দূষিত।

(১) বৈদ্যুতিক স্পর্শ বা দর্শন দ্বারা স্পর্শ দোষ প্রথা কাহাকে বলিতেছি, গুণবতী খনার নিম্নবৃত বচন দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

আগে ধোবা পাছে নাই।
এমন কার্য্যে যেওনা ভাই॥
এও বাধা পায় ঠেলি।
যদি না দেখি সম্মুখে তেলী॥
খনার বচন।

সংবাদপত্র বা মাসিক পত্রের স্তম্ভে যাঁহারা আর্য্যত্বের দুন্দুভিধ্বনি তুলিয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন বোধহয় সর্ব্বসাধারণ হিন্দু খনার এ নির্দেশ প্রতিপালনে ত্রুটি করেন না। এই বচনে ধোবা ও নাপিত দর্শন, তেলী দর্শন দোষাবহ বলা হইয়াছে। ইহাকেই আমরা বৈদ্যুতিক স্পর্শদোষ বলিতেছি। হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য টাক-টিকির উপর বিদ্যুতের যে ক্ষমতা, তাহাতে আমরা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া ইহার হাত ছাড়াইব কি প্রকারে? তুমি যাত্রা করিয়া যাই ধোবা, নাপিত বা তেলী দেখিলে, অমনি বৈদ্যুতিক স্পর্শে তোমার সর্ব্বনাশ হইল!!! তোমার যাত্রা ভঙ্গ হইল! তোমার অমঙ্গল ঘটিল ইত্যাদি। ইহা যে দেশে শাস্ত্রের আসন গ্রহণ করিয়াছে, সে দেশে যে একেবারে দগ্ধ হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য!

কেবল যাত্রাকালে এতাদৃশ বৈদ্যুতিক স্পর্শে সর্ব্বনাশ ঘটে, এমত নহে। হবিষ্যান্ন রন্ধন ও অশন সময়ে এই বৈদ্যুতিক স্পর্শে ভয়ানক ফল উৎপন্ন করে। ব্রাহ্মণের উপবীত গ্রহণের সময় অন্য বর্ণ তাহাকে দর্শন করিলে, এই বৈদ্যুতিক স্পর্শে ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ হয়, তাহা বোধহয় অনেক বসুদাস ও দত্তরায় মহাশয়েরা অনুভব করিয়া থাকিবেন।

যাঁহাদের বিশ্বাস, ব্রাহ্মণেরা অতিশয় নিষ্কামতার সহিত এসকল সামাজিকপ্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং ইহার মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষের কোন কারণ নাই, তাঁহাদের অবগতির জন্য আমরা একটি প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

মালদহ ও বীরভূম জেলায় কয়েক ঘর অতি সম্ভ্রান্ত কলুবংশীয় বড় মানুষ আছেন। ইহাদের বেতন-ভোগী অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ কর্ম্মচারী আছে। ইঁহাদের জনৈক কলুপ্রধান একদা এক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর বাড়ীতে আহূত হইয়া ছিলেন। কেবল ভোজনের জন্য আহূত এমত নহে, অধীনস্থ ব্রাহ্মণের কার্য্যের তত্ত্বাবধায়কতার জন্যও আহূত হইয়াছিলেন।

যখন সভাস্থ, তখন কলুমহাশয় স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার নম্রতা ভব্যতার কিছুই ত্রুটি ছিলনা। তবে তাঁহাকে কর্ম্মকর্ত্তা সেই তারিখের ব্যাপারের নিয়ন্তা করিয়াছিলেন এবং তিনিও তদনুরূপ যত্নচেষ্টা করিতেছিলেন। জনৈক সভাস্থ ব্রাহ্মণের ইহাতে ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হইল। তিনি কলুবাবুকে একাধিক বার জিজ্ঞাসা করিলেন;

"মহাশয়। একখান ঘানিতে একদিনে কত তৈল হইতে পারে?"

কলুবাবু তথাচ নির্বাক্। পুনর্ব্বারও নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল;

"জিজ্ঞাসা করিতেছি, একখান ঘানিতে একদিনে কত তৈল হইতে পারে?"

কলুবাবুর তখন আর ধৈর্য্য থাকিল না; ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—

"তোমার মত হৃষ্ট পুষ্ট গরু হইলে এক দিনেই পনর সের তৈল উৎপন্ন করিয়া লইতে পারি।"

আমাদের পাঠকবর্গের এই বিবাদের পরিশিষ্ট জানিয়া আবশ্যক নাই। যাহা জানা গেল, তদ্দ্বারা বোধ হয় উপলব্ধি হইবে যে, বর্ণ ভেদ ও স্পর্শ-দোষ-প্রথার মধ্যে বড় বেশী পরিমাণে নিষ্কামতা নাই। ইহাতে এক শ্রেণীর স্বার্থপরতা ও অন্য শ্রেণীর অপমান ভিন্ন আর কিছুই নাই।

কেবল যে ধোবা নাপিত কলু এই বৈদ্যুতিক বা দর্শন দ্বারা স্পর্শ-দোষের অন্তর্গত, তাহা নহে। যে সকল কায়স্থ বৈদ্য শুঁড়ী আজ কাল আর্য্যত্বের উন্মাদে উপবীত পর্য্যন্ত ধারণ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতিও এই বৈদ্যুতিক স্পর্শের কটাক্ষ সময় সময় সঞ্চালিত হয়। তবে নাকি তাঁহাদের চামড়া অত্যন্ত পুরু, উক্ত কটাক্ষ চামড়া ভেদ করিতে পারে কি না, জানি না। যজ্ঞহীন ধর্ম্মোপবীত পরিহিত বাবুরা ব্রাহ্মণগণের উপবীত গ্রহণের সময় নিকটে থাকিতে পারেন কি?

২। ছায়া-স্পর্শ-দোষের কথাই বা কে না জানে? অদ্যাপি আমাদের ঘরের গৃহিণীরা চাঁড়ালের ছায়া মাড়ালে স্নান করিয়া থাকেন। সকল সময় করুন আর নাই করুন, জলপূর্ণ কলসীকক্ষে চাঁড়ালের ছায়া স্পৃষ্ট হইলে কলসী দেবীর দেহত্যাগ ঘটে। কুলবালাদের এই সংস্কারের উল্লেখ প্রয়োজনীয়, কেন না সামাজিক ক্ষেত্র আমাদের বাচ্যবীরগণ অপেক্ষা পুরস্ত্রীগণ বেশী তেজস্বিনী। সুতরাং ছায়া-স্পর্শ-দোষ যে লুপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে। শুঁড়ীর পীড়িতে বসিতে নাই বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহাও বোধ হয় এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(৩) গাত্র স্পর্শদোষ। ইহা এক্ষণেও পুরাদমে চলিতেছে। হাড়ী, ডোম, ধোবা, চর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কোনাই, ভোল্লা, আগ্দাল, গাড়াল, দোসাদ, ধানুক, ধাঙ্গড় প্রভৃতি অনেক নিম্ন হিন্দুকে এই যন্ত্রণা ভোগ করিতে

হইতেছে। পূর্ব্ব বাঙ্গলার চণ্ডাল বা নব শূদ্রগণ ও ইহার হাত হইতে নিস্তার পায় নাই। তবে কয়েক বৎসর হইল তথায় এ বিষয় একটুক আন্দোলন চলিতেছে। আমাদের পাঠকবর্গ তাহার রসাস্বাদন করিবেন কি?

আমাদের জনৈক সবরেজিষ্ট্রার বন্ধু এ বিষয় আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি এ স্থলে তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

উক্ত সব-রেজিষ্ট্রার বাবুর বাড়ী ফরিদপুর জেলায়। তাঁহার অনেক ঘর নবশূদ্র প্রজা ছিল। ইহাদের উপর তাঁহার দুর্গা প্রতিমা বিসর্জ্জনের ভার ছিল। দশমীর দিবসে এই সকল প্রজা নৌকা সজ্জিত করিয়া যথাসময়ে সবরেজিষ্ট্রারের বাড়ীতে আসিয়া, প্রতিমা লইয়া ঘাঁঘর নদীতে গিয়া বিসর্জ্জন করিয়া আসিত। এইরূপ ব্যবহার পুরুষানুক্রমিক ছিল। ৭।৮ বৎসর হইল, নবশূদ্রগণ দশমীর দিবসে সবরেজিষ্ট্রার বাবুকে আসিয়া বলিল—

"মহাশয়, এ বৎসর আমরা দশহরা করিতে পারিব না। আপনি অন্য নৌকা মনুষ্যের চেষ্টা করুন। আমরা যথাসময়ে আপনাকে জানাইলাম।"

সবরেজি। কেন? কেন পারিবে না। চিরকাল তোমাদের উপর এই কাজের ভার আছে। এ জন্য তোমরা আমার বাস্তুভিটায় বাস কর। কেন পারিবে না?

নবশূদ্রগণ। না মহাশয়! পারিব না। কেন পারিব না জিজ্ঞাসা করেন কেন?

অনেক তর্ক বিতর্কের পর নবশূদ্রেরা মনের কথা বলিয়া ফেলিল—"দশহরার দিবস একটি শুভ দিবস। ইহা বৎসরের যাত্রার দিবস। কিন্তু আপনার বাড়ীতে দশহরা করিতে আসিয়া শেষে ফল এই দাঁড়ায় যে, আপনার মাতাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতে গেলে, তিনি পদধূলিটুকু পর্য্যন্ত দিতে চাহেন না। কেন না, আমরা স্পর্শ করিলে, তাঁহার জাতি যাইবে। আমাদের সমাজের নব্য যুবকেরা ইহাতে বড় অবমানিত বোধ করে। তাহারা এবার দশহরা করিতে আসিবে না।"

বলা বাহুল্য, আমার সেই সবরেজিষ্ট্রার বন্ধু এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি দেখিলেন, বড় বিপদ। দুর্গা প্রতিমার আর বিসর্জ্জন হয় না। তাঁহার অনুচরেরা নবশূদ্রগণের আস্পর্দ্ধায় ক্রোধান্বিত হইয়া বলিল—

"বেটাদেরে মেরে কাজ করাইয়া লইব।"

বেটেরা কিন্তু উহাতে কর্ণপাত না করিয়া সগর্ব্বে চলিয়া গেল। ক্রমে বেলা শেষ হইতে লাগিল। দুর্গাদেবী চণ্ডীদালানে আসন গাড়িয়া বসিলেন।

অতঃপর সবরেজিষ্ট্রার বাবু বলিলেন, "উহাদিগকে ডাকিয়া আন।" তাহারা আসিল, কিন্তু কিছুতেই সম্মত হইল না। বরঞ্চ বলিল "যদি আমাদের দ্বারাই দশহরা করাইতে হয়, তবে ব্রাহ্মণ কন্যাগণকে ত স্পর্শ করাইতেই হইবে। অধিকন্তু ব্রাহ্মণেরা আমাদিগকে অন্ন ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিবেন। পূর্ব্বে এরূপ করা হইত না। অগত্যা সবরেজিষ্ট্রারের উভয় কথায়ই সম্মত হইতে হইল। কিন্তু তাঁহার মাতা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী কিছুতেই চণ্ডালকে পদপ্রদান করিবেন না। এই বৃদ্ধ বয়সে চণ্ডালে গাত্র স্পর্শ করিবে? কিছুতেই তাহা হইবে না। অবশেষে সবরেজিষ্ট্রার বলিলেন "মাতঃ, তোমার চণ্ডী প্রতিমাও থাকিল, তুমিও থাকিলে, আমি চলিলাম।" ব্রাহ্মণীর ধনুর্ভঙ্গপণ ভঙ্গ হইল।

নবশূদ্রগণের সকল কথায়ই রাজি হইলেন। দশহরা করিয়া আসিয়া তাহারা ব্রাহ্মণীর পদস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিল; ব্রাহ্মণ যুবকেরা তাহাদিগকে অন্ন ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা সবরেজিষ্ট্রার বাবুর নিজের উক্তি এবং তাঁহার নিজের পারিবারিক ঘটনা। যাঁহারা ভাবেন, স্পর্শ দোষ প্রথা নিম্ন শ্রেণীর অপমানের কারণ নহে, তাঁহাদের তার্কিকতার প্রশংসা করিলেও,অবস্থাজ্ঞানের প্রশংসা করিতে পারিনা।

ভরসা করি, আমাদের সকল প্রকার অস্পৃশ্য হিন্দুগণ ফরিদপুরের নবশূদ্রগণের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সমাজে যথোচিত সম্মান লাভের চেষ্টা করিবেন। আমাদেরও উচিত, যাহাতে উচ্চ ও নিম্ন হিন্দু এক হইয়া যাইতে পারি, তাহার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করি।

গাত্র স্পর্শ দোষ হইতে যে একটি সঙ্কটের উদয় হইতেছে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টকে উহা নিবারণ করিবার অনুরোধ করিতে হইবে, বোধ করিতেছি। হাড়ি, ডোম, চর্ম্মকার প্রভৃতি অনেক নিম্ন শ্রেণী হিন্দুর প্রাথমিক শিক্ষা হইতেছে না। গাত্র স্পর্শদোষ বশতঃ ইহাদের বালকেরা আদৌ স্কুলেই প্রবেশ করে না। যদি বা কেহ করে, সে এক বেঞ্চ বা আসনে বসিতে পায় না। এজন্য নিম্ন শিক্ষার এক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে।

(৪) জল স্পর্শ দোষ। ইহার সংহারিণী মূর্ত্তি অত্যন্ত ভয়ঙ্করী,কল—ইহাতে হিন্দু সমাজকে দ্বিধাকৃত করিয়াছে। সুবর্ণ বণিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নতম বর্ণ পর্য্যন্ত ইহার করালজিহ্বা প্রসারিত হইয়াছে। নিম্নবর্ণের কেহ জলস্পর্শ করিলে উচ্চতর বর্ণের জাতিচ্যুতি ঘটে। এ জন্য যে সকল ব্রাহ্মণ নিম্ন হিন্দুদিগের যাজনিক কার্য্য করে, তাহারা জাতিচ্যুত ও পতিত ব্রাহ্মণ হইয়া দাঁড়ায়। জগতের কোন দেশে নিম্নশ্রেণীর সহিত সংশ্রব একপ দোষাবহ বলিয়া জ্ঞান করা হয় নাই। ইহ ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কীর্ত্তি। এই প্রকার দুটি শাখা (১) রান্নাগৃহে প্রবেশ-দোষ প্রথা (২) হুক্কা খাওয়া দোষ প্রথা। যদিচ, ক্ষত্রি ছত্রী, কায়স্থ বৈশ্য নবশাখ বা তেরশাখ আচরণীয় হিন্দুর মধ্যে গণিত অর্থাৎ জল-স্পর্শ দোষ প্রথার অন্তর্গত নহে, তথাচ ইহারা এই প্রথার উপরোক্ত শাখাদ্বয়ের অন্তর্গত। আমাদের ঘোষ বসু, দেব দত্ত, সিংহ পালিত মহাশয়েরা হয় ত 'আর্য্যামির' মোহ নিদ্রায় অভিভূত আছেন। কিন্তু তাঁহারা কি কখন কোন গৃহস্থ ব্রাহ্মণের রান্না ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছেন? সারমেয় রান্না ঘরে প্রবেশ করিলে রন্ধন পাত্রের যে দশা হয়, এই সকল আর্য্যের ব্রাহ্মণ-রন্ধনগৃহে প্রবেশেও সেই ফল উৎপন্ন করে। হুক্কা খাওয়ার কথা ত বাজারেই রাষ্ট্র। হুকাদেবী এক্ষণ জনে জনের ওষ্ঠে বিরাজ করিয়া থাকেন। এই ঘৃণা ও অপমান ব্রাহ্মণ্যানুগত্যের মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। যাহারাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সেবাইত, তাহাদেরই অদৃষ্টে এই ঘৃণা ও অপমান।

(৫) খাদ্য স্পর্শদোষ আরও প্রসিদ্ধ। ব্যবহারিক হিন্দু ধর্ম্মের বার আনা এই খাদ্য স্পর্শ দোষ প্রথা। এক জন ব্রাহ্মণ পরম মূর্খ হউক, লুচি ভাজুক, চুরি ডাকাইতি করুক, তথাচ সে সমাজে ব্রাহ্মণ,কিন্তু সে যদি কায়স্থ বা বৈশ্য স্পৃষ্ট অন্ন খায়, তবে সে ধর্ম্মচ্যুত। প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন তাহার গতি নাই। এক জন কায়স্থ দেবতুল্য ঋষি হউন, সমুদায় বেদ পাঠ

করুন, সমুদায় হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হউন; তাঁহার যদি খাদ্য স্পর্শ দোষ ঘটিয়া থাকে, তবে তাঁহাকে হিন্দু বলিতে হইবে না। ফলে ব্যবহারিক হিন্দু ধর্ম্ম (Practical Hindu Religion) এই খাদ্য স্পর্শ দোষের মধ্যেই বিদ্যমান। ইহার যে পৃথক্ অস্তিত্ব আছে, তাহা অনুভব করা দুষ্কর। এই খাদ্য-স্পর্শ দোষ সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারক। কেন না, ইহাতে বর্ণভেদের উপর বর্ণভেদ উপস্থিত করিয়াছে। কৌলিন্য প্রথা ইহার কন্যা। কন্যাপণ পুত্রপণ ইহারই দৌহিত্র। আমি অমুক কায়স্থের অন্ন খাইব না, আমি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিব না। তবে দিব যদি সে আমাকে টাকা দেয়। যে কথা কায়স্থের পক্ষে, সে কথা ব্রাহ্মণের পক্ষে; সে কথা নবশাখের বা তের শাখের পক্ষে। এই প্রকারে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থ নবশাখ প্রভৃতি কেহ কাহার অন্ন খায়না, কেহ কাহাকে কন্যাদান করে না। কেবল এও নহে, দেশের ব্রাহ্মণ কায়স্থ নবশাখ আবার শ্রেণী বিভাগ করিয়া কেহ কাহার ভাত খায় না। রাঢ়ীয় শ্রেণী বারেন্দ্রের, বারেন্দ্র রাঢ়ীয়ের ভাত খায় না। বঙ্গজ কায়স্থ দক্ষিণ রাঢ়ীয়ের, আবার দক্ষিণ রাঢ়ীয় উত্তর রাঢ়ীয়ের অন্ন ছুঁইবেনা। ইহার পরেও ভেদ আছে। তাহার সবিশেষ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। যাহা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে, খাদ্য স্পর্শ দোষ প্রথা না উঠাইলে কন্যাপণ পুত্রপণ উঠাইবার প্রস্তাব বিড়ম্বনা মাত্র।

(৬) দেব-স্পর্শ দোষ। ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকল হিন্দুই এই প্রথার অন্তর্গত। ব্রাহ্মণেরও অর্দ্ধাংশ এই প্রথা দ্বারা দূষিত। জমিদার ব্রাহ্মণেরা দেব কার্য্যে বিরত। নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বা বর্ণব্রাহ্মণ উচ্চ শ্রেণীর দেবতা স্পর্শ করিলে, দেবতাও জাতিচ্যুতি ঘটে।

হিন্দুর ব্যবহারিক ধর্ম্ম জীবনে দৈবকার্য্য ও পিতৃকার্য্য প্রধান। দোলদোল দুর্গোৎসব ঠাকুর পূজা শিবপূজা; পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ, পার্ব্বণ, দশবিধ সংস্কার; যাহাই তাহার দৈব ও পৈত্রিক কার্য্য, তাহাই তাঁহার স্পর্শ করা দোষ!!! বৎসরান্তে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া, যথা সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া তুমি দুর্গোৎসব করিলে, কিন্তু দেবতাকে তোমার স্পর্শ করার অধিকার হইল না। যে সকল স্তববাক্যে তাঁহাকে পূজা করিতে হইল, তাহা তোমার উচ্চারণ করিবার অধিকার হইল না। আজ যেমন ইংরেজ বণিক্ তোমার অত্যাবশ্যক গৃহোপকরণ গ্রাসাচ্ছাদনের ভার লইয়াছে—কাপড় তাহারা দিতেছে, লবণ তাহারা দিতেছে; সেইরূপ ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তোমার যাহা আবশ্যক, তাহা সকলই ব্রাহ্মণের হাতে। হিন্দু! তুমি কি মানুষ? তুমি কি সামাজিক জীব? তোমার ত কিছুই নিজস্ব নাই!!! বিদেশীয় কর্ম্মবণিক্ ও দেশীয় ধর্ম্মবণিক্ তোমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে। ধর্ম্মে ও কর্ম্মে হিন্দু মনুষ্যত্ব শূন্য। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম সেবায় এই ফল হইয়াছে।

হিন্দুর পুনর্জ্জন্মবাদের অর্থ এই (অন্ততঃ ইহা লৌকিক বিশ্বাস) যে বহু জন্ম জন্মান্তরে পাপ ক্ষালিত হইলে হিন্দু ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির পর তাঁহার মুক্তির সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণেতর হিন্দুর আত্মা পরমাত্মাকে স্পর্শ করিবে কি প্রকারে? স্বর্গেও স্পর্শ দোষ আছে! গ্রহ নক্ষত্র গুলিও স্পর্শদোষে দূষিত। ব্রাহ্মণগ্রহ, শূদ্রগ্রহ আছে!!! দেখিলে স্পর্শ

দোষ প্রথার দৌড় কোথায়? দেখিলে ইহার রাক্ষসীমূর্ত্তি? এ রাক্ষসী আকাশ পাতাল মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে।

এই ব্রাহ্মণপ্রাধান্য পুনরুত্থিত না করিলে কি চলে না?

হা হিন্দুধর্ম্ম! হা জগদারাধ্য হিন্দুত্ব! তুমি কি কালক্রমে এমনই জঘন্য হইয়াছ যে, ইহ ও পরকালে তোমার সহিত ঈশ্বরের সংশ্রব হইবে না? হিন্দু! স্পর্শ দোষ প্রথাতে জঘন্যতা অনুভব করার শক্তি রহিত হইয়াছে বলিয়া তোমার এই নিদারুণ পতন হইয়াছে ও অবশাঙ্গতা জন্মিয়াছে। উত্তিষ্ঠ।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

ভগবদ্গীতা।

তৃতীয় অধ্যায়।

কর্ম্মযোগ।

"স্বধর্ম্মেন যমারাধ্য ভক্ত্যামুক্তিমিতা বুধাঃ।
তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মভিঃ॥"

অর্জ্জুন—

কর্ম্ম হতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ—যদি জনার্দ্দন
এই মত তব, তবে কেন হে কেশব
নিযুক্ত করিছ মোরে কর্ম্মে ভয়ঙ্কর। ১

(১) কর্ম্মহতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ—শঙ্করাচার্য্য বলেন, "প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধি এই দুইরূপ বুদ্ধি ভগবান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাংখ্যবুদ্ধি আশ্রয়ে কামনা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস কর্ত্তব্য বলিয়াছেন, এবং তাহাতেই শ্রেয় লাভ হয়—ব্রহ্মে স্থিতি হয়, ইহা দেখাইয়া দিয়াছেন। অন্যদিকে অর্জ্জুন কর্ম্মাধিকারী বলিয়া, কর্ত্তব্য বোধে আসক্তি ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে কর্ম্ম করিবার উপদেশ দিয়াছেন—অথচ বলেন নাই যে তাহাতে অর্জ্জুনের শ্রেয়লাভ হইবে। এই জন্য মোক্ষার্থী অর্জ্জুনের বুদ্ধি সন্দেহযুক্ত হইয়াছে।"

কোন কোন টীকাকার বলেন, গীতা কেবল আত্মজ্ঞান নিষ্পাদক, মোক্ষ শাস্ত্র নহে। ইহাতে সর্ব্বাশ্রমীর কর্ত্তব্য উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে দেখান হইয়াছে যে, জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই সামঞ্জস্য করিয়া সকল লোকেরই সাধনা করা কর্ত্তব্য। কেবল যাবজ্জীবন জ্ঞান সাধনা করিলেই মোক্ষ হয় না। সুতরাং শ্রুতি ও স্মৃতি-উক্ত কর্ম্ম একেবারে কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে নাই। অনেক যুক্তি ও তর্কের দ্বারা আজীবনসন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য সেই মত খণ্ডনকরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে সংসারী কেবল তাহারই প্রথম কৃচ্ছ্র সাধ্য কর্ম্ম যোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি করিতে হয়—সে একেবারে জ্ঞান সাধন করিতে পারে না। কিন্তু যে ঊর্দ্ধরেতা সন্ন্যাসী, তাহার কর্ম্ম সাধনার প্রয়োজন নাই। শঙ্করাচার্য্য শ্রুতি স্মৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়া আপন মত সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার দুই একটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"পরমাত্মনি যো রক্তো যো রক্তোঽপরমাত্মনি।
সর্ব্বৈষণাধিনির্ম্মুক্তঃ স ভৈক্ষং ভোক্তুমর্হতি॥
কর্ম্মনা বধ্যতে জন্তুর্ব্বিদ্যায়া চ বিমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥" শুকানুশাসন
"ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ।

* * * *

প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতা।" বৃহস্পতি

গিরি শঙ্করাচার্য্যের এই মত সমর্থন করিয়াছেন। মধুসূদনও এই কথা বলেন। তিনি বলেন "সাধনার স্তর আছে। প্রথম নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠা—ফল চিত্তশুদ্ধি, তাহার পর শমদমাদি সাধন পূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস, তাহার পর ভগবৎভক্তি নিষ্ঠা, তাহার পর তত্ত্বজ্ঞান নিষ্ঠা—তাহার ফল জীবন্মুক্তি, পরাবৈরাগ্য প্রাপ্তি ও বিদেহ মুক্তি। শ্রুতিতে আছে, আত্মজ্ঞান পরিণামে লাভ করিলেই মুক্তি হয়—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি

করিতেছ মুগ্ধপ্রায় বিমিশ্র বচনে
বুদ্ধি মম ; কহ তবে নিশ্চয় করিয়া

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কর্ম্মাদি সাধনার প্রয়োজন। এই জন্য কর্ম্মাধিকারীকে জ্ঞান নিষ্ঠার উপদেশ উচিত নহে। এবং জ্ঞানাধিকারী হইবার পর কর্ম্মনিষ্ঠারও আর আবশ্যক নাই। সুতরাং একরূপ নিষ্ঠা অপেক্ষা অন্য নিষ্ঠা ভাল বা অনায়াসসাধ্য, একপ কথা সঙ্গত হইতে পারে না।"

রামানুজ বলেন, "আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে আত্মাবলোকন বা আত্মপ্রত্যক্ষ করিতে হয়, আত্ম সাক্ষাৎকার হইলে নিয়ত আত্মাতে অবস্থান করিতে হয় বা ব্রহ্ম স্থিতি করিতে হয়। এই পরা বিদ্যালাভ করিতে হইলে অবিদ্যাজনিত মনবুদ্ধিইন্দ্রিয় বিষয় হইতে জ্ঞানকে সরাইয়া লইতে হয়, ইন্দ্রিয় ব্যাপারের উপরতি আবশ্যক হয়। সুতরাং সে অবস্থায় সকাম হউক নিষ্কাম হউক কোন কার্য্যই থাকে না। অতএব পরাবিদ্যা বা আত্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ হইলে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। তাহা আত্মজ্ঞান লাভের উপায় মাত্র হইতে পারে।"

কিন্তু এস্থলে আর একরূপ অর্থ করিলেও বেশ সঙ্গত হয়। পূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"এষাতেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।" সুতরাং বুদ্ধি অর্থে এই তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে সাংখ্যবুদ্ধি ও যোগবুদ্ধি উভয়ই বুঝাইতেছে, এবং বুদ্ধি যোগ অর্থে কর্ম্মযোগ ও সাংখ্য বা জ্ঞানযোগ উভয়ই বুঝিতে হইবে। আর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোকে "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধি যোগাৎ ধনঞ্জয়" ইহা বলা হইয়াছে। সে স্থলে কর্ম্ম সকাম কি নিষ্কাম, তাহা কিছুই বলা হয় নাই। কিন্তু সে স্থানে কর্ম্ম অর্থ সকাম কর্ম্ম,তাহা সকল টীকাকারগণই বলিয়াছেন। অর্জ্জুনও সেই স্থানে কর্ম্মের অর্থ ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। এই জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন "যদি কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান ও যোগ বুদ্ধি উভয়ই শ্রেষ্ঠ, তবে "কর্ম্মেতেই অধিকার তব" একথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ কেন তাঁহাকে ঘোর কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন।" এখনও এই কর্ম্মে অর্জ্জুনের বিরাগ দূর হয় নাই। তাই তিনি এখনও যুদ্ধকে ঘোর কর্ম্ম বলিয়া

এক কথা—যাহে মম হবে শ্রেয় লাভ। ২

শ্রীভগবান—

কহিয়াছি পূর্ব্বে আমি শুন পুণ্যবান
আছে হেথা দুই নিষ্ঠা—সাংখ্যজ্ঞানীদের
জ্ঞানযোগে, কর্ম্মযোগে যত যোগীদের। ৩

নির্দেশ করিতেছেন। এই যুদ্ধের ফলে আত্মীয় হত্যা হইবে ও অর্জ্জুনকে তাহাতে দুঃখ পাইতে হইবে,তাহাও অর্জ্জুনের ধারণা এখনও রহিয়াছিল। তাহার উপর দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১ হইতে ৩৭শ্লোকে যুদ্ধের পরিণামে অর্জ্জুনের লাভ হইবে,শ্রীকৃষ্ণ এরূপ কথাও বলিয়াছেন। সুতরাং তখনও এ যুদ্ধ অর্জ্জুনের সকাম কর্ম্ম অথবা অশুভ কর্ম্ম বলিয়া ধারণা ছিল। তাই অর্জ্জুন বলিলেন এ যুদ্ধকর্ম্ম সাংখ্য জ্ঞানমার্গের অন্তর্গত নহে, বুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মমার্গেরও অন্তর্গত নহে। আবার বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা এ কর্ম্ম নিকৃষ্ট। তবে তিনি কেন যুদ্ধ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ এই তৃতীয় অধ্যায়ে দেখাইয়াছেন, কর্ম্ম যোগে বুদ্ধি যুক্ত হইয়াও এ যুদ্ধ করা যাইতে পারে। আর নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তব্যবোধে স্বধর্ম্ম যুদ্ধ না করিলেও তিনি আত্মজ্ঞান লাভের উপায়ভূত কর্ম্মযোগ বুদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না।

ভয়ঙ্কর—মূলে আছে 'ঘোর'। সর্ব্ব ইন্দ্রিয় ব্যাপাররূপ আত্মজ্ঞান বিরোধী (রামানুজ, বলদেব) হিংসাত্মক (স্বামী ও শঙ্কর)।

(২) বিমিশ্র বচনে—কখন বা কর্ম্ম প্রশংসা কখন বা জ্ঞান প্রশংসা এইরূপ সংশয় জনক বাক্যে (স্বামী)। "ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম যুদ্ধ বিনা আর কোন কর্ত্তব্য নাই বলিয়া, পুনর্ব্বার জ্ঞান হইতে মুক্তি হয় এইরূপ সন্দেহ জনক কথায়। বলদেব বলেন, সাংখ্য বুদ্ধি ও যোগ বুদ্ধি সাধ্যসাধক রূপে অবিরোধী হইলেও তাহা এস্থলে বিমিশ্রিত হইয়াছে। মধুসূদন বলেন, জ্ঞান ও কর্ম্ম যোগ উভয়ই একাধিকারীর কর্ত্তব্য কি ভিন্নাধিকারীর কর্ত্তব্য এবং ভিন্নাধিকারীর কর্ত্তব্য হইলে অর্জ্জুন কিসের অধিকারী, তাহা বুঝিতে না পারিয়াই সন্দেহ যুক্ত হইয়াছিলেন।

(৩) নিষ্ঠা—স্থিতি, অনুষ্ঠেয় তাৎপর্য্য (শঙ্কর)। মোক্ষপরতা (স্বামী)। সাধ্যসাধন ভেদে নিষ্ঠা দুই প্রকার হইলেও উহা একাত্মক, এই জন্য একবচনে ইহা মূলে ব্যবহৃত হইয়াছে (বলদেব)।

কর্ম্ম অনুষ্ঠান সুধু করি পরিত্যাগ
না পারে পুরুষে কভু হতে কর্ম্মহীন ;
সুধু সন্ন্যাসেতে নাহি হয় সিদ্ধিলাভ। ৪

নাহি হেন কেহ, যেই কর্ম্ম নাহি করি
রহে ক্ষণেকের তরে ; করে কর্ম্ম সব
প্রকৃতি-জনিত গুণে অবশ হইয়া। ৫

দুই—বিষয় ব্যাকুল বুদ্ধিযুক্ত মুগ্ধ লোকের কর্ম্ম যোগে অধিকার ; আর মোহ উত্তীর্ণ কামনাত্যাগী অব্যাকুল বুদ্ধিযুক্ত লোকের জ্ঞানযোগে অধিকার - এই দুই অধিকার হইতে দুই নিষ্ঠা (রামানুজ)।

পূর্ব্বে—এই গীতার প্রথমে, অথবা সৃষ্টির পূর্ব্বে (স্বামী, বলদেব ও মধুসূদন)। কিম্বা বেদে,"পুরা বেদা অনা ময়া প্রোক্তা" (শঙ্কর)।

জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ—দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯ শ্লোকের টীকা দেখ। আত্মবিষয় বিবেকী সাংখ্যজ্ঞানী দের ব্রহ্মচর্য্য হইতে সন্ন্যাসাশ্রমে পরমহংস, পরি ব্রাজক প্রভৃতি হইয়া জ্ঞানভূমিতে আরূঢ় হইয়া শুদ্ধা ন্তকরণ হইলে জ্ঞানমার্গ অবলম্বনীয় হয়। ও সেই জ্ঞান মার্গ লাভ জন্য, তাহার উপযুক্ত হইবার জন্য- চিত্ত শুদ্ধি করিতে হয়,ও সে জন্য শ্রুতি স্মৃতি নির্দ্দিষ্ট নিত্য নৈমিত্তিক বৈদিক লৌকিক কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে সম্পা দন করিতে হয়। ইহাই কর্ম্মযোগ। এস্থলে রামা নুজ ভিন্ন সকল টীকাকারগণ এই অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় গীতায় এই দুই যোগেরই সমান প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। কেন না উভয় নিষ্ঠার ফলেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়,ইহা পরে বলা হইয়াছে। (১৩অধ্যায় ২৪ শ্লোক দেখ)। সুতরাং কর্ম্মমার্গ কেবল জ্ঞানমার্গের পূর্ব্ব সোপান, এরূপ বলা যায় না।

(৪) কর্ম্ম অনুষ্ঠান পরিত্যাগ—আরব্ধশাস্ত্রীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ (রামানুজ)। যজ্ঞাদি দিয়ার অনুষ্ঠান ত্যাগ (শঙ্কর)। অর্জ্জুন যুদ্ধ অনুষ্ঠান করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছেন বলিয়া এইরূপ বলা হইয়াছে (শঙ্কর)।

কর্ম্মহীন—(মূলে আছে,'নৈষ্কর্ম্ম্য') নিষ্কর্ম্মভাব বা কর্ম্মশূন্যতা,কিম্বা জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা বা নিষ্ক্রিয় ভাবে আত্মস্বরূপে অবস্থান (শঙ্কর)। সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপার রূপ কর্ম্মে বিরতি বা জ্ঞাননিষ্ঠা (বলদেব, রামানুজ)।

সুধু সন্ন্যাসেতে—কর্ত্তব্যকর্ম্ম সন্ন্যাসে, বা [কেবল,কর্ম্ম পরিত্যাগ মাত্রে,বা জ্ঞান লাভ হইবার পূর্ব্বে কর্ম্মত্যাগ করিলে সিদ্ধি হয় না (শঙ্কর)। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞান শূন্য সন্ন্যাসে মোক্ষ হয় না। (স্বামী)।

এই শ্লোকের অর্থ এই যে, কর্ম্ম ও জ্ঞান পরস্পর বিরোধী হইলেও, অর্থাৎ উভয়ের একত্র অনুষ্ঠান এক রূপ অধিকারীর পক্ষে অসম্ভব হইলেও,ইহার একটীকে ত্যাগ করিয়া অন্যটীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে কোন ফল হয় না। অর্থাৎ কর্ম্মাচরণ কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্য জ্ঞান মার্গে আরোহণ করিবার জন্য হইলেও গৌণ ক্রমে মোক্ষের কারণ হয়। এই জন্য সাধনার প্রথমাবস্থায় কর্ম্মমার্গ ত্যাগ করিতে নাই। কিন্তু তাহা হইতে পরিণামে জ্ঞান নিষ্ঠায় না আরোহণ করিতে পারিলে কর্ম্মে মোক্ষ হয় না। সেইরূপ চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞান মার্গে আরোহণ করা যায় না। কর্ম্মনিষ্ঠাই এই চিত্ত শুদ্ধির একমাত্র কারণ। এই কর্ম্ম হইতেই পরিণামে জ্ঞানলাভ হইতে পারে। সুতরাং ইহাদের একটী ত্যাগ করিলে আর একটীতে মোক্ষ হয় না (শঙ্কর)। গীতায় ১৮ অধ্যায়ের ৫ শ্লোক এই—

"সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।
যজ্ঞোদান তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিনাম্॥"

অন্যত্র আছে —

জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
যথাদর্শতল প্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি॥"

(৫) প্রকৃতি জনিত গুণে—প্রকৃতি হইতে জাত সত্ত্ব,রজ ও তমোগুণের দ্বারা মুগ্ধ হইয়া (শঙ্কর)। অথবা প্রকৃতির বা নিজ স্বভাবানুরূপ রাগ দ্বেষাদি গুণে বশীভূত হইয়া(স্বামী)। প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে প্রবৃদ্ধ গুণ বশে (রামানুজ)। এই অধ্যায়ের শেষে এই কথা বুঝান আছে।

কি কারণে জ্ঞান লাভের পূর্ব্বে কর্ম্ম সন্ন্যাসের দ্বারা সিদ্ধি হয় না, অর্থাৎ আত্মা নিশ্চল হইলেও আত্মাতে অবস্থিতি করিবার পূর্ব্বে প্রকৃতির অধীন মানব প্রকৃতির গুণের দ্বারা বিচলিত হয় বলিয়া তাহাতে সিদ্ধি হয় না, ইহাই এই শ্লোকে দেখান হইয়াছে (শঙ্কর,মধু)।

স্বামী বলেন, জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কেহই কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। কেননা সকলেই নিজ স্বভাব

কর্ম্মেন্দ্রিয়গণে যেই সংযত করিয়া
ইন্দ্রিয়-বিষয় সব ভাবে মনে মনে—
মূঢ়মতি মিথ্যাচারী কহে হেন জনে। ৬
কিন্তু চিত্তবলে করি ইন্দ্রিয় সংযত
আসক্তি ত্যজিয়া যেই, কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা
হয় কর্ম্ম-যোগে রত—শ্রেষ্ঠ সেই জন। ৭

বশে বিচলিত হইয়া কর্ম্ম করে। এই জন্ত একেবারে কর্ম্মত্যাগ সম্ভব নহে, কেবল কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগই সম্ভব। এই অর্থই অধিক সঙ্গত বোধ হয়।

বলদেব বলেন, অবিশুদ্ধচিত্ত লোকে বৈদিক কর্ম্ম সন্ন্যাস করিলেও কি কারণে লৌকিক কর্ম্মে রত হয়, তাহা এখানে দেখান হইয়াছে।

(৬) ভাবে মনে মনে—বিমূঢ়াত্মা রাগদ্বেষ দূষিত চিত্ত যাহারা, তাহারা ঔৎসুক্য বশতঃ কর্ম্মেন্দ্রিয় নিগ্রহ করিলেও, অর্থাৎ বহিরেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম না করিলেও, মনে মনে অনুরাগ-বিরাগ বশে শব্দাদি ইন্দ্রিয় বিষয় স্মরণ করে (মধু)। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধির পূর্ব্বে কর্ম্মত্যাগ করিয়া মনে ঈশ্বর ধ্যান করিতে গেলেও তাহার পরিবর্ত্তে বিষয় চিন্তা মনে উদিত হয়(বলদেব)। পাপধ্বংসের পূর্ব্বে, বাহ্য জয় হইবার পূর্ব্বে, আত্মজ্ঞানে প্রবৃত্ত হইলেও মন বিষয় প্রবণতা বশতঃ আত্মা হইতে বিমুখ হইয়া বিষয় চিন্তা করে (রামানুজ)। ভগবান্ ধ্যান ছলে ইন্দ্রিয়ের বিষয় স্মরণ করে (স্বামী)।

মিথ্যাচারী—নিজ সংকল্পের অন্যথা আচরণ করে (রামানুজ)। পাপাচারী (শঙ্কর) বা কপটাচারী (স্বামী) হয়। ইন্দ্রিয় সংযম ক্রিয়া বৃথা হইয়া সে দাম্ভিক হয় (বলদেব)।

(৭) চিত্তবলে—(মূলে আছে 'মনসা' বা মনের দ্বারা) বিবেক যুক্ত হইয়া (মধু)।

ইন্দ্রিয়—জ্ঞানেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা,জিহ্বা, ত্বক্ এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়।

সংযত—ঈশ্বর পরায়ণ করিয়া (স্বামী)। বিষয়াসক্তি নিবৃত্ত করিয়া (মধু)। আত্মাবলোকন প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়মিত করিয়া (রামানুজ)।

কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্ পাণি,পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়।

নিয়ত করিও কর্ম্ম ; কর্ম্ম ত্যাগ হতে
কর্ম্ম হয় শ্রেষ্ঠতর। কর্ম্ম ত্যাগ করি
নির্ব্বাহ জীবন যাত্রা হবে না তোমায়। ৮

শ্রেষ্ঠ—উক্ত মিথ্যাচারী ও ইতরলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় (শঙ্কর, মধু)। তাহার জ্ঞান সম্ভাবনা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাচারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ(বলদেব)। চিত্তশুদ্ধির দ্বারা জ্ঞানবান হয় (স্বামী)। কেবল রামানুজ ভিন্ন অর্থ করেন ; তিনি বলেন, তাহাদের প্রমাদের সম্ভাবনা না থাকায় তাহারা জ্ঞান নিষ্ঠাবান পুরুষ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হয়।

(৮) নিয়ত করিও কর্ম্ম—নিত্য কর্ম্ম করিও- অর্থাৎ শ্রুতি স্মৃতি বিহিত নিত্য কর্ম্ম করিও (স্বামী, মধু, শঙ্কর) চিত্তশুদ্ধি জন্য নিষ্কাম ভাবে স্ববিহিত আবশ্যক কর্ম্ম করিও (বলদেব)।

রামানুজ ভিন্ন অর্থ করেন। তিনি বলেন,তুমি প্রকৃতির সহিত সংসৃষ্ট থাকায় নিত্যকাল ব্যাপিয়া অনাদি বাসনার দ্বারা চালিত হইয়া যে কর্ম্ম করিবে, তাহাই তোমার সর্ব্বাপেক্ষা সুকর হইবে। এই শ্লোকের শেষ ছত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিলে এই অর্থই অধিক সঙ্গত হয়। এবং মূল শ্লোকে 'নিয়ত'—তৎপর স্থিত"কুরু এই ক্রিয়ার বিশেষণ বোধ হয়। 'নিয়ত'র সহিত 'কর্ম্ম' অন্বয় করিলে তাহা কিছু দুরান্বয় হইয়া পড়ে।

কর্ম্মত্যাগ হতে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ—চতুর্থ শ্লোকে উক্ত কর্ম্মের অনারম্ভ অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ (শঙ্কর, বলদেব)। সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম করা ভাল(স্বামী)। রামানুজ বলেন, জ্ঞান নিষ্ঠা অপেক্ষাও কর্ম্ম নিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ। কেননা পূর্ব্বে অভ্যাস না হওয়ায় জ্ঞান নিষ্ঠায় স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রবৃত্তিকে সহজে নিবৃত্ত করা যায় না। আরও আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া আত্মায় অকর্ত্তৃত্ব অনুসন্ধান করিয়া স্থির হয়। এই জন্য আত্মজ্ঞান ও কর্ম্ম যোগের অন্তর্গত, ও সেই হেতু কর্ম্ম যোগ শ্রেষ্ঠ। এবং জ্ঞান নিষ্ঠা অধিকারীরও কর্ম্ম যোগ আচরণীয়। কেন না জ্ঞাননিষ্ঠেরও কর্ম্ম ত্যাগ করিলে শরীর রক্ষা হয় না। এই যুক্তি রামানুজের। তিনি আরও বলেন যে, যে পর্য্যন্ত শরীর ধারণ করিতে হয়, ও সাধনার সমাপ্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত ন্যায়ার্জ্জিত ধনের দ্বারা মহা যজ্ঞ ও নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম অবশ্য সম্পন্ন করিয়া,

যজ্ঞ হেতু কর্ম্ম বিনা হয় এ সংসারে
অন্য কর্ম্ম, হে অর্জ্জুন, বন্ধন কারণ—
সেই হেতু কর্ম্ম কর আসক্তি ত্যজিয়া। ৯

যজ্ঞ সহ প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করি
কয়েছিলা পূর্ব্বে—"হও বর্দ্ধিত ইহাতে,
হ'ক ইহা তোমাদের ইষ্ট কাম দাতা। ১০

যজ্ঞাবশিষ্ট আহারের দ্বারা শরীর ধারণ করিবে। কেন না আহার শুদ্ধ হইলে সত্বশুদ্ধি হয়। সত্বশুদ্ধিতে স্মৃতি স্থির হয়। এই জন্য প্রকৃতিসংসৃষ্ট কর্ম্মযোগই সুকর।

জীবন যাত্রা—শরীর স্থিতি (শঙ্কর)। শরীর রক্ষার জন্য জ্ঞানমার্গাবলম্বীকেও ভিক্ষাভ্রমণাদি ক্রিয়া করিতে হয়। ক্ষত্রিয়ের ত কর্ম্ম ব্যতীত জীবন ধারণের অন্য উপায় নাই(বলদেব)। কর্ম্ম ব্যতীত অর্জ্জুনের শরীরযাত্রা ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত রূপে নির্ব্বাহ হইবে না (মধুসূদন)। দেহাদি চেষ্টা দ্বারা শরীর রক্ষা হয়, নতুবা মৃত্যু হয় (গিরি)।

(৯) যজ্ঞহেতু—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া শঙ্কর, স্বামী, মধুসূদন, গিরি, বলদেব ইঁহারা 'যজ্ঞ' অর্থে বিষ্ণু বা পরমেশ্বর স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যজ্ঞহেতু অর্থে—ঈশ্বর বা বিষ্ণু আরাধনার্থ তাঁহাকে তোষণার্থ। কিন্তু রামানুজ 'যজ্ঞ' সাধারণ অর্থে বুঝিয়াছেন। অর্থাৎ এ শ্লোকে ও পরের শ্লোকে যজ্ঞ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই কথা বলিয়াছেন। এ অর্থও বেশ সঙ্গত।

বন্ধন কারণ—রামানুজ বলেন যে,আত্ম প্রয়োজন জন্য আসক্তি বশে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা হইতে কর্ম্মবন্ধন হয়। অহঙ্কার মমতা ও সর্ব্বেন্দ্রিয় ব্যাকুলতা জনিত কর্ম্মে বাসনাবীজ থাকায় তাহাতে বন্ধন হয়। অর্থাৎ সেই বাসনা বা কামবীজ হেতু সংসারে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। ঋগ্বেদ মন্ত্রের ৮।১০।১১ মন্ত্রে আছে,"কামস্তদগ্রেসমবর্ত্ততাধিমনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।"

আসক্তি ত্যজিয়া—সুখাভিলাষ ত্যাগ করিয়া, এবং ন্যায়োপার্জ্জিত দ্রব্যসিদ্ধ যজ্ঞাদির দ্বারা বিষ্ণুকে আরাধনা করিয়া তাহার অবশিষ্ট দ্বারা দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া (বলদেব)। আত্ম প্রয়োজন সাধনের অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া (রামানুজ)। কর্ম্মফলে অভিলাষ ত্যাগ করিয়া (শঙ্কর)। আসক্তি ত্যাগ করিয়া পরম পুরুষকে যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা আরাধনা করিলে, অর্থাৎ যজ্ঞ হেতু কর্ম্ম করিলে, অনাদিকাল প্রবৃত্ত কর্ম্ম বাসনা দূর হইয়া যায়, ইন্দ্রিয় ব্যাকুলতা নষ্ট হয়, আত্মাবলোকন করা যায়।

পূর্ব্বশ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে,শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য কর্ম্ম করিতে হয়। আহার সংগ্রহ করিতে হয়। সে জন্য গৃহীর অর্থার্জ্জনাদি ও সন্ন্যাসীর ভিক্ষাদির প্রয়োজন হয়, অথবা অন্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু নিজের জন্য আহার সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইলে মন সেই দিকে আকর্ষিত হয়, কর্ম্মে আসক্তি হয়। তাহার ফল—কর্ম্ম বন্ধন। এখন কথা হইতেছে, এমন কোন উপায় আছে কিনা, যাহাতে আহার সংগ্রহও চলিবে, এবং সে নিমিত্ত কৃতকর্ম্মে আসক্তি হইবে না। এ উপায় এই যে, আহার সংগ্রহার্থ কর্ম্ম নিজের জন্য করিতেছি মনে যেন এরূপ ধারণা না থাকে। অর্থাৎ যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করিতেছি,বা ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিতেছি, অথবা পশুপক্ষী মনুষ্য প্রভৃতি সর্ব্বজীবের পোষণ ও বর্দ্ধন জন্য, ও প্রকৃতির যে শক্তির ব্যয়ে জীব জগৎ বর্দ্ধিত হয়, সে শক্তি বর্দ্ধন জন্য যে পঞ্চযজ্ঞাদি কর্ত্তব্য, তাহার জন্যই দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেছি— কেবল এইরূপ ধারণা করিয়াই কর্ম্ম করিতে হইবে। তাহা হইলে নিজের জন্য কর্ম্ম করিতেছি এরূপ মনে হইবে না। সুতরাং কর্ম্মে স্বার্থ বা নিজ কামনা থাকিবে না। তাহাতে ধর্ম্মের মূলসূত্র denial of the will শিক্ষা হইবে। কর্ম্মে বন্ধন হইবে না। এই তত্বই এ শ্লোকে ও পরের আট শ্লোকে বুঝান হইয়াছে, ও যজ্ঞ কেন কর্ত্তব্য তাহাও দেখান হইয়াছে।

(১০) যজ্ঞসহ—ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমে যজ্ঞের সহিত তিন বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) সৃষ্টি করিয়াছিলেন (শঙ্কর, মধুসূদন, স্বামী), (মনু ১।২১ দেখ)। দেবতাদের আদিরূপ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন (বলদেব)। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, ব্রহ্ম সৃষ্টি কালে অগ্নি, ইন্দ্র বরুণাদি, বসু রুদ্রাদি, ও পৃথ্বী—এই সকল দেবতাদের যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতিরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বেদে আছে (ঋক্ ৮।১০।৯০ দেখ)—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়তঃ।

"যজ্ঞ দ্বারা দেবগণে কর সম্বর্দ্ধিত
তাঁহারাও তোমাদের করুণ বর্দ্ধন,—
পরস্পর সম্বর্দ্ধনে কর শ্রেয় লাভ। ১১

অতএব সৃষ্টির প্রথমে চারি বর্ণই সৃষ্টি হইয়াছিল।

প্রজাপতি—ঈশ্বর, বিষ্ণু (বলদেব)। প্রজাস্রষ্টা (শঙ্কর, মধু)।

কয়েছিলা—নামরূপ বিভাগশূন্য,নিজ প্রকৃতির শক্তিতে বিলীন পুরুষদিগের প্রয়োজন অনুসারে সৃষ্টি-কালে সেই প্রয়োজনের সম্পাদক নামরূপ বিভাগ করিয়া, যজ্ঞ এবং তাহার নিরূপক বেদ প্রকাশ করিয়া ছিলেন (বলদেব)। অথবা অনাদিকাল প্রবৃত্ত অচিৎ (চৈতন্যাতীত) বিষয় সংসর্গে অবশ ও নামরূপ বিভাগ হেতু বহু পুরুষকে কালে আপনাতে লীন করিয়া বা বিলীন রাখিয়া,পরে সৃষ্টিকালে পুনর্ব্বার নামরূপ বিভাগ প্রজাসৃষ্টি করিয়াছিলেন(রামানুজ)। বলদেব ও রামানুজ উক্তরূপ অর্থ করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়াছেন বোধহয়।

বৃদ্ধি হও—আপনার বৃদ্ধি কর (বলদেব, রামানুজ)। উত্তরোত্তর উন্নত হও (মধুসূদন)।

ইহাতে—এই যজ্ঞ দ্বারা অথবা আশ্রমোচিত ধর্ম্মের দ্বারা (মধু)।

ইষ্টকামদাতা—অভিপ্রেত ফল দাতা (শঙ্কর)। কাম্যফলদাতা (মধু)। মোক্ষরূপ কাম ও তাহার অনুযায়ী কামনা সফলদাতা (রামানুজ)। হৃদিশুদ্ধি হইলে আত্ম জ্ঞান লাভ করিয়া ও দেহযাত্রা যজ্ঞ দ্বারা সম্পাদন করিয়া বাঞ্ছিত মোক্ষ ফল লাভ হইবে (বলদেব)।

এস্থলে কর্ম্মযোগ মার্গে আরোহণ জন্য প্রথম যজ্ঞ কর্ম্ম আবশ্যক বলিয়া ভগবান প্রথমে ইষ্টফল দাতা যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্মেরও প্রশংসা করিয়াছেন বোধ হয়। কারণ বিনা জ্ঞানে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কাম্য কর্ম্মও অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ (স্বামী)। অথবা যজ্ঞ আদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ইহাই এস্থলে বুঝান হইয়াছে (গিরি)। শেষ অর্থই অধিক সঙ্গত।

(১১) সংবর্দ্ধিত—(মূলে আছে 'ভাবয়ত')অপ্যায়িত কর (শঙ্কর) বা যজ্ঞের হবি দ্বারা বর্দ্ধিত কর। (স্বামী,মধু)।

বর্দ্ধন—বৃষ্টি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন করিয়া বর্দ্ধন করিবেন (মধু), (বিষ্ণুপুরাণ ১।৬ দেখ)।

"যজ্ঞে পুষ্ট দেবগণ দিবেন সবারে
ইষ্ট ভোগ ; ভুঞ্জে যেই দেবে নাহি দিয়া
দেব-দত্ত যে সকল—তস্কর সেজন। ১২
"যজ্ঞ অবশিষ্ট ভোজী সাধু যেই জন
হয় সর্ব্বপাপ মুক্ত ; কিন্তু যেই পাপী
নিজ হেতু করে পাক—পাপাহারী সেই।"১৩

শ্রেয়—মোক্ষ (বলদেব),স্বর্গ (মধু)। মোক্ষ লক্ষণ যুক্ত জ্ঞান পাইবে,অথবা স্বর্গলাভ হইবে (শঙ্কর)। বলদেব আরও বলিয়াছেন যে,যজ্ঞ দ্বারা আহার শুদ্ধি হয়, (১৪ শ্লোকের টীকা দেখ) আহার শুদ্ধিই জ্ঞান নিষ্ঠার প্রধান অঙ্গ। কারণ শ্রুতিতে আছে, "তত্রাহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্ব শুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতি লম্ভে সর্ব্ব গ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ)।

(১২) ইষ্টভোগ—স্ত্রী পুত্র পশু প্রভৃতি(শঙ্কর)। পশু স্বর্গাদি (মধু)। অন্নপানাদি বাহ্য সম্পদ (গিরি, রামানুজ)।

দেবগণ—দেবতাগণ ঈশ্বরেরই শরীরভূত অংশ বলিয়া ঈশ্বরই সর্ব্বযজ্ঞের ফল দাতা(রামানুজ)। গীতার ৪ অধ্যায়ের ১১ শ্লোক দেখ।

এস্থলে কর্ম্মত্যাগের দোষ দেখান হইয়াছে (স্বামী)। যজ্ঞে পারত্রিকের ফল ভিন্ন এ জন্মেও ফল পাওয়া যায়, তাহা এ স্থলে দেখান হইয়াছে (মধুসূদন)।

দেবে নাহি দিয়া—যজ্ঞে দেবোদ্দেশে আহুতি না দিয়া (মধু)। পঞ্চ যজ্ঞাদির দ্বারা দেবে তুষ্ট না করিয়া (বলদেব, স্বামী)।

ভুঞ্জে—নিজ দেহ ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করে(মধু,শঙ্কর)।

তস্কর—দেবস্ব অপহারী (শঙ্কর)। অন্যের নিকট প্রাপ্ত বস্তু অন্যের প্রয়োজনে না দিয়া তাহাকে যে নিজস্ব করিয়া লয় (রামানুজ)।

(১৩) যজ্ঞ অবশিষ্ট ভোজী—দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ, এই পাঁচ যজ্ঞ। গিরি,দেব যজ্ঞ ত্যাগ করিয়া চারি যজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন। দেবতা, পিতৃলোক, মনুষ্য ও অন্য ভূতগণের বর্দ্ধন জন্য ও ব্রহ্মের তৃপ্তির জন্য যে কার্য্য করা হয় তাহাই যজ্ঞ। এই কয় যজ্ঞ করিয়া যে ব্যক্তি যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করে, সেই অমৃত ভোজন করে (শঙ্কর)।

সর্ব্বপাপমুক্ত—এস্থলে স্মৃত্যুক্ত পঞ্চসূনার (পঞ্চ পাপের) কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—

অন্ন হতে সমুদ্ভূত হয় ভূতগণ,
জন্মে অন্ন বৃষ্টি হতে, বৃষ্টির উদ্ভব
যজ্ঞহেতু, কর্ম্মহতে যজ্ঞের সম্ভব ; ১৪

"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী।
পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন গচ্ছতি।"

স্মৃতিমতে, অজ্ঞানকৃত এই পঞ্চ পাপ উক্ত পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা নষ্ট হয়। অজ্ঞান পূর্ব্বক ঢেঁকী, যাঁতা, চুল্লী, জলকলস ও ঝাঁটার দ্বারা লোকে সর্ব্বদা যে জীবহিংসা করে উক্ত পঞ্চ যজ্ঞের দ্বারা সেই পাপ মোচন হয়। আমাদের শাস্ত্র মতে সামান্য অজ্ঞানকৃত প্রাণীহিংসাও কতদূর পাপজনক তাহা ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়। শাস্ত্রে আছে—

"পঞ্চসূনা কৃতং পাপং পঞ্চ যজ্ঞৈ র্ব্যাপোহতি"।

বলদেব ও রামানুজ বলেন, অনাদি কাল হইতে উপচয় হইয়াছে যে পাপ ও যাহা আত্মতত্ত্ব অবলোকন বিরোধী তাহাই এস্থলে উক্ত হইয়াছে।

নিজহেতু করে পাক—(এ সম্বন্ধে মনু ৩।১১ দেখ) যজ্ঞপুরুষের অঙ্গ স্বরূপ দেবতাদের অর্চনার জন্য যজ্ঞার্থ পাক না করিয়া আত্মপোষণের জন্য পাক করে (রামানুজ, বলদেব)।

পাপাহারী—সেরূপ অশুদ্ধ আহারের পরিণাম পাপ এই জন্য সে পাপাহারী (রামানুজ)। কেন না তাহার উক্ত পঞ্চসূনা বিদ্যমান থাকে। যজ্ঞ দ্বারা নষ্ট হয় না। শ্রুতিতে আছে, "ইদমেবাস্য তৎসাধারণমন্নং যদিদমদ্যতে স য এতদুপাস্তে ন স পাপ্মনোব্যাবর্ত্ততে মিশ্রং হ্যেতৎ।" অন্যত্র আছে "মোঘ মন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধইংস তস্য নার্য্যমনং পুষ্যতি নোসখায়ং কেবলাঘোভবতি কেবল ইতি।"

(১৪) অন্নহতে সমুদ্ভূত—ভুক্ত অন্ন পরিপাক হইয়া রক্তাদি সার পদার্থ প্রস্তুত হয়। ইহারই সার হইতে পরে পুরুষের রেতঃ ও স্ত্রীলোকের শোণিত উৎপন্ন হয়। এই শুক্র ও শোণিত যোগেই জীবদেহের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হয়। সুতরাং অন্ন হইতেই আমাদের মাতা পিতৃজ শরীর ও স্থূল দেহের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হয় (শঙ্কর)। "শুক্র শোণিত জীব সংযোগে তু খলু কুক্ষিগতে গর্ভসংজ্ঞোভবতি। (চরক)। এই মত আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত।

প্রশ্নোপনিষদে(১২শ্লোকে) আছে—"অন্নং বৈ প্রজাপতি স্ততো হ বৈ তদ্ রেতস্তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্ত ইতি।"

সাংখ্যকারিকায় আছে,—

"সূক্ষ্মা মাতা পিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈস্ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ সূক্ষ্মা তেষাং নিয়তা মাতা পিতৃজা নিবর্ত্তন্তে॥"

বৃষ্টি হতে—মূলে আছে 'পর্জ্জন্য'—অর্থাৎ বৃষ্টি ও বজ্রাকুলিত মেঘ। কিন্তু এস্থলে অর্থ বৃষ্টি (স্বামী ও শঙ্কর) মধু ও গিরি বলেন এই কথা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

বৃষ্টির উদ্ভব যজ্ঞ হেতু—মনু স্মৃতিতে আছে—
"অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥"

অর্থাৎ অগ্নিতে যে আহুতি প্রদান করা যায়, তাহা সমস্ত আদিত্যের অভিমুখে উপস্থিত হয়। তাহা হইতে আদিত্য প্রভাবে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে বসুমতী ফলবতী হইলে অন্ন উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে প্রজা সৃষ্টি হয়।"

অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে দেবতা স্মরণ পূর্ব্বক যে আহুতি প্রদান করা যায়,সেই হবি এক অপূর্ব্বাখ্য সূক্ষ্ম শক্তি বা ধর্ম্ম যুক্ত হইয়া বাষ্পাদি রূপে রশ্মি পথে সূর্য্যাভিমুখে আরোহণ করিতে থাকে। পরে সেই শক্তি হইতেই বৃষ্টি হয়, এবং তাহা হইতেই ব্রীহি যবাদি অন্ন জন্মে ও পূর্ব্বোল্লিখিত রূপে তাহা হইতেই ভূত দেহ বর্দ্ধন হয় (গিরি)। সুতরাং যজ্ঞদত্ত হবিই পরে অন্নরূপে পরিণত হয় ও জীবদেহ বর্দ্ধন করে।

এই কথা আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে হইলে, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত দুই একটী তত্ত্বের আলোচনা করিতে হয়। সূর্য্যের উত্তাপে জল যখন বাষ্পরূপে পরিণত হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তখন তাহার সহিত কতকটা সেই তাপ অন্তর্হিত হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাকে(Latent heat) বলে। সেই বাষ্প পুনর্ব্বার বৃষ্টিরূপে পরিণত হইতে হইলে, তাহার সেই অন্তর্ভূত তাপ বাহির হইয়া যাওয়ার প্রয়োজন হয়। ঊর্দ্ধেস্থিত শীতল বায়ু স্তরের সংযোগে,অথবা ঊর্দ্ধগমনক্রিয়া সম্পাদন হেতু সেই জলীয় বাষ্পের তাপ সম্পূর্ণরূপে অপগত হইতে পারে না—ইহা বিজ্ঞানবিদ্গণ এক্ষণে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা এখন অনুমান করেন যে, তাড়িতের ক্রিয়া বিশেষের দ্বারা সেই কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই জন্য বাষ্প যখন মেঘরূপে প্রথমে পরি-

পন্ন হয়, তখন তাহার সহিত বিদ্যুৎ স্ফুরণ হয়। বোধ হয় বাষ্পের অন্তর্ভূত উত্তাপ কোনরূপে তড়িত শক্তিতে পরিণত হয়, এবং সেই তড়িত ও পৃথিবী হইতে আকৃষ্ট তাহার বিরোধী তড়িত পরস্পর আকর্ষণ নিয়মানুসারে একীভূত হইয়া বিদ্যুৎ স্ফুরিত হয়, এবং তখন বাষ্পের সেই অন্তর্ভূত উত্তাপ হ্রাস হওয়ায় বাষ্প বৃষ্টিরূপে পরিণত হয়। সূর্য্য হইতে বিস্ফুরিত তেজ, তড়িত বা চুম্বক শক্তি রূপে কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া বাষ্পের তাপকে তড়িৎ রূপে পরিণত করে। এই জন্য সূর্য্যের তড়িতের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত অতিবৃষ্টির ও অনাবৃষ্টির সম্পর্ক আছে, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতকে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, কোন উপায়ে উর্দ্ধস্থিত বাষ্পে এই তড়িত শক্তির সংযোগ বিয়োগ দ্বারা অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি নিবারণ করা যাইতে পারে। সম্প্রতি আকাশাভিমুখে ডাইনামাইট নিক্ষেপ করিয়া তাহার সহসা বিশ্লেষণ জনিত শব্দের কম্পন হইতে বৃষ্টি উৎপাদনের চেষ্টা হইয়াছিল। তাহা কার্য্যকরী হয় নাই।

এস্থলে বৃষ্টি উৎপাদনের এক নূতন উপায় উল্লিখিত হইয়াছে। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞে অগ্নিতে যে হবি ক্ষেপণ করা হয়, তাহার অপূর্ব্ব ধর্ম্ম বা কোন বিশেষ শক্তির সহিত ধূম ও বাষ্পাকারে সূর্য্যরশ্মি পথে উর্দ্ধে উঠিয়া জলীয় বাষ্পের সহিত মিলিত হয়, ও তাহাকে বৃষ্টিতে পরিণত করে (শঙ্কর ও মধুসূদন)। বৃহৎ যজ্ঞাগ্নিকুণ্ডে যে বহু পরিমাণে হবি নিক্ষেপ হয়, তাহাও হয়তঃ বাষ্প হইয়া উপরে উঠিবার সময় বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করে। সেই জন্য তাহা জলীয় বাষ্পকে বৃষ্টিতে পরিণত করিতে পারে।

ইহা ব্যতীত আরও এক কথা আছে। যজ্ঞাহুত এই হবি বাষ্প রূপে জলীয় বাষ্পের সহিত উর্দ্ধে সংমিলিত হয়। সেই হবি বাষ্প বৃষ্টির সহিত ভূমিতে পড়িয়া ভূমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। শুধু তাহাই নহে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, এই হবি-বাষ্প মধ্যে জীবদেহ সংগঠনকারী অণু অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। সেগুলি আধুনিক বিজ্ঞানাবিষ্কৃত Protoplasm Jerm cell বা blastema কিনা তাহা পরীক্ষা করিলে জানা যাইতে পারে। যদি তাহা হয়, তবে এই হবি শুধু ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে না। সেই ভূমিতে যে শস্য হয়, তাহাতে এই হবি হইতেই জীবদেহ গঠনকারী অণুর পরিমাণ বৃদ্ধি হয়; ও সেই শস্যে জীবদেহের উন্নতি হয়। এইরূপ জীবদেহ গঠনোপযোগী অণুবিশিষ্ট শস্যই প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেহের উপযোগী। তাহার অভাবে আমাদের দেহ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এ তত্ত্ব যদি সত্য হয়, তবে যজ্ঞ আমাদের কত উপকারী তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। যজ্ঞ দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির ভার, ও আমাদের দেহের প্রকৃত উপযোগী শস্য যাহাতে উৎপন্ন হয় এইরূপ কঠিন কার্য্যের ভার নিরক্ষর কৃষকের হস্তে না থাকার পরিবর্ত্তে সকল গৃহস্থের উপরই পূর্ব্ব কালে ন্যস্ত ছিল। এবং এই জন্য যজ্ঞ সকল গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য ছিল।

এই তত্ত্ব হইতে পূর্ব্বোক্ত ১১। ১২। ১৩ শ্লোকের অর্থও কতকটা বুঝা যাইবে। কেন না যজ্ঞের দ্বারা কিরূপে আমরা সম্বর্দ্ধিত হইতে পারি, তাহার কারণ ইহা হইতে জানা যাইবে। আর এই যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি কারী শক্তি বা দেবতা বরুণ বা পর্জ্জন্যদেব, ও বিদ্যুৎ শক্তির আধার বা আকাশ দেবতা ইন্দ্র কিরূপে সম্বর্দ্ধিত হন, অর্থাৎ যজ্ঞ হইতে তাঁহাদের শক্তি কিরূপে বৃদ্ধি হয় তাহাও বুঝা যাইবে।

আরও এক কথা এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। সুকৃতি শক্তি বলে মৃত্যুর পর জীব সূক্ষ্মশরীর লইয়া বিদ্যুৎ পথে সূর্য্যলোকাভিমুখে গমন করে বটে কিন্তু যাহাদের ততদূর সুকৃতি শক্তি নাই তাহারা অত উর্দ্ধে বায়ু ও আকাশ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। উহারা পুনর্ব্বার হবি বাষ্পের সহিত বৃষ্টি মুখে ভূমিতে পতিত হয়, ও শস্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত হইয়া জীবদেহে প্রবেশ করে ও পরে সময় উপস্থিত হইলে শুক্র ও শোণিতের যোগে নিজ কর্ম্মানুকূল স্থূল শরীর গ্রহণ করে। শাস্ত্রে এই রূপে পুনর্জ্জন্ম তত্ত্ব বুঝান আছে। মনুসংহিতায় আছে,—

"যদাণুমাত্রিকো ভূত্বা বীজ স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
সমাবিশতি সংসৃষ্ট স্তদা মূর্ত্তিং বিমুঞ্চতি॥"

তাহা হইলে অন্ন হইতে জীবোৎপত্তির আরও এক কারণ আমরা বুঝিতে পারি।

সে যাহা হউক, জীবদেহ পোষক শস্য উৎপাদন করিতে যে প্রকৃতির কতকটা শক্তি ব্যয় হয়—ইন্দ্র

ব্রহ্মহতে হয় জে'ন কর্ম্মের উদ্ভব,
ব্রহ্ম হন সমুদ্ভুত অক্ষর হইতে—
তাই ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী সদা যজ্ঞে স্থিত। ১৫

বরুণ শক্তি যে কতকটা ক্ষয় হয়, তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। কেন না বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্ব হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে উপযুক্ত পরিমাণ শক্তির ব্যয় ব্যতীত শস্য উৎপাদনরূপ কার্য্য সম্ভবে না। পরে সেই শক্তির যদি পূরণ না হয়—তবে ইন্দ্র ও বরুণ শক্তি ক্রমে হ্রাস হইতে পারে। যজ্ঞ দ্বারা সেই শক্তি পূরণ করিতে হয়, অনাবৃষ্টি বা অল্পবৃষ্টির মূল কারণ নিবারণ করিতে হয়। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, যে মানব এই শক্তি দ্বারা পুষ্টহইয়া—পরে এই শক্তিকে নিজে পুষ্ট না করে—সে পাপী ও পাপাচারী।

মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের অষ্টম শ্লোক এইরূপ—

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে।
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসুচামৃতং॥"

কর্ম্মহতে যজ্ঞের উদ্ভব—এই যজ্ঞধর্ম্মাখ্য সূক্ষ্ম অপূর্ব্ব শক্তির উৎপাদনের কারণ কর্ম্ম, অথাৎ তাহা ঋত্বিক যজমানাদি ব্যাপার রূপ কর্ম্মবিশেষের দ্বারা সাধ্য হয়, (মধু, শঙ্কর, গিরি)।

(১৫) ব্রহ্ম—বেদ (শঙ্কর, স্বামী, গিরি, মধু, বলদেব)। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে আছে "তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে" অর্থাৎ যজ্ঞ বা পরব্রহ্ম হইতে বেদের উৎপত্তি। ঐতরেয় আরণ্যকে আছে, "তদিদি বা এতস্য মহতোভূতস্য নাম ভবতি যোঽস্যৈতদেবং নামবেদ ব্রহ্ম ভবতি ব্রহ্ম ভবতি।" অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রতিপাদক বেদ ব্রহ্ম নামে অভিহিত। রামানুজ বলেন, এখানে ব্রহ্ম অর্থে প্রকৃতি বা পরিণামরূপ শরীর। গীতায় ১৪ অধ্যায়ের ৩ শ্লোকে আছে-"মমযোনি মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং।" পাশ্চাত্য টীকাকারগণ বলেন ব্রহ্ম এখানে ব্রহ্মা। সে অর্থ আদৌ সঙ্গত নহে। কেহ কেহ অর্থ করেন 'ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্' বলিতে ব্রহ্মা ও অক্ষর এক সময়ে উদ্ভূত ইহাই বুঝায়। এ অর্থ কখন সঙ্গত নহে।

উদ্ভব—অর্থাৎ বেদই কর্ম্মের প্রমাণ(মধু)। অথবা বেদ হইতেই কর্ম্মের প্রবৃত্তি (বলদেব, স্বামী)। প্রকৃতি পরিণামরূপ শরীর হইতেই কর্ম্মের উদ্ভব হয়(রামানুজ)।

অক্ষর হইতে—পরমাত্মার নির্দ্দেশ হইতে পুরুষের নিশ্বাসের ন্যায় বুদ্ধি প্রয়োগ বিনা বেদ উদ্ভূত হইয়াছে। (মধু, শঙ্কর, গিরি)। শ্রুতিতে আছে "অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিত মেতৎ ঋগবেদঃ যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ।" রামানুজ বলেন—অক্ষর বা জীবাত্মা হইতে উদ্ভূত।

কিন্তু গীতার ৮ অধ্যায়ের ৩।১১।২১ শ্লোকে, ১২ অধ্যায়ের ৩ শ্লোকে এবং ১৫ অধ্যায়ের ১৬ শ্লোকে এই 'অক্ষর'শব্দের অর্থ পাওয়া যায়। সেই সব শ্লোক হইতে জানা যায় যে এই সৃষ্টিতে দুইরূপ পুরুষ আছে—ক্ষর ও অক্ষর। ক্ষর পুরুষ—জীব,কেন না তাহা ব্রহ্মে লীন হইতে পারে। অক্ষর পুরুষ 'কূটস্থ'। অর্থাৎ ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই অক্ষর পুরুষরূপে সর্ব্বজীব দেহে জীবের সহিত বাস করেন। ঋগ্বেদের ১ মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তের ২১ ঋকে আছে—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে" অর্থাৎ দুই পরস্পর যুক্ত সখ্য ভাবাপন্ন পক্ষী এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন। এই কূটস্থ অক্ষর পুরুষ সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া ইহাকে সর্ব্বগত বলা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অব্যক্ত পরব্রহ্মকেও 'অক্ষর' বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে 'ব্রহ্ম' অর্থে বেদ বুঝাইলে 'অক্ষর' অর্থে—অক্ষর পুরুষ হইবে না—কেন না বেদ অপৌরুষেয়। অক্ষর অর্থে তাহা হইলে পরব্রহ্ম বুঝিতে হইবে। রামানুজের অর্থ ধরিলে 'ব্রহ্ম' অর্থে মহৎযোনি বা তাহা হইতে জাতভূত শরীর বুঝিতে হইবে—'অক্ষর' অর্থে কূটস্থ জীবাত্মা হইবে। (গীতার ১৪।৪ শ্লোকে দেখ)।

সর্ব্বগত—সর্ব্বপ্রকাশক (মধু, শঙ্কর)। অর্থবাদের দ্বারা সর্ব্বভূতের প্রয়োজনীয় আখ্যানাদিতে অবস্থিত (স্বামী)। সকল শরীর অধিকার করিয়া বাসকারী (রামানুজ)।

যজ্ঞেস্থিত—যজ্ঞ হইতে যে অতীন্দ্রিয় অপূর্ব্ব ধর্ম্ম বা শক্তি জন্মে,তাহাতে অবস্থান করেন (মধু),যজ্ঞ বিধি প্রধান বলিয়া তাহাতে বাস করেন (শঙ্কর)। নিকৃষ্ট প্রজার জীবনোপায় বলিয়া অতি প্রিয় যজ্ঞে অধিষ্ঠিত থাকেন (বলদেব)। তিনিই যজ্ঞের মূল (রামানুজ)। সর্ব্বব্যাপী অক্ষর পুরুষ সর্ব্বদা যজ্ঞের উপায়ভূত হইয়া তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকেন (স্বামী)।

এইরূপে প্রবর্ত্তিত চক্র যে হেথায়
নহে অনুবর্ত্তী, পার্থ—সেই পাপ-প্রাণ,
ইন্দ্রিয় নিরত—বৃথা জীবন তাহার। ১৬

এই শ্লোকের এইরূপ সহজ অর্থও হইতে পারে, যথা,—অক্ষর পরব্রহ্মের এক চতুর্থ পাদ (পুরুষসূক্ত দেখ) মাত্র মায়া উপহিত ব্রহ্মরূপে জগতে প্রকাশিত। এই মায়ার গুণত্রয় হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি। ব্রহ্মই এই কর্ম্মের আধার ও যজ্ঞ রূপ কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা।

(১৬) প্রবর্ত্তিত চক্র—বেদ যজ্ঞ পূর্ব্বক ঈশ্বর প্রবর্ত্তিত জগৎ চক্র (শঙ্কর)। জীবের পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য প্রবর্ত্তিত কর্ম্মাদি চক্র (স্বামী)। ব্রহ্ম হইতে বেদের আবির্ভাব, তাহা হইতে কর্ম্মজ্ঞান ও তাহার অনুষ্ঠানে ধর্ম্মোৎপত্তি, তাহা হইতে পর্জ্জন্য, তাহা হইতে অন্ন, তাহা হইতে ভূতগণ, এবং পুনর্ব্বার ভূতগণ হইতে কর্ম্ম প্রবৃত্তি—এই পরমেশ্বর প্রবর্ত্তিত চক্র (মধুসূদন, বলদেব।) রামানুজ বলেন, "ভূতশরীর (ব্রহ্ম) হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য, পর্জ্জন্য হইতে অন্ন, অন্ন হইতে ভূতশরীর, পুনর্ব্বার ভূতশরীর হইতে কর্ম্ম ইত্যাদি—এইরূপ কার্য্য কারণ ভাবে জগতে কর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হয়।"

নহে অনুবর্ত্তী—কর্ম্ম যোগাধিকারী বা জ্ঞান যোগাধিকারী যে কেহ (রামানুজ)। যাহারা আত্মজ্ঞানী নহে কেবল তাহারা (শঙ্কর)। ইন্দ্রিয়নিরত বিশেষণ যখন এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে, তখন এই শ্লোক কেবল কর্ম্মাধিকারীকেই উপলক্ষিত হইয়াছে (মধুসূদন)। শ্রুতিতে আছে—এই জীবাত্মা সকল ভূতেরই লোক, অর্থাৎ সকলের জন্যই কার্য্য করিবে। সে যে হোম করে তাহাতে দেবলোকের কার্য্য হয়, যে উপদেশ দেয় তাহাতে ঋষিদের কার্য্য হয়, যে পুত্রোৎপাদন করে তাহা দ্বারা পিতৃলোক তৃপ্ত হয়। যে মনুষ্যদের বাস ও অন্ন দিয়া তাহাদের তৃপ্তি করে, তৃণ ও উদক দিয়া পশুদের তৃপ্তি করে ও শ্বাপদ বায়স পিপীলিকাকে আহার দিয়া তৃপ্ত করে। এই জন্য রামানুজের অর্থই অধিক সঙ্গত। পূর্ব্বে ১১ শ্লোকের টীকায় যে পঞ্চ যজ্ঞের কথা উল্লিখিত আছে, তাহা যে চিরদিনই আমাদের কর্ত্তব্য, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। তবে অন্য বেদোক্ত সকাম যজ্ঞ সম্বন্ধে মতান্তর হইতেপারে কিন্তু সে সকল যজ্ঞও নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য বোধে করা যাইতে পারে ও করা কর্ত্তব্য, তাহার কারণ পূর্ব্বোক্ত কয় শ্লোকে বুঝান হইয়াছে।

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

কার কথা শুনি?

কার্ত্তিক মাসের নব্যভারতে "হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্য" প্রবন্ধটী পাঠ করিলে মস্তকহীনের শিরঃপ্রদাহের গল্পটী মনে পড়ে। অগ্রে হিন্দুধর্ম্মটাই কি স্থির হউক, তৎপর তাহার প্রমাণ আলোচ্য। প্রতিপাদ্য বিষয়টা কি, প্রকাশ না করিয়া, প্রমাণ সংগ্রহ নিষ্ফল। খ্রীষ্টীয়ানগণ সহস্র দলে বিভক্ত হইলেও, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সংজ্ঞা নির্ণয় করা দুরূহ নয়। খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্বে এবং তাঁহার পুনরুত্থানে বিশ্বাসই খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম। প্রত্যেক খ্রীষ্টীয়ানের নিকট বাইবেল অভ্রান্ত শাস্ত্র, তাহার সকল কথাই সত্য এবং সকল আদেশই অবশ্য প্রতিপাল্য। মুসলমানগণ মহম্মদকে ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ এবং কোরাণ ঈশ্বরাদিষ্ট গ্রন্থ মনে করেন। ধার্ম্মিক মুসলমানগণ কোরাণ হইতে এক পদও অগ্রসর হইবেন না। হিন্দুর কি এমন কতকগুলি পুস্তক নাই, যাহাতে তাহার ধর্ম্মের সমস্ত তত্ত্ব নিহিত আছে? এই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময় অনেকে হয় ত এই প্রশ্নটী শুনিয়া হাস্য করিবেন। এক্ষণে ধর্ম্মের ঘোর আন্দোলনে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত; বক্তা প্রচারক উপদেশক পরিব্রাজকে দেশ প্লাবিত; সনাতন ধর্ম্মের মাহাত্ম্য পূর্ণ পুস্তকও যথেষ্ট প্রচারিত হইয়াছে। অথচ কোন খানিতেই উক্ত প্রশ্নের উত্তর

পাওয়া যায় না। পুনরুত্থিত হিন্দুধর্ম্ম বহু শাখায় বিভক্ত। কাহারও সহিত কাহারও মূল বিষয়েও মতের মিল নাই। সকলেই শাস্ত্রের দোহাই দেন, কাহার কোন্ শাস্ত্র তাহা কেহ বলেন না। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই "কলির বেদব্যাস" হইয়া স্বেচ্ছানুসারে শাস্ত্রের বিভাগ, ব্যাখ্যা এবং "প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের নির্দ্ধারণ" করিতেছেন।

বিবেকানন্দ একজন মহা হিন্দু। সুদূর আমেরিকায় হিন্দু-ধর্ম্মের বিজয় নিশান প্রোথিত করিয়াছেন; অথচ তাঁহার হিন্দুয়ানিটা কাশীর পণ্ডিতগণের মনঃপূত হইতেছে না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে আমেরিকায় হোটেল নিবাসী শূদ্র পরমহংসের হিন্দু-ধর্ম্ম গঙ্গাজলে রন্ধন করা নিষিদ্ধ মাংসের ন্যায়। Indian Nation ইণ্ডিয়ান নেসনের বিজ্ঞ সম্পাদক তাঁহার বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, স্বামিজী খ্রীষ্টের উপদেশগুলি হিন্দু ধর্ম্মের উপদেশরূপে প্রচার করিয়া আমেরিকাবাসিগণকে প্রতারিত করিতেছেন। একজন সংসারত্যাগী হিন্দু সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রবঞ্চনার অভিযোগ বড় সামান্য নয়। তাঁহার অনেক কথায় আমাদেরও বিশ্বাস হয় না। সম্প্রতি তিনি তাঁহার মাদ্রাজী বন্ধুগণকে লিখিয়াছেন, যে "It (*i. e.*, Vedas) was all in the *way* of *Bhoga* and no one ever contended that it could produce *mokha*" (Vide Hope of December 9, 1894.) অর্থাৎ বেদমার্গে মোক্ষ হয় না এবং হইতেও যে পারে, তাহাও কেহ কখন বলে নাই। আমাদের একটা ভ্রম ছিল যে, বেদ ব্রহ্মার মুখপদ্ম বিনিসৃত। অতএব ইহা হিন্দু মাত্রেরই পূজ্য। যে সকল দার্শনিকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, বেদের অভ্রান্ততা এবং অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিয়া হিন্দু সমাজে স্থান পাইয়াছিলেন। স্বামিজীর গীতায় প্রগাঢ় ভক্তি। গীতাকার একজন Liberal হিন্দু হইলেও বেদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

> কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং
> তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্।
> এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
> অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥

(অগ্নি হোত্রাদি) কর্ম্ম বেদ হইতে, বেদ ব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভব হইয়াছে, অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। যে লোক ইহলোকে বিষয়াসক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মাদি চক্রের (কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ঈশ্বরারাধনার) অনুবর্ত্তী না হয়, তাহার আয়ু পাপময় ও জীবন বৃথা। (গীতা ৩য় অধ্যায়ে ১৫।১৬ শ্লোক) অন্যত্র—

> সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ
> যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ (৪।৩০)

এই সকল যজ্ঞবেত্তা যজ্ঞ দ্বারা নিষ্পাপ হন। এবং যজ্ঞশেষরূপ অমৃত ভোজন করিয়া ব্রহ্ম সনাতনকে লাভ করে।

বিবেকানন্দের কলিকাতাস্থ সহযোগীবর্গও এক নূতন হিন্দুধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। শাস্ত্রে দশ অবতারের কথা উক্ত আছে। তন্মধ্যে নয়টী হইয়া গিয়াছে এবং বাকি আছেন কল্কী। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী নিবাসী ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংসই তাঁহাদের মতে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সৃজনকারী পূর্ণ ব্রহ্মের শেষ অবতার!!!

বাঙ্গালার (Sir Walter Scott) বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন বড় সাধারণ রকমের হিন্দু ছিলেন না। উপন্যাস লেখকের যিনি রাজা, কুহকিনী কল্পনা যাঁর চির সহচরী, একটা নূতন ধর্ম্ম সৃজন বা চার সহস্র বৎসরের এক জরাজীর্ণ ধর্ম্মের পঙ্কোদ্ধার

করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ। অসাধারণ প্রতিভাবলে লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারত এবং সুবিস্তীর্ণ পুরাণ রাশির ভিতর প্রচ্ছন্ন ভাবে লুক্কায়িত"প্রক্ষিপ্ত"শ্লোকসকল বাহির করিয়া দিয়াছেন। তিনি অগাধ শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শীতকালে কিঞ্চিৎ মদ্যপান করা দূষনীয় নয়। পরম বৈষ্ণবেও সকল প্রকার মাংসাহার করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ হইলেই যে ব্রাহ্মণ হইল, তাহা নয়। রামামুচির সন্তানও একজন সৎব্রাহ্মণ হইতে পারে; এবং আবশ্যক হইলে বোধ হয় শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মও তাহা দ্বারা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অনেকের সহিত তাঁহার এ সকল মত মিলে না বটে, কিন্তু ইহাকেই তিনি আদি ও অকৃত্রিম-হিন্দুধর্ম্ম বলেন।

মহাভারত হরিবংশ প্রভৃতি পুস্তকগুলি অনেক দিনের রচিত। এক্ষণকার মার্জ্জিত-রুচি যুবকযুবতীর চিত্ত রঞ্জনের উপযুক্ত নয়। তাহাতে কৃষ্ণ পীতধড়া পরিধান করিয়া অধিকাংশ দেহ উলঙ্গ রাখেন; লোকের বাড়ীতে যজ্ঞের সময় ব্রাহ্মণগণের পদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হন। মাঠে গরু চরান প্রভৃতি অনেক অনেক কুৎসিত কর্ম্ম সময় সময় তিনি করিয়া থাকেন। এমন মহাভারত একালে চলিতে পারে কি প্রকারে? কবিবর শ্রীনবীনচন্দ্র সেন সম্প্রতি সভ্য সমাজের উপযোগী এক নূতন মহাভারত রচনা করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের এক মহৎ অভাব দূর করিয়াছেন। তাহার দুই (part) রৈবতক এবং কুরুক্ষেত্র বাহির হইয়াছে। ইহাতে কৃষ্ণ (Prince Bismark) এর ন্যায় নিজের সুশোভিত মন্ত্রণাকক্ষে বসিয়া থাকিয়া গুপ্তচরের নিকট পররাষ্ট্রের গুহ্য সংবাদ শ্রবণ করেন। উত্তরা নভেলের (heroine) এর ন্যায় ছবি আঁকেন। অভিমন্যু (Poetry) লেখেন এবং মধ্যে মধ্যে স্বভাবের শোভা হেরিয়া আত্মহারা হন। সুভদ্রা (Sister of mercy) হইয়া কুরুক্ষেত্রের আহত সৈন্যগণের শুশ্রূষা করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ গৃহ বিবাদে আত্মবল ক্ষয় করিতেছে দেখিয়া, দুর্ব্বাসা অনার্য্য রাজ্য পুনঃসংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন ইত্যাদি। আবার এমন হিন্দুও আছেন যে, যাঁহার নিকট গোমেধ অশ্বমেধাদি যজ্ঞ হইতে ষষ্ঠী পূজা পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মই সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গ। নবমীতে অলাবু ভক্ষণ, হাঁচি-টিক্‌টিকিতে যাত্রা করিলে—এমন কি ষ্টারথিয়েটারে কীচকবধ অভিনয় বন্ধ হইলেও অনেকের সনাতন ধর্ম্মে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়।

বলা বাহুল্য, সকল দলই আপনাদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন এবং শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের মত সংস্থাপন, করেন। সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব কি এবং ইহার শাস্ত্রই বা কোন গুলি?—ভাবিয়াছিলাম "হিন্দু ধর্ম্মের প্রামাণ্যে" ইহার সদুত্তর পাইব। কিন্তু সমস্ত প্রবন্ধটী মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াও আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। এক স্থানে তিনি সনাতন ধর্ম্মের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে—"বেদ মতে শব্দের অর্থ নিয়ম। হিন্দুধর্ম্মে ধর্ম্ম শব্দ এই বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়। ধর্ম্ম সাংসারিক নিয়ম, আহারের নিয়ম, পারিবারিক নিয়ম—যে সমস্ত নিয়ম আত্মাকে পরমার্থ পথে নিয়োজিত, শাসিত ও উদ্বোধিত করে, সেই সমস্ত নিয়মই হিন্দু ধর্ম্ম। সর্ব্ব বিধায়ে ধর্ম্ম মনুষ্যকে নিয়মিত করে", অর্থাৎ যে সকল নিয়ম অবলম্বন করিলে মানবের ইহকালে উন্নতি এবং পরকালে অপবর্গ লাভ হয় তাহাই হিন্দু

ধর্ম্ম। তিনি আরও বলেন যে "যদি কোন ধর্ম্ম বাস্তবিক ধর্ম্ম নামের যোগ্য থাকে, তাহা সনাতন ধর্ম্ম"। এ কথা তাহার স্বধর্ম্মানুরাগের পরিচায়ক হইলেও তাহার সংজ্ঞানুসারে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ইংরাজ প্রভৃতি খ্রীষ্টীয়ানগণের অবস্থার সহিত আর্য্য-বংশাবতংসগণের তুলনা করিলেই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে নিয়মানুসারে আহার বিহার, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া তাহারা শৌর্য্যে বীর্য্যে সমস্ত জগতের মধ্যেশ্রেষ্ঠ, সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, এবং জ্ঞানের ভাণ্ডার হইতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা যে পরপদদলিত, অজ্ঞ, দরিদ্র জাতির সাংসারিক নিয়মাপেক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহা একজন অন্ধেও বলিতে পারে। মৃত্যুর পর কে ব্রহ্মলোকে অগ্রে গমন করিবে, তাহা বলা বড় সহজ নয়। কিন্তু যদি প্রগাঢ় স্বদেশানুরাগ, অকৃত্রিম স্বজাতি প্রেম, সমস্ত মানব জাতির প্রতি সার্ব্বভৌমিক প্রেম, জগতের উন্নতির জন্য আত্মোৎসর্গ যদি ইহলোকে স্বর্গের পরিচায়ক হয়, তবে খ্রীষ্টীয়ান দেশেই তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

পূর্ণ বাবুর সংজ্ঞানুসারে ত হিন্দু ধর্ম্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিলাম না। এখন দেখা যাউক, তাঁহার প্রমাণ গুলি কিরূপ? কিসের মকদ্দমা, না হয় নাই জানিলেন, সাক্ষিদের জবানবন্দি শুনিতে দোষ কি?

সনাতন ধর্ম্মের নাকি এমন সকল শক্ত শক্ত "প্রমাণ আছে যে, তাহার সহিত তুলনা করিলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রামাণ্য নগণ্য হইয়া পড়ে"। খ্রীষ্টীয় প্রমাণালোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। লেখক নিশ্চয়ই জানেন যে, ইউরোপে Straus, Renan, Mill ছাড়া পণ্ডিত এবং Huxley ভিন্ন বিজ্ঞানবিৎ অনেক সহস্র আছেন, যাঁহাদের উক্ত ধর্ম্মে অচলা ভক্তি। আর যে Huxley, Mill খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রমাণকেও উপহাস করেন; সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের মত কিরূপ, তাহা কি একবার ভাবিয়াছিলেন? সে যাহাই হউক, লেখকের মতে "হিন্দু ধর্ম্মের প্রামাণ্য" দ্বিবিধ, (১) স্বতঃ (internal), (২) পরতঃ (External)। হিন্দুধর্ম্মের পরতঃ প্রমাণ বুঝিতে হইলে লেখকের মতে এই সকল কথা অগ্রে জানা উচিত, যথা,—(১) হিন্দুধর্ম্মের দুই অঙ্গ, পৌরাণিক এবং বৈদিক। বেদেই হিন্দুধর্ম্ম; পৌরাণিক ধর্ম্ম সেই বেদের বিস্তৃতি মাত্র। (২) জনসমাজে জ্ঞানাধিকার বিভিন্ন বলিয়া সনাতন ধর্ম্ম এইরূপ দ্বিধা বিভক্ত। জ্ঞানিগণের জন্য যাহা প্রতিপাদ্য, অজ্ঞানীর কাছে তাহা অগ্রাহ্য। সকল অজ্ঞানীকে জ্ঞানী করা অসম্ভব। এজন্য হিন্দুধর্ম্ম নিজেই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অধিকার ভেদের উপযোগী হইয়াছে"। (হিন্দু ধর্ম্মের এটা মহা অনুগ্রহ বলিতে হইবে)। (৩) অজ্ঞানী সকল এক সম্প্রদায় ভুক্ত, কিন্তু "জ্ঞানিগণের অনেক দল আছে, যথা শাস্ত্র জ্ঞানী মুনি, ঋষি, মহর্ষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি" ইত্যাদি। এতগুলির মধ্যে কেবল মুনির Defination টা তিনি বলিয়া দিয়াছেন। "যে জ্ঞানীরা এক এক বিশেষ মত প্রচার করেন, তাঁহারাই মুনি"—কেন না বোধ হয়, নাসৌমুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং বলিয়া(৪)। "অদ্ভুত লীলা খ্রীষ্টধর্ম্মের ঈশ্বরত্বে প্রমাণ হিন্দু ধর্ম্মের নহে। হিন্দুধর্ম্মের লীলার প্রমাণ ঈশ্বর। শাস্ত্র প্রমাণ ঈশ্বরাবতার হিন্দুর বিশ্বাস্য। তাঁহার লীলা দেবলীলা। হিন্দু অগ্রে স্বীকার করেন যে, রাম, কৃষ্ণ, ভীম, যুধিষ্ঠির হনুমান প্রভৃতি দেবাবতার—তাহার পর কাজেই স্বীকার্য্য যে তাঁহাদের লীলা দেবলীলা বলিয়া অদ্ভুত এবং অলৌকিক।" এমন হিন্দুর বুদ্ধির প্রশংসা

কে না করিবে? বিশেষ হনুমান যখন তাহার দেবাবতার!

উল্লিখিত উদ্ধৃতাংশটী পাঠ করিলে এইরূপ বোধ হয় যে, হিন্দুধর্ম্মের বৈদিক ভাগ জ্ঞানিগণের জন্য, আর অজ্ঞানীর জন্য পৌরাণিক। বৈদিক ধর্ম্মই বা কি, পৌরাণিকই বা কি, তাহা তিনি কোথাও বিশদরূপে ব্যাখ্যা করেন নাই। * ভাবে বোধ হয়, লেখকের মতে "নিম্নাধিকার জ্ঞানী" হিন্দু সাকার সগুণ ঈশ্বরের উপাসক, আর, উচ্চাধিকার জ্ঞানী হিন্দু নির্গুণ ঈশ্বরের উপাসক। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে (১) নির্গুণ ঈশ্বর কি? (২) বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য নির্গুণ ঈশ্বর কি না? (৩) নিম্নাধিকার জ্ঞানী হিন্দুই বা কে উচ্চাধিকার জ্ঞানী হিন্দুই বা কে? (১) বঙ্কিম বাবু বলেন, দার্শনিকেরা নির্গুণ ঈশ্বর সম্বন্ধে গ্রন্থরচনা করিতে পারেন না বটে, কিন্তু তাহা আমাদের ন্যায় সাধারণ মানবের জ্ঞানের এবং কল্পনার অতীত।

(২) আর নির্গুণ ঈশ্বর যে বেদের প্রতিপাদ্য; বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের এবং Maxmuller এর গ্রন্থ পড়িলে ত বোধ হয় না। তবে লেখক বেদ শব্দটা বিস্তৃত অর্থে ব্যবহার করেন। রাম তাপনীয় উপনিষৎ, গোপাল তাপনীয় উপনিষৎও তাহার নিকট বেদ?

(৩) এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা পাতা ব্রহ্ম যে চিন্ময় অদ্বিতীয়, মায়াতীত এবং অশরীরী, তাহা পূর্ণ বাবুও স্বীকার করেন; কেন না, তাহার রামতাপনীয় উপনিষৎ নামক বেদেতেই আছে—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ"

তবে জ্ঞানী সেই নিরাকারের উপাসনা করুন, আর অজ্ঞানীরা সাকার দেবদেবীর উপাসনা করুন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। ঈশ্বর বিষয়ে জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীর প্রভেদ নির্ণয় করা সহজ নয়। ইংরাজী নবিশ বলেন, অনন্ত জ্ঞান সমুদ্রের নিকট মহা পণ্ডিতেরও জ্ঞান ক্ষুদ্রতম-বালুকাকণা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। তাঁহার নিকট সমস্ত মানবের হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন। ব্রহ্মের স্বরূপ কি, কোন্ মানব জানিতে পারে? কেনোপনিষতের এই কথাগুলি ত সকলেই জানেন।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদচ
যো নস্তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদচ
যস্যামতং তস্যমতং মতং যস্য ন বেদসঃ
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্।

কেনোপনিষৎকার নিশ্চয়ই একজন "উচ্চাধিকার জ্ঞানী হিন্দু"। অথচ তিনিই বলিতেছেন, "যিনি মনে করেন, ব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে জানিয়াছি, তিনি ব্রহ্মকে জানেন না" অর্থাৎ ব্রহ্ম অবিজ্ঞেয়; মানব তাহাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে না। "অসম্যগ্দর্শী নির্ব্বোধ লোকেরাই মনে করেন যে, তাঁহারা ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছেন"। আর ব্রহ্মের যে কিছুই জানা যায় না, তাহাও নয়। সকলেই কিছু কিছু জানিতে পারেন। সুতরাং ব্রহ্মের নিকট জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীর বিশেষ পার্থক্য নাই। সকলেই তাঁহার নিকট অজ্ঞানী। আর ব্রহ্ম যদি অশরীরীই হইলেন, তবে অজ্ঞানী তাঁহার রূপ কল্পনা করিবেন কেন? তাহাতে তাঁহার উপাসনার কি সহায়তা করিবে? ভগবান্ সত্যস্বরূপ। যাহা মিথ্যা তাহাই পাপ, মিথ্যা কল্পনায় পূর্ণ সত্যের

---

* এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন যে, "হিন্দুধর্ম্মের প্রতিপাদ্য নির্গুণ ঈশ্বর" আর "সগুণ ঈশ্বর নিম্নাধিকারীর উপাস্য।" হিন্দুধর্ম্মের প্রতিপাদ্য নির্গুণ ঈশ্বর, অতএব যাহাদের ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য সগুণ ঈশ্বর, তাহাদের ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্ম নয়, ইংরাজী ন্যায় শাস্ত্রের মতেও এইরূপ দাঁড়ায়।

কিরূপে সন্তোষ জন্মিবে ? কেহ কেহ বলেন, অজ্ঞানীরা নিরাকার ঈশ্বর মনে ধারণা করিতে পারে না। কোন্ জ্ঞানীই বা তাহা পারেন ? প্রহ্লাদ "সিদ্ধ পুরুষ" হইয়াও বলিয়াছিলেনঃ—

"নামরূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বেনোপলভ্যতে'

বিষ্ণুপুরাণ ১।১৯।৭৯

"ভগবানের নাম নাই, রূপ নাই. কেবল আছেন, এই মাত্র রূপে জানা যায়"। "তাঁহার অস্তিত্ব" ভিন্ন মহাপণ্ডিতেও তাঁহার বিষয় অধিক কিছু জানেন না। অতি মূর্খেও তাঁহার সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে সক্ষম। স্বয়ং শিব মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে বলিয়াছেন :—

স এক এব সদ্রূপঃ সত্যোঽদ্বিতীয়ঃ পরাৎপরঃ
স্ব প্রকাশঃ সদাপূর্ণঃ সচ্চিদানন্দ লক্ষণঃ
নির্ব্বিকারো নিরাধারো নির্ব্বিশেষো নিরাকুলঃ
গুণাতীত সর্ব্বসাক্ষি সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদৃগ্বিভুঃ।
সবেত্তি বিশ্বং সর্ব্বজ্ঞ স্তং ন জানাতি কশ্চন
তদধীনং জগৎ সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ২ ৩৪ পৃঃ

"সেই পরমেশ্বরই কেবল সৎ অর্থাৎ নিত্য এবং তিনিই কেবল একমাত্র সত্যবস্তু। তিনি অদ্বিতীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি স্বপ্রকাশ, সর্ব্বদা পূর্ণ অর্থাৎ অখণ্ড এবং সচ্চিদানন্দ লক্ষণ বিশিষ্ট। তিনি নির্ব্বিকার, তাহার কোন আধার নাই, তিনি ভেদ রহিত এবং আকুলতা শূন্য। তিনি শীতোষ্ণ সুখ দুঃখাদির অতীত, তিনি সকল কার্য্যের শুভাশুভ মাত্রেরই সাক্ষী। সকলের প্রাণ স্বরূপ, সকল পদার্থের অবলোকয়িতা এবং সকল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। তিনি সর্ব্বজ্ঞ কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানে না। এই সমস্ত জগতই তাঁহার অধীন, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।"

(হিন্দুশাস্ত্র, ৪৮ পৃঃ)

শিবও ভাবেন ঈশ্বর :—

লোকাতীতো লোক হেতুরবাঙ্মনসগোচরঃ।

ঈশ্বর বাক্য এবং মনের অগোচর। মানবের মন তাঁহার রূপ কি ধারণা করিতে পারে ? না তাঁহার সত্ত্বা ভিন্ন আর কিছু উপলব্ধি করিতে পারে ?

তর্কের জন্য না হয় স্বীকার করা গেল; জ্ঞানী হিন্দু ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারে। জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী দুইটা কি স্বতন্ত্র জীব ? সকলেই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষার তারতম্যানুসারেই লোকে জ্ঞানী এবং অজ্ঞানী হইয়া থাকে। অজ্ঞানী যদি ভ্রম বশতঃ মনে করেন, ঈশ্বরের দশটী হাত বা পাঁচটী মস্তক; জ্ঞানীর কি তাহার সেই ভ্রান্তি দূর করা উচিত নয় ? অজ্ঞানীর চক্ষে পৃথিবী সমতল বলিয়া বোধ হয়। জ্ঞানী কি তাহার জন্য বলিবেন—হাঁ পৃথিবী সমতল। এমন জ্ঞানাজ্ঞানের আমরা বিশেষ পক্ষপাতী নহি। "ঈশ্বর নিরাকার" এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা কি এতই দুরূহ ? খ্রীষ্টীয়ান, মুসলমান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীগণের সকলেই বুঝিতে পারেন। আর হিন্দুর "উচ্চাধিকারী জ্ঞানী" না হইলে পারেন না। হিন্দুর বোধশক্তি কি এতই দুর্ব্বল ? আর হিন্দুর মধ্যে "উচ্চাধিকারী জ্ঞানী"ই বা কে ? দেখিতে ত পাওয়া যায়, অতি মূর্খ শূদ্র হইতে হাইকোর্টের ব্রাহ্মণ বিচারপতি পর্য্যন্ত সকলেই ত মূর্ত্তি পূজা করেন। সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও তাঁহারা অদ্যাপিও প্রতিমা পূজা ত্যাগ করেন নাই। "প্রতিমা নিম্নাধিকারীর জন্য" এটা বোধ হয় কথার কথা। সাকার মূর্ত্তির পূজা করিতে করিতে ঈশ্বরের নিরাকারত্বে জ্ঞান জন্মে, ইহাও অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু তাহাই বা কিরূপে হইতে পারে ? "সাকার" এবং "নিরাকার" দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন শব্দ। একটীর সঙ্গে আর একটীর কোন সাদৃশ্য নাই। একের দ্বারা অপরটী কখনই জানা যাইতে পারে না। যিনি নদী হ্রদ প্রভৃতি কিছুই কখন দেখেন নাই, তিনি কি কখন পর্ব্বতের

রূপ ভাবিতে ভাবিতে মহাসমুদ্রের রূপ স্থির করিতে পারেন? সাদৃশ্য যুক্ত দুই পদার্থের মধ্যে তুলনা হইতে পারে, এবং একের দ্বারা অন্যের রূপ স্থির করা যায়। নিরাকার সাকারের কোন সাদৃশ্য নাই। সুতরাং একটী হইতে অপরটী স্থির করা যায় না। শত শত বিদ্বান্ বুদ্ধিমান হিন্দু ত আজন্ম ঠাকুরকে যথেষ্ট পরিমাণে ভিজা চাল খাওয়াইতেছেন, কই, এজীবনে ত তাহাদের ভ্রম ঘুচিল না! আর একটি বালককেও ঈশ্বরের যথার্থ তত্ব শিক্ষা দাও, অচিরাৎ সে বুঝিতে পারিবে।

"হিন্দু ধর্ম্মের প্রামাণ্য"টী পড়িলে লেখককে একজন সরল বিশ্বাসপ্রবণ লোক বলিয়া বোধ হয়। "সমস্ত পুরাণ একজনের লেখা" ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। বঙ্কিম বাবু বলেন -সমস্ত পুরাণ পড়িয়া যিনি বলিবেন ইহা একজনের লেখা, তাঁহার সহিত তর্ক করা বৃথা। তাঁহার প্রবন্ধের অনেক স্থলেই আমরা অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। যথা—"ব্যাস মহাভারত সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, তাহা কাব্য, কিন্তু নিম্নাধিকারী জ্ঞানী সমাজে তাহা ইতিহাস রূপে গৃহীত হইল।" নিম্নাধিকারী জ্ঞানীর এত বিদ্যা, তাহা ত আমরা জানিতাম না?

যে সকল যুক্তি দ্বার লেখক শব্দের নিত্যত্ব সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতে কলেজের ছাত্রেরাও হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। সংস্কৃত ন্যায়, দর্শন সকল পড়িলে এইরূপ জ্ঞান জন্মায় বলিয়া ভারতহিতৈষী মহাত্মা রামমোহন রায়, Lord Amherst কে সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে ইংরাজী পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দিতে অনুরোধ করেন। এতদুপলক্ষে লিখিত উক্ত মহাত্মার পত্রখানি আমরা প্রবন্ধ লেখককে পড়িতে অনুরোধ করি।

পূর্ণ বাবুর মতে "হিন্দু ধর্ম্মের প্রামাণ্য ত্রিবিধ।" পৌরাণিক, দার্শনিক এবং যোগসিদ্ধ। তিনি বলেন, যে সকল লোকে পৌরাণিক গল্পে বিশ্বাস করেন না, বা দার্শনিকগণের মীমাংসায় সন্তুষ্ট নন, "তাঁহাদের জন্য যোগ পথের প্রামাণ্য।" "এ প্রামাণ্য কাহারও অগ্রাহ্য হইতে পারে না"—অতি সরল লোক না হইলে একথা কেহ আজিকার দিনে বলিতে সাহসী হয় না। এখনকার "ইংরাজী শিক্ষায় বিকৃত মস্তিষ্ক" লোকের কেবল যে যোগে অবিশ্বাস, তাহাই নয়; তাঁহারা যৌগিক ক্রিয়া সম্বন্ধে বলেন "Conscientiously observed, they can only issue in folly and idiocy" এই সকল ঘোর পাষণ্ডদের দলনার্থ তাঁহার আর কোন প্রমাণ আছে কি? তিনি সকলকে যোগাভ্যাস করিয়া দেখিতে বলিয়াছেন। তিনি কি নিজে যোগ দ্বারা কোন নূতন তত্ব জানিতে পারিয়াছেন?

আমরা দেখিতেছি, হিন্দুধর্ম্মে অনেক "সন্ন্যাসী জুটিয়া গাজন নষ্ট" করিতে বসিয়াছে। কাজেই জিজ্ঞাসা করিতেছি, কাহার কথা শুনি? হিন্দু ধর্ম্মের মূলতত্ব গুলি কি? তাহার নির্ণয় করা হিন্দু মাত্রেরই কর্ত্তব্য হইয়াছে। হিন্দুর কোন্ গুলি শাস্ত্র? খ্রীষ্টীয়ানের বাইবেলের ন্যায় বা মুসলমানের কোরাণের ন্যায় হিন্দুর ধর্ম্মপুস্তক কোন্ গুলি, যাহাতে তাহার ধর্ম্মের সকল তত্বই নিহিত আছে? সংস্কৃতে লিখিত হইলেই বা পুরাণ উপনিষৎ নাম হইলেই কি শাস্ত্র হইল? উক্ত পুস্তক সকল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত। কাজেই তাহাদের মতের কোন মিল নাই। হিন্দুর শাস্ত্র কোন্ গুলি, তাহা জানিতে পারিলেও অন্ততঃ হিন্দুধর্ম্ম কি, কতকটা স্থির করা যায়।

শ্রী জয়গোপাল দে।

কৃষি কার্য্যের উন্নতি। (১১)

জীবিত অণুর ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া।

কৃষিকার্য্যের অনুকূল ও প্রতিকূল নানা জাতীয় জীবিত অণু, বায়ু, জল ও মৃত্তিকা মধ্যে সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকিয়া জগতের নানাপ্রকার আবশ্যক কার্য্য সাধন করিতেছে (১) ব্যাসিলাস্ টার্ডি ক্রেসেন্স (Bacillus tardecrescens) ব্যাসিলাস ফ্লুওরেসেন্স্ (Bacillus fluorescens) ব্যাক্টিরিয়াম্ ইউরিই (Bacterium Ureæ) ও মাইক্রোকক্কাস্ সিরিয়াস্ (Micrococcus Cereus) এই কয় প্রকার অণু মৃত্তিকা মধ্যে থাকিয়া জান্তব ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং এমোনিয়া ঘটিত যৌগিক পদার্থ সকল হইতে নাইট্রিক এসিড্ উৎপাদন করে। এই নাইট্রিক এসিড্ এবং ইহার সহিত মৃত্তিকাস্থিত চূর্ণ, পট্যাশ ও সোডা মিলিত হইয়া যে নাইট্রেট সকল উৎপন্ন হয়, ঐ সকল নাইট্রেট্ কৃষিকার্য্যের প্রধান সহায়। নাইট্রিক এসিড ও নাইট্রেট অবস্থাতেই উদ্ভিদগণ তাহাদিগের প্রধান আহার নাইট্রোজন (যবক্ষারযান) সংগ্রহ করিয়া থাকে। (২) শিম ও কলাই জাতীয় উদ্ভিদগণের Legaminous plants শিকড়ের সহিত সংলগ্ন হইয়া কতকগুলি অণু অবস্থান করে। ঐ সকল অণু বায়ু হইতে যবক্ষারযান আহরণ করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে এবং উক্ত উদ্ভিদের শিকড়ের সহবর্ত্তী নাইট্রেট সকল উৎপাদন করিয়া, উদ্ভিদের আহারের সুবিধা করিয়া দেয়। সাধারণতঃ বায়বীয় যবক্ষারযান উদ্ভিদগণ আহরণ করিতে অক্ষম। (৩) আবার এক জাতীয় অণু (Bacterium Denitrificano) উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী নাইট্রেট্‌গুলি নাইট্রাইট্ ও নাইট্রোজেনে পরিণত করিয়া কৃষিকার্য্যের প্রতিকূলাচরণ করিয়া থাকে। (৪) আর এক জাতীয় অণু (Micrococcus Ureæ) মূত্রের ইউরিয়া নামক অংশটীকে অ্যামোনিয়াম কার্ব্বনেটে পরিণত করিয়াও কৃষিকার্য্যের কিছু হানি করে। (৫) জল ও শর্করার সংযোগে টরুলা সেরিভিসিই (Torula Cerevisiæ) নামক অণু সুরা উৎপাদন করিয়া সংসারের নানাবিধ উপকার ও অপকার সাধন করিতেছে। (৬) সুরার সংযোগে ব্যাক্টিরিয়াম্ এসিটাই (Bacterium Aceti) নামক অণু শির্কা প্রস্তুত করে। এই শির্কা পচন কার্য্য নিবারণ জন্য বিশেষ উপকারী। (৭) ব্যাক্টিরিয়াম্ টার্ম্মো (Bacterium termo) নামক অণুর সহযোগে মাংস ও ব্যাসিলাস ফ্লুজিরির (Bacillus Pflugeri) সহযোগে মৎস্য পচিয়া গিয়া অখাদ্য হইয়া পড়ে। (৮) ব্যাসিলাস্ বিউটিরিকাস্ নামক অণুদ্বারা মাখন পচিয়া যায়। আবার এই অণুই পনির পাকাইবার উপাদান। এই অণুর প্রধান কার্য্য Butyric acid নামক অম্ল উৎপাদন করা। এই অম্ল জন্তুদিগের পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করে বলিয়া, এই অণুকে কৃষিকার্য্যের অনুকূল বলিয়াই গণ্য করা উচিত। (৯) ব্যাক্টিরিয়ম্ ল্যাক্টিস্ (Bacterium lactis) নামক অণু দুগ্ধ হইতে দধি উৎপাদন করিয়া মনুষ্যের উপকারে আইসে। (১০) নীলগাছ হইতে রং প্রস্তুত হইবার জন্যও এক জাতীয় ব্যাসিলাসের সহায়তা আবশ্যক। (১১) অণুগুলির আর আর প্রক্রিয়া অপেক্ষা ব্যাধি উৎপাদন প্রক্রিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। এই

সকল প্রক্রিয়ার সহিত কৃষকের সম্বন্ধ নিতান্ত ঘনিষ্ট। অণু সকল যে নিম্ন নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী ব্যাধির কারণ, তাহা স্থির হইয়াছে। মাইক্রোকক্কাস্ জাতীয় অণু দ্বারা এই কয়েকটী ব্যাধি জন্মে—এরিসিপেলাস্ (হঠাৎ মুখ ফুলিয়া সাংঘাতিক প্রদাহ উপস্থিত হওয়া); পীত জ্বর(Yellow fever); হাম; বসন্ত; মনুষ্য ও গবাদি জন্তুর ফুস্ফুসের প্রদাহ (Pneumonia), জলাতঙ্করোগ; হুপিংকফ্ নামক শিশুদিগের সংক্রামক কাশ রোগ; প্রমেহ; লোহিত জ্বর (Scarlatina); গ্যাংগ্রিন্ বা হাড় ও মাংস খসিয়া যাওয়া; রাইণ্ডার পেষ্ট নামক গো-মড়ক; গোরু ও মেষের 'ক্ষুরে' (Foot and mouth desease) নামক রোগ; সুতিকা জ্বর; এবং মুর্গির গুটী। ব্যাক্টিরিয়া জাতীয় অণু হইতে গোরু ও ঘোড়ার গলাফুলা রোগ জন্মে। ব্যাসিলাস জাতীয় কয়েক প্রকার অণু হইতে এই কয়েকটী ব্যাধি জন্মে—ডিপথিরিয়া (Diphtheria); শূকর জাতির জ্বর (Swine fever); টাইফয়েড্ জ্বর; ম্যালেরিয়া জ্বর; ঘোড়ার ও মেষের গ্ল্যাণ্ডাস্ ও ফার্সি নামক ক্ষত রোগ; (মনুষ্যেরও এই রোগ হইতে দেখা গিয়াছে); কুষ্ঠরোগ; উপদংশ; মনুষ্য ও জন্তুদিগের যক্ষাকাশ রোগ; গো-বসন্ত ও রেসমকীটের (কাল শিরা) রোগ; ওলাউঠা; ও ধনুষ্টঙ্কার। স্পাইরিল্লাম জাতীয় অণু হইতে পালাজ্বর (Relapsing fever অথবা Jungle fever) হয়। প্যান্হিষ্টোফাইটান্ জাতীয় অণু হইতে রেসম কীটের কটারোগ জন্মে। ওইডিয়াম্ আল্বিকান্স নামক্ অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের অণু সমষ্টি হইতে ঘোড়ার ক্ষুরে থ্রাশ (Thrush) নামক ব্যাধি জন্মে। বোট্রাইটিস্ ব্যাসিয়ানা ও ত্রোটাইটিস্ টেনেল্লা নামক দুইটী বৃহজ্জাতীয় অণুসমষ্টি হইতে রেসমকীটের 'চূণাকেটে' নামক রোগ জন্মে। এই সকল রোগের মধ্যে কয়েকটী একবার হইলে পুনরায় অনেক দিবস পর্য্যন্ত হয় না। ইহাদের জন্যই টিকার ব্যবস্থা হইয়াছে বা হওয়া সম্ভব। আর কতকগুলি রোগ একবার জন্মিলে পুনরায় জন্মিবার অথবা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইবার আরও অধিক সম্ভাবনা থাকে। এই সকল রোগের জন্য টিকার ব্যবস্থা হইতে পারে না। যে সকল রোগের টিকা ব্যবস্থা হইয়াছে অথবা হইতে পারে, তাহারা এই গুলি, যথা,—বসন্ত রোগ, পীতজ্বর, গোবসন্ত; মুর্গির গুটি; জলাতঙ্ক রোগ, শূকর জাতির সংক্রামক জ্বর; ওরাইণ্ডার পেষ্ট্ নামক গো-মরক; ডিপ্থিরিয়া; ম্যাণ্ডার্স ও ওলাউঠা যাহাদের জন্য টিকা ব্যবস্থা হইতে পারে না, তাহারা এই গুলি —যক্ষাকাশ; ফুস্ফুসের প্রদাহ (সংক্রামক নিউমোনিয়া); প্রমেহ; উপদংশ; এরিসেপেলাস্; ম্যালেরিয়া জ্বর; ও পালা জ্বর। যে সকল রোগের জন্য টিকা ব্যবস্থা হইতে পারে না, তাহাদিগের উপশম অথবা আরোগ্যের জন্য অণুনাশক পদার্থের ব্যবহারই একমাত্র উপায়। যে সকল রোগে টিকা প্রচলিত হইয়াছে, অথবা হওয়া সম্ভব, তাহাদিগের আরোগ্য অথবা উপশমের জন্যও অণুনাশক পদার্থ ব্যবহার করিয়া উপকার পাওয়া গিয়াছে। (১২) কৃষিজাত ওষধি সমুদায়ের "কুড়ে লাগা," "ধসা-ধরা" প্রভৃতি যে সকল রোগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা প্রায়ই অপেক্ষাকৃত বৃহজ্জাতীয় অণু ঘটিত। ইহারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, পেরনস্পোরিয়াম্, ফিউসিস্পোরিয়াম্, পেজিজা টিউবার সিনিয়া, পাকসিনিয়া, আইসেরিয়া ওরিডিয়াম্, ইসিডিয়াম্, মিস্রোমাইসিটি, ক্লাভিসেপ্স, টেলি

উটোস্পোরিয়াম্, ইউষ্টিলজিনাম্ ইত্যাদি। কৃষিজাত ওষধি সমস্তের ব্যাধি বিষয়ে এদেশে এখনও কোন অনুসন্ধান আরম্ভ হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিলাতে এই সকল ব্যাধির বিষয় আলোচনা অনেক অগ্রসর হইয়াছে। এ, বি, গ্রিফিথ্স্ সাহেব প্রণীত Diseases of crops, এবং ডব্লু, জি, স্মিথ্ সাহেব প্রণীত Diseases of Field and Garden crops; এই দুইখানি পুস্তক পাঠ করিলে বিলাতে কৃষিজাত ওষধি সকলের ব্যাধি সম্বন্ধে গবেষণা কিরূপে চলিতেছে, বুঝা যাইবে। এদেশে কয়েকটী ওষধির ব্যাধি বিলাতি ব্যাধির সহিত এক বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়াতে, এই কয়েকটীর বিশেষ বর্ণনা দেওয়া যাইতে পারে। আলুগাছ পচিয়া যাওয়া, গমের পাতা প্রথমে হরিদ্রা ও পরে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়া শস্য নিতান্ত অল্প হওয়া, এবং গমের ও অন্যান্য শস্যের 'শীষ্' কাল হইয়া শুকাইয়া যাওয়া, বিলাতে ও এদেশে একই রকমে ঘটিয়া থাকে, দেখা যায়। যে তিনটী আণুবীক্ষণিক উদ্ভিজ্জ হইতে এই তিনটী রোগ হইয়া থাকে, তাহারাও সম্ভবতঃ বিলাতের তুল্য রোগত্রয়ের কারণভূত, পেরনস্পোরা ইন্ফেস্টান্স (Peronspora Infestans) টিল্লেটিয়া কেরিস্ (Tilletia caries) ও ইউ-ষ্টিলাগো কার্ব্বো (Ustilago carbo), ভিন্ন আর কিছুই নহে। কৃষিজাত ওষধি সমস্তের আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ ঘটিত ব্যাধি নিবারণ জন্য শেষ অধ্যায়ে (ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যার নব্য-ভারতে) কতকগুলি সাধারণ নিয়ম দেওয়া হইয়াছে। এই সকল নিয়ম মৃত্তিকা ও বীজ শুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই প্রযুজ্য। মৃত্তিকা ও বীজের মধ্যে ব্যাধিজনক অণু সকল যদি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে গাছ জন্মিবার পরে ব্যাধি হওয়ার বিশেষ সম্ভব থাকিবে না। যদি পরেও গাছে অণুঘটিত ব্যাধি দেখা দেয়, তাহা হইলে কোন একটী তীব্র অণুনাশক পদার্থ শস্য ক্ষেত্রে সময়মত (অর্থাৎ ব্যাধি দেখা দিবা মাত্র) ছিটাইতে পারিলে, ব্যাধি কাটিয়া যাওয়া সম্ভব। তুঁতিয়া ও চূণ জলের সহিত (১০০ গুণ অথবা তদপেক্ষাও অধিক জল) মিশ্রিত করিয়া, "এক্লেয়ার ভেপোরাইজার" নামক কল দ্বারা ধূমাকারে ক্ষেত্রে ছিটাইয়া দেওয়াতে আলু গাছের ব্যাধি আরোগ্য হইয়াছে। অণুনাশক পদার্থ প্রয়োগ করিবার সময় ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এই সকল পদার্থ যেমন আণুবীক্ষণিক উদ্ভিজ্জ পদার্থ নষ্ট করিতে সক্ষম, সেইরূপ সাধারণ উদ্ভিদও উহারা নষ্ট করিতে সক্ষম। একারণ ব্যাধি উপস্থিত না হইলে গাছের উপর সামান্য পরিমাণেও এই সকল পদার্থ সেচন দ্বারা, গাছের ক্ষতি ভিন্ন উপকার হয় না। বীজের কথা স্বতন্ত্র। বীজের মধ্যে যখন কোন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় নাই, তখনই বীজকে তুঁতিয়ার জলে অথবা কর্পূরের জলে ডুবাইয়া লওয়া নিয়ম। এরূপ করাতে বীজের উপরিভাগে যে ব্যাধিজনক অণু থাকে তাহারা নষ্ট হয়। বীজের মধ্যে তুঁতিয়া অথবা কর্পূরের জল প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই ঐ জল শুকাইয়া লইবার নিয়ম স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। অধিকক্ষণ অণুনাশক পদার্থের মধ্যে থাকিয়া বীজও মরিয়া যায়। ইংলণ্ডের প্রধান বীজ বিক্রেতা সটন্ এণ্ড সান্স্ তাঁহাদের আলুর ক্ষেত্রে তুঁতিয়ার জল ও চূণ প্রয়োগ করিয়া, কোন উপকার না পাইয়া বরং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন; অর্থাৎ যে সকল ক্ষেত্রে এই পদার্থ দ্বয় প্রয়োগ করা হয় নাই, সেই সকল ক্ষেত্র হইতে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিক আলু পাইয়াছেন। ঔদ্ভিদিক প্রক্রিয়া

অল্প বিস্তর স্থগিদ বা নাশ করিয়াই, অণু নাশক পদার্থগুলি আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ সকলকে উচ্ছেদ করে। এই প্রক্রিয়ার নাশ দ্বারা বৃহজ্জাতীয় উদ্ভিদেরও ক্ষতি হয়; অর্থাৎ পাতা শুকাইয়া গাছের বৃদ্ধি কমিয়া গিয়া শস্য অল্প জন্মে। যখন ব্যাধি দেখা দিবে তখনই অণুনাশক পদার্থের ব্যবহার বিধেয়। তখন ব্যাধি দ্বারা সমস্ত শস্যই নষ্ট হওয়া সম্ভব বলিয়া অণুনাশক পদার্থের ব্যবহার দ্বারা আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদের নাশ করিয়া (অথচ তৎসহকারে ওষধিরও কিছু ক্ষতি করিয়া) কতক পরিমাণে শস্য সংগ্রহ হইতে পারে। প্রথমাবধি প্রতিবিধান চেষ্টা করিলে অণুজাত ব্যাধি শস্যের ক্ষতি না করিয়া রোধ করা যায়; কিন্তু ব্যাধি উপস্থিত হইলে ব্যাধি দ্বারা যে শস্যের কিছুই ক্ষতি হইবে না এবং শস্যের উপর ব্যাধি নাশক পদার্থ প্রয়োগের দ্বারাও যে শস্যের কিছুই ক্ষতি হইবে না, এরূপ হইতে পারে না। জন্তুদিগের অণুজাত ব্যাধি সম্বন্ধেও এই কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যে সকল পদার্থ দ্বারা অণু সকল নষ্ট হয়, তাহারা বিষময়, অর্থাৎ তাহারা জান্তবিক ও ঔদ্ভিদিক প্রক্রিয়া, কোন না কোন প্রকারে, অল্প বা অধিক পরিমাণে, স্থগিত বা নাশ করিতে সক্ষম। অণুনাশক পদার্থের যদৃচ্ছা ব্যবহার কখনই বিধেয় নহে। সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইলেই এই সকল পদার্থের ব্যবহার 'বিষস্য বিষমৌষধম' ভাবে চলিতে পারে। এ সকল পদার্থের নিত্য অথবা অপরিমেয় ব্যবহার দ্বারা ক্ষতি হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ সকলের যে কয়েকটী প্রধান প্রক্রিয়ার কথা বলা হইল, এ সকলের মধ্যে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে উপযোগী কয়েকটী বিষয়ের বিশেষ রূপ বর্ণনা করা যাইবে। পাস্তারি মতে টিকা দেওয়া এদেশে প্রচলিত হইলে, গো-বসন্তের হাত হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ গোরু রক্ষা পাইতে পারে, ইহা স্থির জানিয়া, এক্ষণে গো-বসন্ত সম্বন্ধেই কয়েকটী অধ্যায় সন্নিবিষ্ট করিবার মানস করিয়াছি।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। ইন্দুমতী—সামাজিক উপন্যাস। শ্রীযশোদালাল তালুকদার প্রণীত, এবং ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, মূল্য ১৲ টাকা। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের একখানি সার্টিফিকেট পুস্তকের প্রথমেই গ্রথিত হইয়াছে। এইরূপ সার্টিফিকেট প্রথার আমরা বড় পক্ষপাতী নহি। সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—"স্নেহের চক্ষে সকলই ভাল,—সুতরাং ইন্দুমতীও ভাল লাগিয়াছে।" সমালোচকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কিন্তু বইখানা ভাল লাগিল না। ভাষায় সরলতা এবং মাধুর্য্য যথেষ্ট আছে; স্থানে স্থানে ভাষা এবং কবিত্বের প্রীতিকর সমাবেশও হইয়াছে; কিন্তু উপন্যাস অংশে 'ইন্দুমতী' নিম্নশ্রেণীর পুস্তক হইয়াছে।

২। দেবী না মানবী—উপন্যাস।

শ্রীশ্যামলাল মজুমদার প্রণীত; মূল্য ॥০। লেখক ইন্দুমতী দ্বারা একটী প্রকৃত দেবী চরিত্র পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। উদ্দেশ্যটী ভাল; আংশিক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়,চরিত্রটী সম্যকরূপে প্রস্ফুটিত হয় নাই। কেমন একটু অসংলগ্ন, হঠাৎ পূর্ণতা প্রাপ্ত ভাবে দাঁড় করাইয়া, এই অতি সুন্দর চরিত্রটীর প্রভাব কিছু কমাইয়া ফেলিয়াছেন। লেখকের হৃদয়ের ভাব উচ্চ; ভাষাও অনেক স্থানে তদুপযোগী হইয়াছে।

৩, ৪। চরিতমালা—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ; শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত; ইংরাজি সংস্কৃত যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ।০ এবং ।৵০। Example is better than precept একটী অতি পুরাতন প্রবাদ,একটী প্রকৃত মহৎ লোকের জীবনের সদা প্রভাব এবং জীবন্ত দীপ্তি যেরূপ অনায়াসেই চতুর্দ্দিকে সংক্রামিত হয়,জীবনশূন্য অগভীর শত মৌখিক উপদেশেও তাদৃশ হয় না। জীবনচরিতের প্রধান উদ্দেশ্য—সমাজের এই অশেষ কল্যাণদায়িনী শক্তিকে জাগ্রত এবং স্থায়ীরূপে রক্ষা করা। জীবনচরিত যখন বিদ্যালয়ে অধীত হয়, তখন এই শক্তি শিক্ষার্থীদিগের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। চরিতমালার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে বর্ণিত চরিত্রগুলির প্রায় সমস্তই বঙ্গদেশবাসীর। বাল্যকালে সুদূর ইউরোপ এবং মার্কিন দেশীয় চরিতাখ্যায়িকা পাঠ করিয়া একটা ভাসা ভাসা স্বপ্ন কিম্বা উপন্যাস-সুলভ ভাবের উদ্রেক হইত। স্বতন্ত্র জলবায়ুপরিপুষ্ট দুরদেশবাসীর চরিত্র-দৃষ্টান্ত যেন ব্যবহারিক জীবনে বিশেষ কার্য্যকর হইত না। কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয় দেখাইয়াছেন, আমাদেরই মধ্য হইতে, অতি সামান্য অবস্থার ভিতর দিয়া, যত্ন এবং অধ্যবসায়শীল মনস্বীগণ কি প্রকারে আপনাদিগকে উন্নত করিয়াছেন এবং দেশের ও সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। চরিতমালার ভাষা সরল এবং মধুর।

৫। কুম্ভমেলা—শ্রীমনোরঞ্জন গুহ প্রণীত; কলিকাতা শুক্রপ্রেস। গত বৎসর কুম্ভমেলা দর্শনে লেখকের মনে যে সমুদয় ভাবের উদয় হইয়াছিল, প্রধানতঃ তাহা লইয়াই এই ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিত। "নিবেদনে" লিখিয়াছেন—"এই গ্রন্থ কুম্ভমেলার প্রকৃত ইতিহাস নহে। * * * অনেকে বলিয়াছেন, কেবল গুণের কথাই বলা হইয়াছে, দোষের কথা কি কিছু নাই? * * * আমার নিবেদন, আমি সমালোচনার জন্ম কিছু লিখি নাই"। এই ভূমিকার পর আমাদের কিছু বলা শোভা পায় না।

৬। মৌন-মুখরা—The Silent Preacher কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রণীত; মূল ৵০। কয়েকটী নীতিপূর্ণ উপদেশ লইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। অতি সামান্য বিষয় হইতে আমরা কিরূপে কবিত্বপূর্ণ সুন্দর "নীতিচয়ন" করিতে পারি, কবিরাজ মহাশয় পরিষ্কার রূপে দেখাইয়াছেন।

৭। ব্রহ্মসঙ্গীতাবলী—চন্দন নগর নববিধান ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত; তারা যন্ত্র; মূল্য ।০। তালসমন্বিত রাগিণীই সঙ্গীতের প্রাণ; এই প্রাণশূন্য সঙ্গীত কবিতা মাত্র। ব্রহ্মসঙ্গীতাবলী আধ্যাত্মিক কবিত্বে পরিপূর্ণ। ভক্তের প্রেমবিহ্বল কণ্ঠে প্রাণ প্রতিষ্ঠা পাইয়া যখন ইহারা মূর্ত্তিমান হয়, তখনই ইহাদের শক্তি এবং মাধুর্য্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয়। কতকগুলি সাম্প্রদায়িক সঙ্গীত ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা সাধারণের নিকট প্রীতিকর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

৮। হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন ও সংস্কার—শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত; কুমারহট্টস্থ পুর্ণিমা ব্রত সমিতি দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ৵০। এই প্রবন্ধটী পূর্ব্বে নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সমাজ-সংস্কারকদিগকে একবার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

৯। নির্ম্মলা—উপন্যাস, শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল প্রণীত, সাবিত্রী যন্ত্র, মূল্য ১৲। কৌলিন্য প্রথার মর্ম্মভেদী দৃশ্যের একটী দিক্ ইহাতে

বেশ দেখান হইয়াছে। নির্ম্মলার চরিত্রে লেখকের চরিত্রনির্ম্মাণের বিশেষ নিপুণতা প্রকাশ পাইয়াছে; এই দেবী-চরিত্র সৃজন করিয়া গ্রন্থকার বাস্তবিকই সমাজের একটা বিশেষ উপকার করিয়াছেন। নির্ম্মলা প্রকৃতই দেবী; আশা করি, ইহার ভক্তিপূর্ণ মধুর আশ্বাসবারি সিঞ্চনে, বঙ্গের অনেক বিষাদময় ভগ্নহৃদয়ের তরুণ ক্ষতে শান্তিধারা বর্ষিত হইবে। মৃগেন্দ্রবালার ভয়ঙ্কর চরিত্র একটু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। বিমলানন্দের চরিত্র, স্থানে স্থানে অস্বাভাবিক হইলেও, মোটের উপর বেশ হইয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য অতি মহৎ, রুচি মার্জ্জিত এবং ভাষা মধুর।

১০। কৃষি ক্ষেত্র—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে, Fellow of the Royal Horticultural Society of London &c.—প্রণীত Elysium Press মূল্য ১৲। জীবিকা প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন এবং আবশ্যকীয় দ্রব্যজাত পূর্ব্বাপেক্ষা মহার্ঘ হওয়াতে, আজ কাল আমাদের দেশের মধ্যবিৎ শ্রেণীর লোকের "মান বাঁচান দায়" হইয়া পড়িয়াছে। এই মধ্যবিৎ শ্রেণীকেই এখনকার "শিক্ষিত বাঙ্গালী" বলা যাইতে পারে। অনেকে উপহাস করিয়া ইহাদিগকে "চাকুরিপ্রিয়" বলিয়া থাকেন। শরীরধারী জীবের "আহার-প্রিয়তা" ইত্যাদি বিশেষ উপহাসের বিষয় মনে করি না। রোগীকে "শয়নপ্রিয়" না বলিয়া রোগ মুক্তির উপায় দেখাইয়া দেওয়াই প্রকৃত হিতৈষীর কার্য্য। প্রবোধ বাবু "কৃষি ক্ষেত্র" দ্বারা অন্নচিন্তা-বিহ্বল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জীবিকা সমস্যার একটী সহজ মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, ভাষার প্রতি গ্রন্থকার বিশেষ দৃষ্টি রাখেন নাই, এজন্য বহুল ভুল ভ্রান্তি রহিয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে এইসব সংশোধিত হইবে আশা করি।

১১। জীবন সন্দর্ভ—ভিক্টোরিয়া প্রেস। মূল্য ।৵০, গ্রন্থকারের নাম নাই। ভূমিকায় আছে, "প্রবন্ধ গুলির অধিকাংশই জীবনগত বা পরীক্ষিত ঘটনা সূত্রে আমার মনোমধ্যে সময়ে সময়ে উদ্ভাসিত হয়।" প্রবন্ধগুলি ভগবদ্ভক্তিমূলক; ইহা পাঠে সক-লেই উপকৃত হইবেন।

১২। গুরু ও সাধন তত্ত্ব—শ্রীকালীনাথ দত্ত প্রণীত; কালিকাপ্রেস। কালীনাথ বাবু যেমন একজন ভগবদ্ভক্ত এবং চরিত্রবান ব্যক্তি, তেমনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক। এই পুস্তকে ৬টী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; ইহার ৫টীই নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ কয়টী লেখকের চিন্তাশী-লতা এবং পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় দেয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহাতে কেবল একদিকে-রই যুক্তি এবং মত প্রদর্শিত হইয়াছে, মতা-মতের নিরপেক্ষ আলোচনা হইয়াছে বলা যায় না। যে সকল মত অতি প্রাচীনত্বের পঙ্কিল জঞ্জালে পরিপূর্ণ, নবীন যুগের এই প্রখরদীপ্তির দিনে, সে সকল লইয়া আলোচনা করা, কালীনাথ বাবুর ন্যায় বিজ্ঞ ভক্তের পক্ষে কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, বুঝিতে পারি না। যাহা হইবার নয়, তাহা করিবার চেষ্টা কখনই সুফল প্রসব করিবে না। আত্মা ও পরমাত্মার সাক্ষাৎ যোগ সংস্থাপনের যুগে এ সকল কথা সর্ব্বত্র আদৃত হইবে, আশা করি না।

১৩। ফুলশয্যা—বিয়োগান্ত দৃশ্য কাব্য, শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য, এম, এ, প্রণীত; শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲। ধর্ম্মপ্রাণ রাজপুত বীরের অদ্ভুত স্বদেশপ্রেম এবং অতুলনীয় বীরত্বের কাহিনী শুনিলে স্বভাবতঃই হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে। পাঠানরাজ লালাখাঁর হস্ত হইতে তুরা রাজ্যের পুনরুদ্ধার এই দৃশ্যকাব্যের বর্ণিত বিষয়। দুঃখের বিষয়, গ্রন্থকার এই অসাধারণ স্বার্থত্যাগ এবং বীরত্বপূর্ণ ঘটনাটীর সমুচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। গ্রন্থ-কারের আত্ম-সংগোপন দৃশ্য-কাব্যের একটী প্রধান ভূষণ; ক্ষীরোদ বাবু ইহাতে বিশেষ কর্ত্তৃত্ব দেখাইতে পারেন নাই; ছন্দ মিলন এবং শব্দবিন্যাসও তাদৃশ প্রীতিকর হয় নাই। চরিত্রাঙ্কনে গ্রন্থকার বিশেষ নিপুণতা দেখা-

ইয়াছেন। দুই এক স্থানে পত্রাচ্ছাদিত কুসুমের ন্যায়,সুন্দর কবিত্ব বিকশিত হইয়া, বইখানির অতুল শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে।

১৪। চিত্র ও কাব্য—শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত; আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস্; মূল্য ১৲। চিত্র এবং কাব্য সম্বন্ধে কয়েকটী সুন্দর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ লইয়া এই পুস্তকখানি রচিত। ইহাদের সমস্তই গত তিন বৎসর সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার সংস্কৃত কাব্যাদি অধ্যয়নের ফল স্বরূপ যে কয়টী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই উপাদেয় হইয়াছে। ভাষা পরিপাটী।

১৫। আহুতি—জীবন সঙ্গীত। গায়কের নাম নাই। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-পূর্ণ কতকগুলি সুন্দর সুন্দর কবিতা। এই অজ্ঞাত কবির ভাষার মাধুর্য্যময় সরলতা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ভাবের অভিব্যক্তি ভাষাতে, এই ভাষার মধ্য দিয়া কবির হৃদয়ান্তঃপুরের রাস্তা। প্রবেশ-দ্বারের সৌন্দর্য্য-ছটায় দর্শকের মনকে নরম করিয়া দেওয়া, অল্প নিপুণতার পরিচায়ক নহে। তার পর ভিতরের কথা; এখানেও মৌলিকতা-পরিশূন্য কেবল "True copy"র ছড়াছড়ি নহে; সুস্নিগ্ধ অভিনবত্বও যথেষ্ট আছে।

১৬। প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি—'আসাম প্রবাসী' প্রণীত। শিলং সাহিত্য-সভা হইতে প্রকাশিত। ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধই পূর্ব্বে নবজীবন, নব্যভারত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে,সুতরাং পাঠকের নিকট তাহার নূতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। গ্রন্থকারের সকল প্রবন্ধেই আসামের বিবরণ সুন্দররূপে বিবৃত, কেবল তাঁহার বন্ধুর "মণিপুর যাত্রীর দিনলিপি"তে মণিপুরের মণিহরণ অর্থাৎ স্বাধীনতা হরণ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভুক্তিভুকের ধৃত লেখনীতে যাহা সম্ভব,দিন লিপিতে তাহাই দেখিলাম।

১৭। ইহকাল ও পরকাল—শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা প্রণীত; মূল্য ১৲। এই সুন্দর পুস্তকখানির বিস্তৃত সমালোচনা পরে করিব।

১৮। হাসি ও খেলা—জ্ঞানমুকুল প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত, মূল্য ৷৷৵৹। এ পৃথিবীতে বালকবালিকার জন্য কিছু লেখার ন্যায় শক্ত কাজ আর কিছুই নাই। অতি অল্প ব্যক্তিই এই পবিত্র কাজে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন, আমাদের দেশে, এ পথের প্রধান নেতা ৺প্রমদাচরণ সেন। প্রমদাচরণ সচিত্র সখা সম্পাদন কার্য্যে কৃতিত্ব দেখাইয়া এদেশে অমর হইয়াছেন। বঙ্গের যে পরিবার বাঙ্গলা-সাহিত্য-জগতের প্রদীপ্ত রশ্মিস্বরূপ,সে পরিবারও বালক বালিকার শিক্ষার উপযোগী, পত্রিকাপ্রকাশে তাদৃশ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। বাবু যোগীন্দ্রনাথ নব উৎসাহে, এই গুরুতর, এই অতি পবিত্র কাজে মনোনিবেশ করিয়া সর্ব্ব সাধারণের যে বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাঁহাকে এই কাজের বিশেষ উপযোগী বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে। প্রবীণত্বের গাম্ভীর্য্যে যখন এই নবীন লেখকের লেখনী সংযত হইবে, এবং ভাবের সহিত মতের, মতের সহিত ভাষার সমন্বয় হইবে, তখন এই লেখক অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন বলিয়া বিশ্বাস করি। তৎপূর্ব্বে কঠোর সাধনায়, কৃতকার্য্যতার গরিমা-পরিবর্জ্জনের নির্ম্মম সংযমে এই নবীন লেখকের সিদ্ধি লাভের একান্ত প্রয়োজন। কেন না,এই স্থলেই বহু সাহিত্য-সেবীর অকাল মৃত্যু ঘটে। হাসি ও খেলা, এদেশে অভিনব পুস্তক;—সখা,বালক ও সাথীর অভিব্যক্তি। ইহাতে সোজা ভাষায় অনেক ভাল কথা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। চিত্রগুলি অতি চিত্তাকর্ষক। ছাপা পরিপাটী। তবে পশু পক্ষী মানুষের ন্যায় কথা বলিতেছে, এরূপ শিক্ষায় বালক বালিকারা মিথ্যা কথা বলিতে শিখে কি না,আমাদের সন্দেহ আছে। গ্রন্থকার পাশ্চাত্য জগতের অবশ্য পদানুসরণ করিয়াছেন,কিন্তু তাহা সঙ্গত কি না,বিবেচনা করা উচিত। সরল করিয়া ভাল কথা শিখাইবার আর কি কোন উপায় নাই? যাহা বিরুদ্ধে বলিবার বলিয়াছি। এ পুস্তকে গুণের ভাগ অনেক বেশী। মোটের উপর পুস্তকখানি সুন্দর হইয়াছে। সর্ব্বত্র আদৃত হইবে,

আশা করি। মূল্য আর কিছু কম হইলে ভাল হয়। পারিতোষিকের পক্ষে ইহা অতি সুন্দর পুস্তক।

১৯। পরিমল—শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৷০। এই গীতিকবিতা পুস্তকখানি বিশেষ যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছি। কাব্যকাননে অনেক ফুল ফুটে, অনেক ফুল শুকায়, পরিমল থাকে অতি অল্প ফুলে; সৌন্দর্য্য ফুল মাত্রেরই চিরসঞ্চিত ধন, তাহাও কাব্যকাননের অতি অল্প ফুলে শোভা পায়। অন্য দেশের কথা বলিতেছি না, বঙ্গদেশের কথাই বলিতেছি। এই গীতিকবিতার সকল গুলিতেই যে পরিমল পাইলাম, তাহা বলি না, তবে, কবির উপকার, সংসার, লর্ড টেনিসন, প্রত্যাখ্যানে প্রভৃতি কবিতায় যে পরিমল পাইলাম, তাহা বঙ্গের যে কোন কবির যোগ্য। এই নবীন কবি, প্রেমিক, ভাবুক, চিন্তাশীল এবং সুনীতির পক্ষপাতী। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত রূপে প্রতিভার বিকাশ হইলে, তাঁহার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যকানন সুকোমল পুষ্পরাশির বিশুদ্ধ পরিমলে পরিপূর্ণ হইবে, কবিকে আমরা সাদরে অভিবাদন করিতেছি।

২০। সুহৃল্লিপি—শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এ লিপি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত, কিন্তু ইহাতে লিপিচাতুর্য্য কিছুই নাই।

২১। মনোরমা (উপন্যাস)—শ্রীকুমার কৃষ্ণ মিত্র প্রণীত। ইহাও আমাদের নিকট মনোরম বোধ হইল না।

২২।২৩। দারোগার দপ্তর—প্রমদা —দুই দারোগা—শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা ভাল, পড়িতে বেশ আগ্রহ জন্মে, কিন্তু 'দুই দারোগা' পড়িয়া তেমন সুখী হইলাম না।

২৪। প্রহ্লাদ—মূল্য ।০ আনা। (উপন্যাসচ্ছলে ধর্ম্মপ্রচার আর্য্যদর্শন সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্‌, এ বিরচিত। ভাগবতোক্ত প্রহ্লাদের পবিত্র চরিত্র বঙ্গবাসীর অপরিজ্ঞাত নহে। নূতন ধরণে, নূতন রকমে বিদ্যাভূষণ মহাশয়, উপন্যাস রূপে প্রহ্লাদচরিত্র প্রচারিত করিয়া, দেশের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। আমরা আশা করি, বঙ্গবাসী নরনারী তাঁহার এই 'প্রহ্লাদ' পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন। গ্রন্থের প্রথমে ধ্যানমগ্ন অঞ্জলিবদ্ধ প্রহ্লাদের ছবি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর। প্রিয় গোপাল বাবুর বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি অতি সুন্দর হইয়াছিল, এখানিও তদ্রূপ হইয়াছে।

২৫। শরীর ব্যবচ্ছেদ ও শরীর-তত্ত্ব-সার;—নিদান-তত্ত্ব, চিকিৎসা-তত্ত্ব, রোগ নির্ণয়-তত্ত্ব প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র (এম, আর, সি, পি, লণ্ডন) সঙ্কলিত, মূল্য ৩৷৵০। শরীর ব্যবচ্ছেদে (Dissection) পারদর্শিতা না জন্মিলে শরীর-তত্ত্ব (Anatomy) শিক্ষা করা যায় না। বাঙ্গলা ভাষায় ইংরাজি এনাটমির অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, বটে কিন্তু ব্যবচ্ছেদ-তত্ত্ব এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই; এজন্য মেডিকেল স্কুল সমূহের ছাত্রগণের যার পর নাই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। উৎকৃষ্ট চিত্রপটে ইংরাজী এনাটমি শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালা ভাষায় আজও সেরূপ চিত্রপট প্রস্তুত হয় নাই। বাঙ্গালা এনাটমিতে যে চিত্র সংন্যস্ত হইয়াছে, তাহাও তাদৃশ সুন্দর নহে। এইজন্য, শরীর-ব্যবচ্ছেদ পক্ষে, বাঙ্গালা ভাষায় শরীরতত্ত্ব শিক্ষার্থীগণের বড়ই অসুবিধা ছিল। বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়, সুযোগ্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের চেষ্টায় সে অসুবিধা বিদূরিত হইল। ইনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিলাতে গমন করেন এবং সেখানে এম, আর, সি, পি উপাধিতে ভূষিত হন। ইনি একজন বিচক্ষণ শরীর-তত্ত্ব-বিদ পণ্ডিত। বাঙ্গালা ভাষায় ইঁহার প্রভূত ক্ষমতা থাকায় পুস্তকখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। আশা-করি, ছাত্রগণের নিকট এ পুস্তক বিশেষ রূপ আদৃত হইবে। যেরূপ উৎকৃষ্ট প্রণালীতে পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে, ব্যবচ্ছেদকারী দিগের বিশেষ সহায়তা করিবে, মনে হয়। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যার পর নাই সুখী হইয়াছি।

সঞ্জীবনী।

কবি তাঁহার 'হেলেনা কাব্য' ও 'মিত্রকাব্যের' দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত। পূর্ব্বোক্ত কাব্য দুখানি তাঁহার নবীন বয়সের উদ্যম, ভারত-মঙ্গল তাঁহার পরিণত বয়স ও অভিজ্ঞতার ফল। * * *

স্থূলের উপরে সূক্ষ্মকে প্রতিষ্ঠিত করা, পৌরাণিক আখ্যায়িকার বিশাল সৌধের উপরে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও প্রেমতত্ত্ব প্রভৃতি অধ্যাত্ম মণিমাণিক্য ও প্রস্তর খচিত করাই, এদেশের চিরন্তন প্রথা। ভারত-মঙ্গলের কবি প্রচলিত প্রথা অতিক্রম করিয়া এক অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। এই নবাবলম্বিত প্রণালী সূক্ষ্মের স্থূলবৎ প্রকাশ। সূক্ষ্ম যাহা, জ্ঞানের মীমাংসা যাহা, তাহাই কবির ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রভাবে কল্পনার নাতিস্থূলসূক্ষ্ম আবরণে আবৃত। গোধূলির আলোর ন্যায় আবৃত তত্ত্বের রশ্মি ইহাতে অল্প অল্প দেখা দিয়া আবার কল্পনার সান্ধ্য অন্ধকারে বিলীন প্রায়! অধ্যাত্মতত্ত্ব ভারতমঙ্গলে উপদেশের আকারে নয়,—উপাখ্যানরূপে বিবৃত। এই প্রণালী অভিনব হইলেও কবি হইতে আশ্চর্য্য কাব্যকুশলতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞানচন্দ্র, ভাবদেব, ইচ্ছাদেবী, ধর্ম্মরাজ, সাধনা, প্রীতি, পবিত্রতা প্রভৃতি যে অধ্যাত্মতত্ত্ব, আমরা "ভারতমঙ্গল" পড়িতে পড়িতে একথা ভুলিয়া যাই, মনে হয় যেন স্থূল নায়ক নায়িকাই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত।

ভারতমঙ্গল অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। এই ছন্দ, কবিবর মধুসূদনের প্রতিভা-প্রভাবেই বঙ্গভাষায় প্রবর্ত্তিত। ভারতমঙ্গলের কবির হাতে এই ছন্দ বেশ ফুটিয়াছে। "ভারতমঙ্গলের" ভাষা সম্পূর্ণ মুক্ত অথচ ওজস্বী। গ্রন্থারম্ভে দেব ও কবি বন্দনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। * * *
কেমন ওজস্বী অথচ কেমন সুখপাঠ্য! অনেকেই মাইকেলের অনুকরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য বা কাব্যাংশ লিখিয়াছেন, কিন্তু অনুকৃতের সুখপাঠ্যতা অনুকরণে প্রায় লক্ষিত হয় না। ভারতমঙ্গলের কবি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ কৃত-কার্য্য হইয়াছেন।

কাব্যের উৎকর্ষের পক্ষে যেমন কল্পনা, তেমনই মানবচরিত্র ও জগতের অভিজ্ঞতা অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়। কবি তাঁহার ভারতমঙ্গলে এ দুয়ের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। দূর হইতে পৃথিবীদর্শন বর্ণনা করিতে যাইয়া, তিনি যে কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠকগণ দেখিয়া মোহিত হইবেন।

নূতন তত্ত্বের উদ্ভাবন বা আবিষ্কার কবির কর্ম্ম নহে। উদ্ভাবিত বা আবিষ্কৃত তত্ত্ব সকলের মধুর সমাবেশই তাঁহার কাজ। যদি তাহাই হয়, তবে কবি

কৃতকর্ম্ম সন্দেহ নাই। যুগধর্ম্মের অভ্যুদয়ে যে সকল নূতন তত্ত্ব, নূতন আদর্শ প্রকাশিত হইয়া সমাজকে আন্দোলিত করিতেছে, তিনি কল্পনার সাহায্যে সে সকলের সমাবেশে ভারত-মঙ্গলে সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন। বিদ্যুৎ মেঘে ছিল, কল্পনাকৌশলে মূর্ত্ত হইয়া দীপাবলীরূপে কবির কাব্য-নাট্যশালা সমুজ্জ্বল করিয়াছে। তাঁহার বর্ণিত রূপতত্ত্ব, প্রার্থনাতত্ত্ব, গভীরতা পূর্ণ। রূপতত্ত্ব বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি বলিতেছেন,—* * দেবদূত, দেবদূতীর মুখ হইতে কবি যে নিষ্কাম প্রার্থনা নির্গত করিয়াছেন, তাহা এত মনোমুগ্ধকর যে, আমরা পাঠকদিগকে উপহার না দিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না। * *

সময়।

বহু দিন হইল মাইকেলের অমিত্রাক্ষরের অমৃতময়ী বীণা নীরব হইয়াছে। অনেকেই দুঃখ করিয়া বলিয়া থাকেন, "সেই সুললিত বিহঙ্গকাকলি, গভীর মেঘগর্জ্জন এবং প্রচণ্ড দুন্দুভিধ্বনি আর শ্রুতি-গোচর হয় না; * * * মাইকেল যে স্বরে বঙ্গ-কাব্য-কাননে গান ধরিয়াছিলেন, সেই অমিত্রাক্ষরের মহাসংগীতে নূতন ভাবে, নূতন আবেগে, নূতন রসে কেহই গাহিতে পারেন না।" এমন কি কোনও সমালোচক অতি দুঃখ করিয়া বলেন, "মাইকেল ভিন্ন অমিত্রাক্ষর ছন্দে আর কাহারও তেমন অধিকার জন্মিল না"। ভারতমঙ্গল-কার বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র এই দুঃখ বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

এই গ্রন্থ ঊনবিংশতি সর্গ এবং চারিশত পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ছাপা অতি পরিষ্কার, বাইণ্ডিং সুন্দর। এখানি ভারতবর্ষের বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মবিপ্লব সম্বন্ধীয় মহাকাব্য।

যে সকল বিষয় লইয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী উল্লেখযোগ্য। "ধর্ম্মের স্বরূপ কি? সত্য, ন্যায়, প্রীতি ও পবিত্রতাই ধর্ম্মের স্বরূপ। ধর্ম্ম সাধন কিরূপে হয়? জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা এই তিনকে আশ্রয় করিলেই প্রকৃত সাধন হয়। কর্ত্তব্য সাধনেই ধর্ম্মের পরীক্ষা। সন্ন্যাস, তপস্যা, দান ও দীক্ষা প্রভৃতি ধর্ম্মের সাময়িক সহায় বটে, কিন্তু দাম্পত্য ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। দুঃখ নামে প্রকৃত প্রস্তাবে কিছুই নাই, সুখের অভাবের নামই দুঃখ। উন্নতিই সৃষ্টির লক্ষ্য, বিবর্ত্তন তাহার প্রক্রিয়া। * * * ধর্ম্ম ও নীতির এবম্বিধ তত্ত্ব সমূহ সুশৃঙ্খলরূপে এই কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এ কথা অতি নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, কাব্যের উপকরণগুলি অতি উপাদেয় ও শিক্ষাপ্রদ।

কবি রূপকের মধ্য দিয়া তাঁহার প্রচারিত সত্য সমূহ কল্পনার রঙ্গে চিত্রিত

করিয়াছেন। এজন্য স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, গন্ধর্ব্বপুরী, দৈত্যদেশ ইত্যাদির সৃষ্টি করিয়াছেন। স্থানে স্থানে লিপিচাতুর্য্য, বর্ণনা এবং কবিত্বশক্তি এরূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে যে, সেই সেই স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিতে ইচ্ছা হয়; 'সময়ের' কলেবরে সংকুলন হইবে না বলিয়া, আমরা কেবল দু চারিটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি। কবি প্রথম সর্গে এইরূপে স্বর্গবর্ণন করিয়াছেন। * * এরূপ সুরুচিসংগত, এবং সুললিত ভাষায় স্বর্গবর্ণনা বঙ্গসাহিত্যে অতুল্য!

THE BENGALEE.

BABU Ananda Chandra Mitra, the reputed author of "Helena Kavya," "Mitra Kavya" and other well known poems, has favoured us with a copy of his new epic "Bharat Mangal," and in going through it, we have been struck by the wonderful skill, which the poet has displayed in consecrating his poetry to the praise of religion and duty. The poem is founded on the present religious revolution in India, and the hero of the epic is the great Bengali, who is the fore-runner and the founder of the lofty Theism whieh finds expression in the Brahmo Somaj. What strikes one at a mere glance of the poem is the originality of its plan, and in conformity with his altogether novel conception, the author's thoughts too are completely new. The poet's theme, the reader soon perceives is extremely diffcut to transform into a work of art, and he has therefore interspersed and enlivened his didactic narration with allegorical characters, representing sublime spiritual truths and principles as made of flesh and blood, who carry the ordinary reader with them in their joys and sorrows, triumphs and reverses. Without degenerating into 'orthodox and vulgar machines,' they have considerably enhanced the beauty and the attractiveness of the poem; and the many and the varied episodes—such as for instance the depiction in the sixteenth canto—with which the poet softens the lofty spiritual ideal which he ever keeps before the reader are exceedingly interesting and pretty. Throughout are discernible a manly strength, a charming atmosphere of enhancing suggestions and a firm continuous music. Its diction fully sastains the reputation which Mr. Mitra has already acquired by his other works in blank verse. We wish we could see many more of such works in Bengali.